ইতালিতে বারকয়েক

"একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" প্রণেতা

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক

সিটী লাইব্রেরী

৪৪ নং কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২৬ নং বাঙ্গলাবাজার, ঢাকা।

১৯৩২

মূল্য ১॥০

সূচীপত্র

ইতালিতে
বারকয়ের

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

ইতালিতে বারকয়েক

"একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" প্রণেতা

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক

সিটী লাইব্রেরী

৪৪ নং কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২৬ নং বাঙ্গলাবাজার, ঢাকা।

১৯৩২

মূল্য ১৷৷০

প্রকাশক

শ্রীগৌরগোপাল মণ্ডল

৪৪নং কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস

৪৪ কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

"ইতালিতে বার কয়েক" "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলীর দ্বাদশ ও শেষ খণ্ড। হাজার চারেকের কিছু বেশী পৃষ্ঠা লইয়া এই গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ হইল।

১৯১৪ সনের এপ্রিল মাসে প্রথম খণ্ড সুরু হয়। তুই বারকার বিদেশ-পর্যটনে ও বিদেশ-গবেষণায় কাটিয়াছে সব শুদ্ধ চোদ্দ বৎসর। আজ আঠার বৎসর পরে শেষ খণ্ডের—ইতালিবিষয়ক বইয়ের—ভূমিকা লিখিতেছি।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রধানতঃ ভূগোল ও নৃতত্ত্ববিষয়ক সাহিত্য। কিন্তু ভৌগোলিক আর আন্থ্রপলজিক তথ্য ছাড়া আরও অনেক প্রকার তথ্য আমার বিদেশ-গবেষণায় ঠাঁই পাইয়াছে। বিশেষতঃ, যে যুগে বাংলা ভাষায় এই চার হাজার পৃষ্ঠার উৎপত্তি হইতেছিল সেই যুগে আমাকে—বাংলায়, ইংরেজিতে, ফরাসীতে, জার্ম্মাণে আর ইতালিয়ানে, অন্যান্য অনেক বিজ্ঞানের সেবা করিতে হইয়াছে। এই সকল বিজ্ঞান-সেবার ফল বিলাতে, আমেরিকায়, জাপানে, চীনে, ফ্রান্সে, জার্ম্মাণিতে, ইতালিতে আর ভারতেও,—প্রবন্ধের আকারে এবং গ্রন্থের আকারে বাহির হইয়াছে। সেই সব রচনাকে মোটের উপর তিনটা বড় বড় বিজ্ঞানের অন্তর্গত বিবেচনা করিতে পারি :—(১) সমাজতত্ত্ব (২) অর্থশাস্ত্র (৩) রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

ফলতঃ "বর্ত্তমান-জগৎ" গ্রন্থাবলীও আগাগোড়াই এই তিন বিজ্ঞানের মালমশলায়, সিদ্ধান্তে আর আলোচনা-প্রণালীতে ভরপুর।

কাজেই "ইতালিতে বারকয়েক" পড়িতে পড়িতে পাঠকের কখনো সমাজ-তত্ত্বের সঙ্গে, কখনো ধন-বিজ্ঞানের সঙ্গে, কখনো বা রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের সঙ্গে মোলাকাৎ অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা ইতালি সম্বন্ধে কিছুই জানেন না তাঁহারা পান চিবাইতে চিবাইতে এই বইয়ের মারফৎ ইতালির একাল-সেকাল কিছু কিছু স্ববশে আনিতে পারিবেন। আর ইতালি যাঁহাদের নিকট একদম অজানা নয় তাঁহারাও হয়ত বা নতুন নতুন তথ্যও কিছু কিছু পাইবেন। অধিকন্তু পুরানা সুপরিচিত তথ্য ও ঘটনাসমূহের বিলকুল নতুন ব্যাখ্যা ও হয়ত এই বইয়ে অনেক জুটিবে।

ইতালিয়ান ভাষা সুরু করি ১৯২৫ সনের জানুয়ারি মাসে। সেই বৎসরই ইতালিয়ান ভাষায় আমার লেখা প্রথম ছাপা হয়। ইতালিয়ান ভাষায় প্রথম বক্তৃতা দিই ১৯৩০ সনে ;—মিলানের বক্কনি আর পাদহ্বার রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৩১ সনের মার্চ্চ মাসে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়াছি,—অবশ্য ইতালিয়ানে।

সেই বৎসরই সেপ্টেম্বর মাসে আন্তর্জ্জাতিক লোকবল কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় রোমে। এই কংগ্রেসের অর্থনৈতিক শাখায় অন্যতম সভাপতিরূপে বাহাল ছিলাম। ইতালিয়ান ভাষায়ই বক্তৃতা দিয়াছি।

আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ইতালির নানা কথা আমার "ইকনমিক ডেহ্বেলপ্‌মেণ্ট" (আর্থিক উন্নতি, মান্দ্রাজ ১৯২৬) ও "পলিটিক্স্ অব্ বাউণ্ডারীজ" (সীমানার রাষ্ট্রনীতি, কলিকাতা ১৯২৭) এই দুই বইয়ে বাহির হইয়াছে। "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" নামক দুই খণ্ডে প্রকাশিত বাংলা বইয়েও (১৯৩০-৩২) ইতালির অর্থকথা আলোচিত হইয়াছে। মাসিক "আর্থিক

উন্নতি" আর ত্রৈমাসিক "জার্ন্যাল অব দি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স্" নামক পত্রিকায় এই সম্বন্ধে নানা আলোচনা বাহির করিয়াছি। তাহা ছাড়া "দি পোলিটিক্যাল ফিলজফীজ সিন্স ১৯০৫" (১৯০৫ সনের পরবর্ত্তী রাষ্ট্রদর্শন, মান্দ্রাজ ১৯২৮) নামক গ্রন্থে ইতালিয়ান দার্শনিকদের রাষ্ট্রচিন্তা কিছু কিছু গুঁজিতে পারিয়াছি। ১৯৩০-৩১ সনের ইতালি-ভ্রমণের সময় নানাবিধ ইতালিয়ান প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ও সঙ্ঘের সঙ্গে প্রায় শ'খানেক মোলাকাৎ চালাইয়াছিলাম। এই মোলাকাতের দিনলিপি "কণ্টাক্ট্‌স উইথ ইকনমিক ইটালি" (আর্থিক ইতালির সঙ্গে ছোঁআ ছুঁঞি) নামে পূর্ব্বোক্ত জার্ণ্যালের দুই সংখ্যায় (১৯৩১-৩২) বাহির হইয়াছে।

ইতালিয়ান ভাষায় আমার যে সকল লেখা বাহির হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নরূপ :—

১৯২০ : গিল্‌দে দি মেস্তিয়ার এ গিল্‌দে মার্কান্তিলি নেল্ ইন্দিয়া আন্তিকা (জ্যর্ণালে দেলি একনমিস্তি এ রিভিস্তা দি স্তাতিস্তিকা (রোম)। এই লেখাটা আমার ইংরেজি রচনা হইতে ইতালিয়ানে অনুবাদ।

১৯৩০ : ইস্তিতুৎসিঅনি পলিতিকে এ সচ্যালি দেল্ আন্তিক পপল ইন্দিয়ান (আনালি দি একনমিয়া, মিলান)।

১৯৩০ : আস্পেত্তি এ প্রব্লেমি দেল্লা মদ্যার্ণা একনমিয়া ইন্দিয়ানা (আনালি দি একনমিয়া, মিলান)।

১৯৩১ : ইল মভিমেন্ত ইন্দুস্ত্রিয়ালে এ কমার্চ্যালে দেল্ ইন্দিয়া এ ই সুঅই রাপর্ত্তি ইন্তার্ণাৎসিঅনালি (কমার্চ্য, রোম)।

[illegible] ই কওএফিসিয়েন্তি দি নাতালিতা, দি মর্তালিতা, এ দি

আউমেন্ত নাতুরালে নেল্-ইন্দিয়া আত্তুয়ালে নেল্ কোআদ্র দেল্লা দেমগ্রাফিয়া কম্পারাতা (কংগ্রেস্‌স ইন্তার্নাৎসিঅনালে 'পার লি স্তুদি সুল্লা পপলাৎসিঅনে, রোম)।

১৯৩০-৩১ সনে ইতালিয়ান গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্ বিভাগের তরফ হইতে একটা ইস্তিতুত ইতল-ইন্দিয়ান (ইতাল-ভারতীয় পরিষৎ) কায়েম করিবার প্রস্তাব হয়। বর্ত্তমান ভারতের অর্থ-কথা আলোচনা করা প্রস্তাবিত পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বৎসর দুয়েকের জন্য আমাকে ইহার প্রথম ডিরেক্টর বাহাল করিবার ব্যবস্থা হইতেছিল। এই সম্বন্ধে ইতালির সর্ব্বত্র নানা কাগজে লেখালেখি চলিয়াছিল। আর্থিক দুর্যোগের বৎসর বলিয়া সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্-বিভাগের প্রেসিডেণ্ট অধ্যাপক জিনি এই প্রস্তাবে ইতালির অগ্রণী ছিলেন।

এই বইয়ের ইতালি মুসলিনির ইতালি বটে। কিন্তু ফাশিসম একমাত্র বা প্রধান আলোচ্য বিষয় নয়। অধিকন্তু ব্রাজিল, দান্তে, জাত্ত, আন্তনিঅ, মাক্যাভেল্লি, ভিকো, মাৎসিনি, মানৎসনি, পুচিনি ইত্যাদি ইতালি-বীরদের আত্মা এই রচনার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। গোটা ইতালিয়ান সভ্যতার সঙ্গে বাঙ্গালীর আত্মিক জীবনের কুটুম্বিতা কায়েম করাইবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইতালিতে বারকয়েক ভবঘুরেগিরি করিয়াছি।

অধ্যায়গুলা মাসিক "বঙ্গবাণী," "আনন্দবাজার," "ভারতবর্ষ," "মানসী ও মর্ম্মবাণী," "উপাসনা," "সুবর্ণবণিক সমাচার" ইত্যাদি পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল।

ইতালি-প্রবাস সংক্রান্ত কয়েকটা ইতালিয়ান দলিলের ফটো-

Ho conosciuto parecchi luoghi dell'Alto Adige tanto d'inverno che di primavera, d'estate e di autunno. Sarebbe ardua cosa nominare un altro sito della terra che sia sorriso da eguale varietà di natura e di paesaggio.

La sera gli abitati del piano e quelli del monte coi loro lumi tremolanti appaiono come un mare di stelle disseminate su la terra, e di giorno il forestiere v'incontra dovizia di gioielli d'architettura meraviglidsa-

Una pagina della „Voce del Bengala", con vedute di Trento.

"রিভিস্তা দেল্ আল্ত আদিজে" নামক বল্‌ৎসান হইতে প্রকাশিত মাসিকে বিনয়বাবুর ইতালিয়ান রচনা (এপ্রিল ১৯২৫)

TRENTO, Giovedì 29 Gennaio 1925

Benoy Kumar Sarkar

Sia detto subito che questa intestazione di sapore esotico è messa qui unicamente per attirare lo sguardo dei lettori, mentre il titolo più esatto sarebbe quello di «Nazionalismo Indiano».

Benoy Kumar Sarkar è un letterato indiano, di razza bengalese come il poeta Rabindranath Tagore di cui tanto parlano ora le gazzette italiane, uomo giovane, assai simpatico e colto, professore e membro del Consiglio Nazionale di Educazione del Bengala e Direttore dell'Accademia Panini di Allahabad: si trova a Bolzano da circa due mesi, reduce dai bagni di Levico, e intende soggiornare in Italia ancora un paio d'anni, allo scopo di allacciare più intense relazioni intellettuali e commerciali fra l'India e il nostro paese. Appunto la presenza del mistico detentore del premio Nobel, il quale, figlio d'una razza oppressa, s'è fatto banditore a Milano di nebuloso idealismo internazionalista, dando a noi europei la impressione di un'India dimentica e senza proprie aspirazioni nel mondo, di un'India cara ai teosofi e pervasa solo dello spirito di rinuncia; appunto la presenza di Tagore in Italia, dico, conferisce attualità alla missione di Benoy Kumar Sarkar che è ben diversa da quella del suo celebrato connazionale.

Le ripetute conversazioni con lui, che parla l'inglese, il francese e il tedesco, ed ora s'è applicato con zelo allo studio dell'italiano, dovevano servire per una serie di corrispondenze a vari giornali della Penisola, ma non n'è venuto niente, come succede spesso ai giornalisti (chi è senza peccato scagli la prima pietra!): ed ora si cerca di farne qui onorevole ammenda.

La prima cosa che il dotto indiano tiene a metter bene in chiaro è che il movimento di rinascita nazionale, a cui egli s'è dato, è perfettamente scevro da ogni spirito di xenofobia, essendo ben persuase tutte le persone di buon senso del suo paese che l'India non possa e non debba sbarrare il passo alla europeizzazione, pena il suicidio. Niente distruzione di prodotti industriali, niente ostacoli alla costruzione di ferrovie, di canali navigabili o in genere alle opere moderne intese a un migliore sfruttamento delle ricchezze nazionali, niente «gandhismo» insomma. L'inevitabilità della industrializzazione appare ben chiara non solo alle classi dirigenti di quell'emporio mondiale di commerci e di industrie che è la città di Bombay, ma bensì anche ai centri intellettuali di Calcutta, la quale se conta meno economicamente, costituisce però il principale punto di gravitazione e di irradiazione della coltura indiana.

Vogliono però europeizzarsi, non venire europeizzati, e per rompere l'esoso monopolio inglese considerano come mezzo più adatto quello di aprire le frontiere alla penetrazione pacifica di tutti i popoli civili indistintamente. Le loro simpatie vanno in modo particolare alle nazioni di secondaria grandezza, in quanto esse non rappresenteranno mai un serio pericolo per l'indipendenza indiana.

Tale è l'Italia; e tutto quanto avviene in Italia interessa a loro in sommo grado, perchè la sua recente storia serve a loro di modello del come un popolo possa da uno stato di servaggio risorgere a libertà e assidersi, pari fra i pari, a fianco dei popoli di vecchia tradizione unitaria e militare, quali la Francia, la Germania e l'Inghilterra. Ciò spiega perchè Giuseppe Mazzini, le cui opere sono tradotte in quasi tutte le lingue dell'India, e corrono per le mani di vaste masse, è considerato laggiù come il profeta del movimento di emancipazione dal giogo straniero.

Degli altri pensatori italiani il più conosciuto, dopo Mazzini, è Nicolò Machiavelli; Virgilio e Dante hanno ispirato il più grande epico indiano, Datta, vissuto alla metà del secolo XIX, che conosceva alla perfezione il latino e l'italiano ed ebbe tanta dimestichezza coi nostri classici da indirizzare dei sonetti a Petrarca. Nè egli è il solo che abbia bevuto alle fonti della latinità, dato che lo studio dell'antichitàà classica è diffuso in India al pari che nei paesi di civiltà europea.

Occorre dire che il «Milione» di Marco Polo fa parte del bagaglio intellettuale del più modesto indiano che abbia appena imparato a leggere e a scrivere o sentito raccontare qualche cosa delle antiche meravigliose storie del suo paese? Degli italiani moderni i più ammirati sono Alessandro Volta e Guglielmo Marconi; per motivi facilissimi a comprendere, ma sentite questa: la musica italiana è invece totalmente sconosciuta. Me lo son fatto ripetere tre volte per tema d'aver frainteso, tanto la mi pareva incredibile, essendo noto che la musica e il cinematografo per la loro indipendenza dalla lingua e dalle tradizioni locali sono le forme d'arte di più rapida diffusione. E tre volte il cortese interlocutore me lo confermò. Sulle rive del Gange, i nostri Verdi, Rossini, Mascagni, Puccini ecc. ecc. sono zero via zero. Avviso a chi tocca! In quella vece, vedi caso singolare, la pittura italiana vi è popolarissima, sicchè vi potrebbe capitare, discorrendo con un indiano colto, di sentirvi fare delle domande imbarazzanti anche su artisti del pennello di nostra razza, antichi o moderni, che non sono proprio di quelli che vanno per la maggiore. L'esposizione di acquarelli indiana organizzata agli inizii del 1923 dal Sarkar stesso a Berlino e a Dresda diede occasione ai critici di riconoscere in quell'arte l'influsso del prerafaellismo.

Nel campo della scienza pura, specie in quello della matematica, dell'acustica, dell'ottica, della microscopia, della ca-

"লিব্যার্ত্তা" নামক ত্রেন্ত'র ইতালিয়ান দৈনিকে বিনয়বাবুর জীবন ও মতামত সম্বন্ধে আলোচনা (২৯ জানুয়ারি ১৯২৫)

Uno scienziato indiano
fervente ammiratore dell'Italia

Prof. BENOY KUMAR SARKAR

Il prof. Benoy Kumar Sarkar, direttore dell'Istituto di Economia del Bengala, e di vari giornali economici del suo Paese, è uno studioso di notevole valore, un organizzatore di grande attività, che ha svolto e svolge un'azione nettamente favorevole all'Italia.

Nato nel 1887, laureatosi a Calcutta nel 1905, dal 1907 con tutta una serie di pubblicazioni, letterarie, politiche, sociologiche, economiche, va diffondendo nei paesi occidentali idee e notizie sul popolo indiano. E' da notarsi che la maggior parte dei suoi studi sono frutto diretto di esperienze e di osservazioni personali, in quanto che il prof. Sarkar ha dedicato parecchi anni della sua vita a viaggi di investigazione nell'Europa e nelle Americhe, al fine di trovare nell'evoluzione di questi paesi i punti di contatto con la civiltà indiana. In questi suoi viaggi egli ha avuto modo di tenere un ciclo di conferenze alla Sorbonne, a Parigi, di svolgere il suo pensiero nelle varie riviste scientifiche di carattere internazionale; e di venir chiamato dal Governo Bavarese a insegnare nella Facoltà di Economia e Commercio di Monaco.

In Italia il prof. Sarkar ritorna ora per la seconda volta, e dopo Milano scelse Padova per parlare della attività del popolo Indù e della industrializzazione dell'India odierna.

Se già la enunciazione del tema delle sue conferenze desta vivo interesse, in quanto è comune abitudine presentare la filosofia metafisica e l'astrazione idealistica come le speciali caratteristiche della popolazione indiana, giova ricordare anche che tale interesse è reso più forte dal fatto di aver il prof. Sarkar promosso l'iniziativa della costituzione di un Istituto Italo-Indiano. Sappiamo infatti che il Capo del Governo ha accolto assai cordialmente la proposta ed ha affidato al Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica il compito di concretare la situazione del nuovo Ente, che oltre e più che avere un carattere strettamente culturale deve svolgere la sua attività nel campo economico e commerciale. Scambio di merci e di idee, in una parola, è il programma che si sta ora attuando.

Se si pensa che il mercato indiano, sia per materie prime, sia per prodotti finiti, sia per capitali, si rivolge ancora all'estero, è facile comprendere l'importanza dell'Istituto che sta sorgendo.

Al prof. Sarkar pertanto, che attraverso studi ed esperienze è giunto a scegliere il nostro Paese per un ulteriore progresso economico e politico della sua Patria, il nostro cordiale saluto.

"Industrializzazione dell' India,,

Ieri, alle ore 17, il prof. Sarkan ha tenuto nell'aula E dell'Università una seconda conferenza, parlando sull'industrializzazione dell'India moderna. Assistevano vari professori, signore e signori.

L'oratore ha esaminata la vita economica dell'India ed ha esposte le trasformazioni industriali e commerciali avvenute in quest'ultimo ventennio, mettendole in rapporto diretto con le condizioni economiche del mondo. L'India s'è, ormai, familiarizzata con le macchine moderne e la popolazione si appassiona alla vita europea. Il conferenziere si è soffermato, quindi, sulle importazioni dell'India, i cui mercati sono stati tenuti finora dalla Germania e dall'Inghilterra; bene accolte sono le macchine agricole italiane, anzi, in generale, tutti i prodotti italiani sono accolti con grande favore, sicchè i rapporti commerciali potrebbero essere maggiori e più proficui.

Il prof. Sarkan, alla fine della conferenza, fu caldamente applaudito.

পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনয়বাবুর ইতালিয়ান ভাষায় বক্তৃতা উপলক্ষ্যে ভেনিসের "গ্যাজেত্তিন ভেনেৎসিয়া" নামক দৈনিকে বক্তার জীবন ও কর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা

(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০)

Nuove vie per la coltura e il commercio

Un istituto italiano per lo studio dell'India

in una conferenza di uno studioso indiano

Il prof Benoy Kumar Sarkar, indiano, è un fedele amico e grande ammiratore dell'Italia e lo dimostrano i suoi ripetuti viaggi ed i suoi acuti studi compiuti nelle nostre città, intesi a creare ovunque favorevoli correnti per la conoscenza sempre maggiore e profonda del suo paese e

BENOY KUMAR SARKAR

per aprire fra l'Italia e l'India sicure e prospere vie di cultura e di commerci.

Undici anni in viaggio

Dotato di una meravigliosa attività e di un felicissimo intuito il prof. Sarkar ha viaggiato undici anni in Asia e in Europa per approfondire le sue cognizioni sull'industrie, sull'educazione, la letteratura, le scienze e le arti delle diverse nazioni, scrivendo una quantità di libri, di fascicoli, di articoli, tenendo ovunque conferenze sui più svariati argomenti.

Nel 1925 il prof. Sarkar che ha 44 anni tenne una conferenza all'Università Bocconi di Milano e nel febbraio dell'anno apprseso a Padova trattando il tema dello Stato e dell'Economia nell'attività del popolo indù

Nella sua permanenza in Italia si è fatto promotore di un Istituto Italo-Indiano per lo studio sull'India moderne che potrà essere non soltanto un apprezzabile mercato per la merce italiana ma anche per le idee italiane. Il Capo del Governo accolse già con favore la proposta affidando al Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica il compito di concreare l'attuazione del nuovo Ente, di cui il suo ideatore così definisce le linee eccenziali:

«Sarà consigliabile, per l'istituzione dell'Istituto, un lavoro unito tra Camera di Commercio, società industriali ed agricole, società di navigazione, università, scuole tecniche e commerciali ed altre istituzioni scientifiche-sociali. Un tale Istituto dovrebbe occuparsi altro che del cambiamento economico dell'India d'oggi, e cioè: industria, commercio, tecnica ecc. leggi di politica sociale, temi di moderna economia, politica e sociologia.

Per un modesto inizio d'un già detto istituto è necessario quanto segue

1. Una biblioteca sull'India d'oggi
2. Un ufficio d'indagini

Questo deve appoggiarsi a qualche grande istituto sociale-scientifico, politico-commerciale o d'economia politica, già esistente in Italia costituendovi una sezione speciale indiana

3. Uno scienziato, un professore d'università italiana per le seguenti funzioni:

a) Organizzare l'istituto.

b) Fare e promuovere indagini sullo sviluppo dell'India d'oggi.

c) Tenere delle conferenze non solamente all'istituto stesso, ma anche alle Università, alle Camere di Commercio, ecc.

"জ্যর্ণালে দিতালিয়া" নামক রোমের দৈনিকে বিনয় বাবুকে ইস্তিতুত ইতল-ইন্দিয়ান নামক পরিষদের ডিরেক্টর নিয়োগ করিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা

(১৮ই মার্চ্চ ১৯৩১)

Il Congresso internazionale per gli studi sulla popolazione

Quattrocento studiosi di trentadue nazioni

esaminano i problemi della demografia, supremo interesse di tutti i paesi civili

Alle ore 10 l'Aula del Palazzo Senatorio accoglie circa quattrocento congressisti, qui convenuti da ben trentadue nazioni. Vi sono i rappresentanti di tutti gli Stati europei, dell'Argentina, del Brasile, dell'Egitto, della Cina, degli Stati Uniti, del Guatemala, del Giappone, del Libano, del Messico, del Nicaragua, del Paraguay, del Perù, del Salvador di Tunisi, dell'Unione Sud Africana, dell'Uruguay; inoltre notiamo i più illustri cultori di scienze demografiche delle università maggiori d'Italia e del mondo, alcuni sacerdoti, tra cui l'Abbé Nugeim, e un professore indiano, il Sarkor, che è pure Presidente di sezione al Congresso.

La sesta sezione di Economia ha per presidenti: prof. F. Baudhuin, on. prof. A. Loria, prof. V. Mataja, dott. C. E. Mc Guire, prof. Ch. Raajmakers, prof. Benoy Kumàr Sarkar, on. prof. Pietro Sitta, prof. dott. E. Wagemann, prof. E. Wurzburger, prof. J. M. Zumalacarregui.

Giornale d'Italia
7 Sett 1931

Il movimento della popolazione

La Sezione VI — Economia — nella seduta antimeridiana ha discusso i problemi dello spopolamento della montagna e delle carestie sotto la presidenza del prof. Sarkar.

A nome del prof. A. R. Toniolo, del Consiglio Nazionale delle ricerche, ha parlato il prof. Giusti, presentando un'interessantissima ricerca sullo spopolamento montano, e aggiungendo alcune sue considerazioni personali. Interloquiscono sull'argomento il prof. Boninsegni, di Losanna, il prof. Fulvio Bolla, di Lugano, che riferisce sullo spopolamento delle valli del Canton Ticino; la dott.ssa Arcari, che espone alcuni rilievi sugli effetti demografici della guerra nei paesi neutrali. Seguono il dott. Gavino Alivia, di Sassari, col tema: «La distribuzione della popolazione sarda tra la montagna e il litorale»; il dottor Schwarz, di Berna: «Sul movimento della popolazione nelle alte valli della Svizzera».

Chiusa la discussione sullo spopolamento della montagna, ha la parola il prof. Virgili della R. Università di Siena, che presenta ed illustra un chiaro rapporto su «Il Monte dei Paschi di Siena nei suoi tre secoli di vita e nelle sue ripercussioni demografiche». La interessante conferenza viene seguita con attenzione dall'uditorio che applaude il conferenziere. Segue una breve discussione a cui partecipano il prof. Boninsegni, il sen. Sitta, che fanno alcune considerazioni sui fattori che hanno favorito lo sviluppo della fiorente istituzione senese.

Nella seduta pomeridiana la Sezione si è riunita sotto la presidenza del prof. Carlo Brebbia, occupandosi del problema della carestia. Il dott. Kovan di Varsavia, ha letto una importante relazione di carattere storico. Fanno alcune osservazioni il dott. Brebbia, il prof. Sarkar e il prof. Tivaroni. Si presentano poi le relazioni del prof. Sarkar sui quozienti di natalità, mortalità e accrescimento naturale nell'India attuale, del prof. D'Addario sull'agglomeramento della popolazione nei compartimenti italiani e sulla relazione fra il frazionamento della proprietà terriera ed alcuni fenomeni demografici in Italia. Da ultimo presenta la sua comunicazione su *Malthus redivivus* il dottor Engelsmann.

La Tribuna
9 Sett 1931

Nella seduta pomeridiana la principale relazione è stata presentata dal prof. Sarkar sui quozienti di natalità e di accrescimento naturale della popolazione nell'India. L'interessante studio del prof. Sarkar dimostra che l'India non è poi, dal punto di vista demografico, molto lontana dalle più progredite nazioni europee, sia per ciò che riguarda la natalità, sia per ciò che riguarda la mortalità, molte delle principali nazioni europee si trovavano, un cinquantennio or sono, nelle stesse condizioni dell'India.

Giornale d'Italia
9 Sett 1931

রোমে অনুষ্ঠিত

আন্তর্জ্জাতিক লোকবল কংগ্রেসের অর্থনৈতিক বিভাগে বিনয়বাবু অন্যতম সভাপতি ছিলেন। তিনি ইতালিয়ান ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। "জ্যর্ণালে দিতালিয়া" ও "লা ত্রিবুনা"য় তাহার বৃত্তান্ত (৭-৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩১)
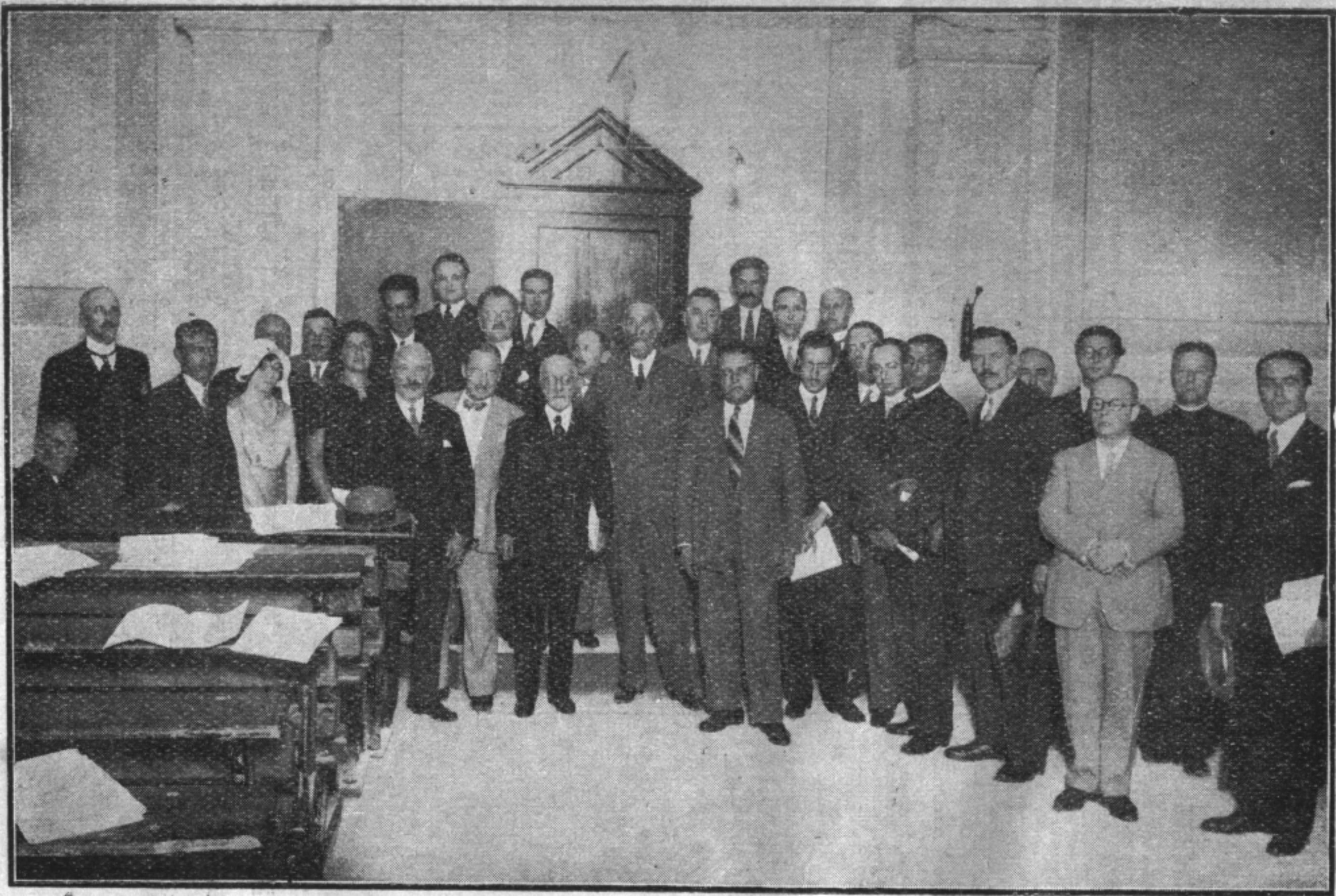
আন্তর্জ্জাতিক লোকবল কংগ্রেসের প্রতিনিধিবর্গের ভিতর
বিনয়বাবু (রোম সেপ্টেম্বর ১৯৩১)

অ্যাণ্ড কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত মৎ-প্রণীত "গ্রীটিংস টু ইয়ং ইণ্ডিয়া" (যুবক ভারতের নিকট সম্ভাষণ, ১৯২৭) বইয়ের জন্য যে সকল ছবি ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহার দুইটা এই বইয়ে জুড়িয়া দেওয়া হইল।

ইতালিয়ান সমাজের নানা ঘাঁটিতে নানা পেশার বহুসংখ্যক বন্ধু পাইয়াছি। এখানে তাঁহাদের নাম করিবার দরকার নাই "যথানাম-গোত্রা" হিসাবে সংক্ষেপে সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তবে অর্থশাস্ত্রী পান্তালেঅনি, মর্ত্তারা, গ্রাৎসিয়ানি ও বেনিনি, সমাজতত্ত্ববিৎ নিচেফর, দার্শনিক ক্রচে, শিক্ষাসচিব জেন্তিলে, সেনেটার বল্‌কিনি, ভারত-তত্ত্ববিৎ ফর্মিকি, পিৎসাগাল্লি ও তুচ্চি, শিক্ষা-বিজ্ঞানাধ্যাপক তাউর, ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্-শাস্ত্রী জিনি ও পিয়েত্রা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানাধ্যাপক দেল্ ভেক্কা, বাণিজ্যশাস্ত্রী কার্লি ও মুস্ক ইত্যাদির কথা অনেকবারই মনে আসিতেছে।

কলিকাতা
এপ্রিল, ১৯৩২

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

সূচীপত্র

ইতালি

ইতালি হে অমর তুমি সভ্যতারই বিকাশ কাজে,
তোমার সমান ভাগ্যবতী দেখিনাক' ধরার মাঝে।
গ্রীস-কার্থেজ সঙ্গে জন্ম,—প্রাচীন ইয়োরোপের ছেলে,
ছোকরা মার্কিন-জার্ম্মাণ-জাপের জুড়িদার আজ হেসে খেলে!
অতীত ভেঙ্গে এনেছিলে ভিত্তি নবজীবনের,
নয়া খোলসে কীর্ত্তি তোমার রেণেসাঁস যে পুরাণের।
দেশ-বিদেশের মানুষ পেলো পুনর্যৌবন তোমার কাছে,
তোমার চোখে জগৎ চেখে স্ত্রীপুরুষ সব ছিল বেঁচে।
তোমার তেজে তাজা হ'ল প্রতীচ্যের যত লোক,—
গুরু তুমি তাদের সবার বর্ত্তমানে যাদের ঝোঁক।
আজকে আবার দেখ্‌ছি তোমায় নব যৌবন-অবতার,
এই যৌবনের জোয়ার-স্রোতে এশিয়া চায় কাট্‌তে সাঁতার।
তোমার দেখে জ্যান্ত হচ্ছে পুরুষ-নারী ভারতের,
অফুরন্ত শক্তি তোমার, পূজারি যে যৌবনের।

———

ভার্জ্জিল

প্রত্নতাত্ত্বিক নও তুমি হে কবি ভার্জ্জিল, ল্যাটিন বীর,
নিজের খেয়ালমাফিক মূর্ত্তি দিয়েছ পুরা কাহিনীর।
জাতীয় জীবন প্রভাতে ঢেলেছ মধ্যাহ্নরবির দীপ্তি,—
পূর্ব্বপুরুষে ভাবি অতি নর হয় সন্তানের তৃপ্তি।
কামড়াকামড়ি গণ-নেতাদের স্বরাজ্যে থেমেছে আজ,
সীজার-অগাষ্টাস একরাট্ এখন নবীন রাষ্ট্র মাঝ।
তখন সকল দেশের রাণী ছিল রোমাণ জাতির জন্মভূমি,
তাই—ঐতিহাসিক লিভির মতো রোমকে স্বর্গ ভাব্‌তে তুমি।
যখনি যে জাত উঠিবে ঊর্দ্ধে সিদ্ধি-শিখর দিকে,
সে সোনার শৈশব তখনি তাহারা দেখাবে ঈনীড লিখে'।
ল্যাটিন মনু ঈনিয়াস এল রোমে তার ট্রয় ছাড়ি',
হ'ল—তোমার মাথায় ভবিষ্যপুরাণ ভ্রমণ-প্রেম-রণ ভারি।
গ্রীক হোমারের চেলা তুমি, দান্তে-মাৎসিনির প্রবর্ত্তক,
বিশ্ববাসীকে স্বদেশ-প্রীতির শিক্ষক তুমি সার্থক।

———

দান্তে

বেআত্রিচের প্রেমে মুগ্ধ হে দান্তে কবি ফ্লোরেন্সের,
নারীর চোখে পেয়েছিলে তুমি কেন্দ্র অসীম বিশ্বের !
ঘোড়-সওয়ার, নগরশাসক, মৃত্যুদণ্ডে তুচ্ছ গণি—
দেখালে জীবন মধ্য যুগের অভিজ্ঞতার পূর্ণ খনি।
কথ্য ভাষার, ঐক্যের আর রাজ্য গর্ব্ব ছিল না দেশে ,
কণ্ঠে তব তূর্য্যধ্বনি উঠাইলে তাই এক নিমেষে।
"নবীন জীবন" লভেছিলে তুমি, মাত্র নয় বৎসর বয়সে,
বালিকার আঁখি দেখেছিলে ভরা স্বর্গীয় আশিষ রসে।
স্ত্রীহৃদয়ের নিমেষের দান আনিল চিত্তে সে অমরতা,
ভার্জ্জিলের ঈনীড অবধি মাৎসিনির বিপ্লব কথা।
তাতেই তুমি পেয়েছিলে কবি পার্গে টরির শোধনপুরী,
পেয়েছিলে আর ছুনিয়ার আশা আদর্শ ধর্ম্ম ভূরি ভূরি।
স্ত্রীজাতির আঁখি তাহলে কাজেই তুচ্ছ চামড়ায় তৈরি নয়,
তাদের প্রেমের স্থির চাহনিতে স্বর্গ নামিয়া কথা যে কয়।

মাৎসিনি

আগাগোড়া ভুল করেছ জীবনে, হে মাৎসিনি, দেশপ্রেমিক,
তবু দেবতার অবতার বলে' বিশ্ব পূজে নির্নিমিথ।
দান্তে-ভাজ্জিলে ঢুঁড়েছ যুবক ইতালি গঠন-মন্ত্র,
তাদের মাথায় কোথায় পাইলে তোমার সমাজ-তন্ত্র ?
রাজার বন্ধু উহারা সকলে, মাক্যাভেল্লির কিবা দোষ ?
কি হেতু ভাবিলে নীতিশাস্ত্র তার সয়তানীর বিশ্বকোষ ?
ফরাসী, প্রুশিয়ান দুই জনে কাবু করেছিল অষ্ট্রিয়াকে,
তারি ফলে পেলে স্বাধীন স্বরাট্ খণ্ডীভূত দেশ-মাকে।
বৈদেশিক ষড়যন্ত্রকে কিন্তু ভাবতে দুর্নীতির মূল,
ওস্তাদ কাভুর গারিবাল্দি তাই হয়েছিল চক্ষু-শূল।
রাষ্ট্র-কূট আর ইতিহাস কভু জানতে না, ভাবুক মহান,
কর্ত্তব্য আর ভক্তির ভিতে গড়েছ স্বদেশসেবক-প্রাণ।
দেশের আত্মা বাড়াইলে তুমি দেশাত্মবোধ-পুরোহিত,
একই সূতায় গাঁথিলে আত্মা-ভগবান দেশহিত।

প্রথম অধ্যায়

রেলে উত্তর-ইতালি

লুগানো হইতে ইতালি-যাত্রা

১

কিয়াসোর পথে মিলানোয় পৌঁছিতে ইতালির এক বড় শহর পাওয়া গেল। নাম কোমো। হ্রদের উপর এই নগর অবস্থিত। পাহাড়ের গায়ে ঘরবাড়ীগুলা ইতালিয়ান-সুইস দৃশ্যই বহন করিতেছে। লুগানো হ্রদের মতন কোমো হ্রদও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আবহাওয়ায় ভরপূর। হ্রদটা আগাগোড়া ইতালির অধীন।

কোমোয় একজন সপত্নীক ইতালিয়ান এঞ্জিনিয়ার উঠিলেন। ইনি বহুকাল ছিলেন দক্ষিণ আমেরিকার আর্জ্জেন্টিনা দেশে। একাধিক ভাষায় দখল আছে। কখনো জার্ম্মাণে কখনো ফরাসীতে কথাবার্ত্তা বলিতে থাকিলেন। ইঁহার স্ত্রী কিছু-কিছু ফরাসী জানেন।

এঞ্জিনিয়ার বলিতেছেন :—"বড়গোছের ফ্যাক্টরি, কার্খানা, যন্ত্রপাতির প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি যাহা-কিছু ইতালিতে আছে সবই উত্তর ইতালির সম্পদ্। ফ্রান্সের লাগাও পিয়েমন্তে জেলা আর লম্বার্দি জেলা। এই দুই জেলার বাহিরে ইতালি একপ্রকার

কিয়াসো আর কোমোয় চিম্‌নির-ধোঁয়া কিছু-কিছু লক্ষ্য করিয়াছি। অবশ্য কথায়-কথায় রাইণ্‌ল্যাণ্ড অথবা বেলজিয়াম ইত্যাদি অঞ্চলের নাম মুখে না আনাই উচিত। শুনিলাম কোমো ইতালিয়ান রেশম-শিল্পের সর্ব্বপ্রধান আড্ডা।

২

মিলানো লম্বার্দির বড় শহর। ষ্টেশন দেখিয়া ভক্তি চটিয়া গেল। শহরের যে পাড়া দিয়া রেল গাড়ী চলিতেছে সেটা অতি ওঁছা। অথচ শুনিতেছি মিলানো ইতালিয়ান লক্ষপতিদের বাথান।

পুলিশের মাথায় শোভিতেছে "গারিবাল্‌দি টুপি।" প্যারিসে এই গড়নওয়ালা টুপিকে বলে "নেপোলিয়ানী টুপি।" পাহারাওয়ালা এবং ফৌজের গায়ে একপ্রকার ওভারকোট দেখিতেছি। ইহাকে আমাদের সুপরিচিত আলোয়ান হইতে তফাৎ করা কঠিন। গলার বোতাম আঁটা যায় বটে, কিন্তু হাতা নাই। আর, দুইদিক্‌কার বেড় এত চওড়া যে রীতিমতন "আলোয়ান মুড়ি" দিয়া যেন লোকেরা চলা-ফেরা করিতেছে।

জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে মেয়েরা শীতকালে যে-ধরণের "কেপ্‌" জাতীয় ওভারকোট ব্যবহার করে তাহা হইতে ইতালিয়ান পুরুষদের আলোয়ান্‌-প্রায় জামা স্বতন্ত্র। ইতালিয়ান নারীরা ভারতের সুপরিচিত "কম্ফার্টার" বা গলাবন্ধ ব্যবহার করে। তবে এই গলাবন্ধও আকারে-প্রকারে প্রায় আলোয়ানেরই

সমান। কোনো বোতাম নাই। সমস্ত ঘাড়পিঠ ঢাকিয়া সম্মুখে দুইধারে ঝুলিবার মতন লম্বা।

ভারতে মেয়েরা আলোয়ান ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত। ওভার-কোটের রেওয়াজ বোধ হয় সুরু হয় নাই। যদি কখনো এই-ধরণের জামা-জাতীয় কিছু চিজ ভারতে কায়েম হইতে থাকে তাহা হইলে "কেপ্"-শ্রেণীর পোষাক বোধ হয় ভারতবাসীর বেশী পছন্দসই হইবে। বিদেশে কোনো-কোনো ভারতীয় মহিলার গায়ে "কেপ্" দেখিয়া এইরূপ মনে হইয়াছে।

ডেলি প্যাসেঞ্জারদের গল্পগুজব

১

মিলানোয় নামা হইল না। গাড়ী বদলানো গেল। এতক্ষণ দক্ষিণে চলিতেছিলাম। এইবার গাড়ী ছুটিতেছে সোজা পূবে। বহুসংখ্যক "ডেলি প্যাসেঞ্জার" এখন সহযাত্রী। কেহ উকীল, কেহ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর, কেহ ব্যবসাদার ইত্যাদি।

আমার হাতে "করিয়েরে দেল্লা সেরা" দেখিয়া উকীল-বাবুটি ইতালিয়ান ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন :—"ইতালিয়ান আসে কি ?" ফরাসীতে জবাব :—"এইমাত্র ষ্টেশনে ইতালিয়ান ভাষার সঙ্গে প্রথম চাক্ষুব পরিচয়! দেখিতেছি, ফরাসী বা জার্ম্মাণ শব্দের আত্মীয় কতগুলা জুটে।" উকীল মহাশয় অন্য কোনো ভাষায় পটু নয় বুঝা গেল। ফরাসী, জার্ম্মাণ আর ইংরেজিও চেষ্টা করিয়া

ব্যবসায়ী বলিতেছেন :—"মিলানো ভারী শহর। এখানকার 'ব্রেদা কোম্পানী'র কার্‌খানায় খাটে ছয় হাজার মজুর। চাষ-আবাদের যন্ত্রপাতি, রেলগাড়ী, উড়োগাড়ী ইত্যাদি হরেক চিজই ব্রেদা ফ্যাক্‌টরিতে তৈয়ারি হয়। কার্‌খানাগুলাকে একটা ছোটখাটো শহরের ঘরবাড়ী বলিলেই চলে। কার্‌খানা হইতে কার্‌খানার মাল চালান করিবার জন্য রেলপথই আছে প্রায় পঁচিশ মাইল।"

মিলানোয় অটোমোবিলও তৈয়ারি হয়। "রমেঅ" কোম্পানীর গাড়ী ইতালিয়ান-সমাজে সুবিদিত। ব্যবসায়ী বলিলেন :—"ইতালির বাহিরে ফিয়াৎ কোম্পানীরই নাম আছে। তাহাদের ফ্যাক্টরিগুলা পিয়েমন্তে জেলার তোরিণো নগরে অবস্থিত।"

২

মুসলিনি-সম্বন্ধে কথা উঠিল। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষাশেষি (১৯২৪)। শীঘ্রই ইতালিয়ান পার্লামেণ্টের সভ্য বাছাই হইবে। মুসলিনির দল জয়ী হইতে পারিবে কি?

উকীল বলিতেছেন :—"ফ্রান্সের পোঁআকারে যা, আমাদের মুসলিনি তা। উভয়েই "ডিক্টেটর", একচ্ছত্র বাদশা-বিশেষ। তবে মুসলিনির মতন স্বদেশ-সেবক জগতে খুব কমই আছে। লোকটা চৌপর দিন-রাত দৈত্যদানবের মতন খাটিতে পারে। আর ইতিমধ্যে ইতালির শাসন-বিভাগে মুসলিনির প্রভাবে বহুবিধ সংস্কার সাধিত হইয়াছেও।"

ব্যবসায়ী বলিলেন :—"ঠিক কথা। কিন্তু উত্তর ইতালির

মজুর-মহলে মুসলিনি কল্‌কে পান না। আগামী বাছাই-কাণ্ডে পিয়েমন্তে আর লম্বার্দি জেলায় ফাসিষ্ট্‌রা ঢিট্‌ হইয়া যাইবে। উত্তর অঞ্চলগুলায় সোশ্যালিষ্ট্‌দের সঙ্গে টক্কর দিবার মতন ক্ষমতা অন্য কোনো দলের নাই।”

৩

“আহ্বান্তি” (আগুয়ান) কাগজ সোশ্যালিষ্ট দলের মুখপত্র। জার্ম্মাণ “ফোর্‌হ্ব্যার্টস্‌” আর ইতালিয়ান “আহ্বান্তি” এক-গোত্রের দৈনিক। “ফাশি” (সমিতি)-পন্থী ন্যাশন্যালিষ্টরা “পপল দিতালিয়া” (ইতালির জনসাধারণ) কাগজ চালাইয়া থাকে: “পপল”র সঙ্গে “আহ্বান্তি”র “ম্যাড়ার লড়াই” চলিতেছে অহরহ।

“করিয়েরে দেল্লা সেরা” (সান্ধ্য সংবাদ) একটা “বৈকালী।” নামেই প্রকাশ। ব্যাঙ্কের বাবুটি বলিতেছেন:—“করিয়েরে আহ্বান্তির দলেরও নয় পপল’র দলেরও নয়। ইতালির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন ইহার উদ্দেশ্য। এই কাগজের কর্ত্তারা দেশকে সোশ্যালিষ্ট্‌ এবং ন্যাশন্যালিষ্ট্‌ দুই দলের অত্যাচার হইতে বাঁচাইতে চেষ্টিত। ইহাদিগকে উন্নতিনিষ্ঠ উদারপন্থী বলা চলে।”

জার্ম্মাণিতে এবং সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে থাকিতে জার্ম্মাণ এবং ফরাসী কাগজে “করিয়েরে”র মত এবং টিপ্পনীই বেশী পড়িয়াছি। ব্যাঙ্কারের নিকট শুনা গেল:—“জগতের সকল বড় বড় দেশে

খাঁটি তথ্য প্রচার করা এই কাগজের এক প্রধান কাজ। ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্পকৃষি ইত্যাদি বিষয়েও করিয়েরেই ইতালির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৈনিক। সকল ক্ষেত্রে ওস্তাদ বাহাল করিয়া খবর সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। এইজন্য কর্ত্তারা টাকাও ঢালে প্রচুর।”

উত্তর ইতালির সেকেলে সীমানা

শীত প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু উত্তর ইতালিতে ঠাণ্ডা এখনো কমে নাই। গাড়ীর কামরাগুলা গরম করা ইতালিতেও দস্তুর দেখিতেছি। শুনিলাম এবার নাকি মায় রোম এবং নাপলি (নেপ্‌ল্‌স্) পর্য্যন্ত অর্থাৎ দক্ষিণ ইতালিতেও বরফ পড়িয়াছে। এই সকল অঞ্চলে বরফ পড়া একটা অঘটন-ঘটার সামিল। অর্থাৎ রোম নেপ্‌ল্‌স্ ইত্যাদি শহরে ইয়োরোপের সুপরিচিত শীত আসে না।

দুইধারের ক্ষেতগুলা আগাগোড়া সমতল। বুনো গাছগুলা ন্যাড়া ও ঠুঁটা-ভাবে বিচিত্র দেখাইতেছে। কদাকার বলিলেও দোষ হইবে না। তবে বহুদূর পর্য্যন্ত সারিসারি দেখা যাইতেছে বলিয়া চোখের আরাম জুটিতেছে মন্দ নয়।

আঙুরের মাচাঙ্‌গুলাও অবশ্য পত্রহীন। সর্ব্বত্রই “শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে।” দেখিতে দেখিতে ব্রেশিয়া শহরে উপস্থিত হইলাম। পাহাড়ের পায়ে ও গায়ে ইটপাথরের বাড়ীগুলা সুন্দর দেখাইতেছে। পাহাড়গুলা অবশ্য আল্পসের দক্ষিণ সীমানা।

১৯১৪ সালের অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারির টিরোল প্রদেশ প্রায় এই-

খানেই আসিয়া ঠেকিত। ১৯১৮-১৯ সালের হ্বার্সাই সন্ধি ইতালির উত্তর সীমানা বহু উত্তরে,—প্রায় ইন্‌স্‌ব্রুকের নিকট গিয়া ঠেকাইয়াছে। আগে ছিল বহু ইতালিয়ান নরনারী অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারির গোলাম। আজ কাল বহু জার্ম্মাণ (অষ্ট্রিয়ান্) নরনারী ইতালির অধীনে জীবনযাপন করিতেছে। দক্ষিণ টিরোল সীমান্তপ্রদেশ। কাজেই এই অঞ্চলে হয় ইতালিয়ানের উপর জার্ম্মাণের জুলুম, না হয় জার্ম্মাণের উপর ইতালিয়ানের জুলুম সনাতন কথা।

"ইতালির পথঘাট"

১

গাড়ীর ভিতর এক ইতালিয়ান মহিলার বোঁচকায় কতকগুলা এক-নামের মাসিক কাগজ দেখিতেছি। ইনি ভাঙা-ফরাসীতে বলিলেন :—"আমি এই মাসিকের 'প্রপাগাঁদ' করি।" অর্থাৎ ইনি কাগজটার আড়কাঠি।

কাগজটার নাম "লে হ্বিয়ে দিতালিয়া" (ইতালির পথঘাট)। বহু-সংখ্যক ফোটো-চিত্রে ভরা, অতি সুন্দর কাগজে ছাপা। উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেখিতেছি কম-সে-কম শতকরা প্রায় দশ পনরটা শব্দ পাক্‌ড়াও করা সম্ভব; প্রবন্ধগুলা ঠারে-ঠোরে বুঝাও যাইতেছে মন্দ নয়। রগড় বটে। ইতালিয়ান ভাষার কোনো ব্যাকরণ, "প্রথম পাঠ" বা অভিধান আজ পর্য্যন্ত হাতে নাড়াচাড়া করি নাই। একমাত্র ফরাসীর জোরে ইতালিয়ান লেখাগুলা কষ্টেসৃষ্টে সম্‌জিয়া লইতেছি। তবে একে "বুঝা" বলে না। মনে হইতেছে যে বেশ কিছু খাটা দরকার হইবে।

ইতালিতে বারকয়েক

ইতালির প্রত্যেক পল্লী ও শহরের যেখানে যা-কিছু সৌন্দর্য্যের খনি আছে সবই এই কাগজের আলোচ্য বিষয়; প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসাবে, ঐতিহাসিক ঘটনার তরফ হইতে, বাস্তু-গৌরব, স্থাপত্য এবং চিত্রশিল্পের লাইনেও ইতালি দেশ যে দেশী-বিদেশী সকল নর-নারীরই একটা "দেখিতব্য" মুল্লুক,—ইহাই হইতেছে পত্রিকার ভাবার্থ।

টুরিষ্ট, পর্য্যটক, প্রত্নতত্ত্বের গবেষক, সুকুমার শিল্পের সমজদার, স্বাস্থ্যান্বেষী, প্রকৃতিপূজক, কবি, ঔপন্যাসিক, চিত্রকর ইত্যাদি সকল শ্রেণীর "লিখিয়ে-পড়িয়ে" এবং পয়সাওয়ালা লোককে আকৃষ্ট করিবার জন্য ইতালিতে একটা বড় আড্ডা আছে। সেই আড্ডারই মুখপত্র এই মাসিকটা "লে ভিয়ে দিতালিয়া" বা ইতালি-প্রদর্শিকা। ইহা পাণ্ডার কাজ করিতেছে! বলা বাহুল্য, ছবিগুলা দেখিলেই, ইতালি-দেখার নেশা পাইয়া বসে।

২

স্বদেশের প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সৌন্দর্য্য বা সম্পদগুলা দেশীবিদেশী নরনারীর নিকট প্রিয় করিয়া তোলা একটা ব্যবসা সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান যুগে গান গাওয়া, ছবি আঁকা, ধর্ম্ম প্রচার করা সবই ব্যবসা। কিন্তু স্বদেশী সৌন্দর্য্য-সমূহের প্রচার, আলোচনা, অনুসন্ধান, আবিষ্কার, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ইত্যাদিকে স্বদেশ-সেবার, স্বদেশপ্রীতির, স্বদেশ-পূজার অঙ্গ বিবেচনা করিলেও অত্যুক্তি করা হইবে না।

এই হিসাবে জাপানীরা ফরাসীদের মতন, ইতালিয়ানদের

মতন, জার্ম্মাণদের মতন স্বদেশ-পূজক, স্বদেশসেবক, স্বদেশভক্ত। ভারতের নরনারী এই বিভাগে ইতালিয়ান, ফরাসী, জার্ম্মাণ, জাপানী ইত্যাদি জাতির সঙ্গে টক্কর দিতে পারিবে না। স্বদেশের সৌন্দর্য্য আবিষ্কার, প্রচার ও উপভোগ করিবার দিকে ভারতের যৌবনশক্তি কর্ম্ম-ক্ষেত্র ঢুঁড়িয়া বাহির করুক। স্বদেশ-পূজায় আমরা যেন বেশীদিন অন্য কোনো জাতির পিছনে পড়িয়া না থাকি।

৩

লম্বার্দির পল্লী-কুটীরগুলায় টেসিন (ইতালিয়ান স্বইট্‌সার্ল্যাণ্ড) বাসীদের ধরণ-ধারণ অনেকটা দেখিতেছি। ঘরবাড়ী নোংরা। গো ছাগল আর নরনারী যেন সকলে মিলিয়া একই ছাদের তলায় বসবাস করে। এখানে জার্ম্মাণ কিষাণদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সম্পদ্‌ ও পারিপাট্য লক্ষ্য করা যাইতেছে না।

কিষাণদের গোলাঘরের বারান্দা দেখিলে ভারতীয় পল্লীদৃশ্যই যেন চোখে পড়িবে। আমেরিকার কৃষকেরা কিরূপ সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবনধারণ করে, ইতালির পল্লীগুলা দেখিবামাত্র সে কথা মনে পড়িল। মার্কিণ কিষাণে আর ইতালিয়ান কিষাণে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। অবশ্য ভারতবর্ষ পাতাল হিসাবে ইতালিরও অনেক নীচে।

চাষ-আবাদের ঋতু এ নয়। তবুও কোনো কোনো মাঠে মেয়েপুরুষের অল্পবিস্তর কাজ-কর্ম্ম চলিতেছে। বলদে হাল টানে, ঘোড়ায় নয়। আবার ভারতীয় দৃশ্য। ভেঁড়ার পালও মাঝে-মাঝে দৃশ্যাবলীর বৈচিত্র্য সাধন করিতেছে।

বিশ্বশিল্পে ইতালিয়ান হ্রদ

এক অপূর্ব্ব হ্রদের সুনীল জলরাশি হঠাৎ চোখ টানিয়া লইয়া গেল। এধারে-ওধারে পাহাড়ের ওঠানামা। সুবিস্তৃত সাগর। লুগানো হ্রদের চেয়ে বড়। "লাগো দি গার্দা" নামে এই পাহাড়ী সাগর অষ্ট্রিয়ান-ইতালিয়ান সীমানায় বহু প্রকৃতি-পূজককে আকৃষ্ট করিয়াছে। এক্ষণে অবশ্য গার্দা পুরাপুরি ইতালির দখলে। সহযাত্রীর মুখে শুনিলাম :—"দান্নুনৎসিও কবি ; এই সাগরেরই উপকূলে বসিয়া গীতিকাব্য লিখিয়া থাকেন। পল্লীর নাম গার্দনে।"

রেলে বসিয়াই দুর্গ দুএকটা দেখা গেল। সেকালে—অর্থাৎ ১৯১৪ সালের যুগে এই সব দুর্গই ছিল অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইতালির আত্মরক্ষার যন্ত্র-বিশেষ। আজকাল আর এসব দুর্গের সামরিক কিম্মৎ নাই। কেননা ইতালির উত্তর সীমানা এখান হইতে সাতআট ঘণ্টার পথ।

গার্দা হ্রদের আবেষ্টনে স্বাস্থ্যনিবাস, সানাটোরিয়ুম, হাস-পাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। শীতকালেও নাকি মাজ্যরে, লুগানো ও কোমোর মতন গার্দার জলবায়ু বেশ মোলায়েম ও আরামদায়ক। জার্ম্মাণ চিত্রশিল্পী ড্যিরের আর কবিবর গ্যেটে দুইজনেই গার্দার প্রশংসা করিয়াছেন শতমুখে।

ইতালির পল্লীশহর ইংরেজি-সাহিত্যে অমর। সেকালের বায়রণ আর একালের ব্রাউনিঙ্ ইতালির "পথঘাট"গুলিকে ইংরেজি আসরে চিরকালের জন্য গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

ইতালিতে বারকয়েক

বায়রণ-ব্রাউনিঙের কবিতাবলী দস্তুর-মতন বুঝিতে হইলে ইতালির ভূগোল-ইতিহাস "নখদর্পণে" রাখা আবশ্যক।

এই ধরণের সাহিত্যে-গাঁথা ইতালির বিবরণ পাই আর এক ইংরেজ-বীরের রচনায়। সে যে-সে কবি নয়, স্বয়ং শেক্‌স্‌পীয়ার। কবিবরের নাট্য-সাহিত্যে ইতালির নবীন-প্রবীণ সবই প্রচুর-পরিমাণে বিরাজ করিতেছে।

গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল হ্বেরোণায়। বাঙালী-পর্য্যটক শেক্‌স্‌পীয়ার-রচিত "হ্বেরোণার তুই বাবু" মনে না আনিয়া পারে কি ?

হ্বেরোণা

বাদশাহী আমলের নিদর্শন হ্বেরোণায় কিঞ্চিৎ-কিছু আছে। "আরেণা"টা দেখিলে প্রাচীন ইয়োরোপের এক বাস্তগৌরব চোখে ভাসিবে। মিলানোর "আরেণা" নেপোলিয়নের হুকুমে গড়া। "আরেণা"-জাতীয় "আম্ফিথিয়েটার" ভারতে বা এশিয়ার কুত্রাপি কখনো গড়া হইয়াছিল কি ? হ্বেরোণার আরেণা "রোমাণ আমলে"র চিজ।

মহাকবি দান্তের মনুমেণ্ট হ্বেরোণার এক কীর্ত্তি! পিয়েত্রোতুর্গ এবং জেনো মন্দিরও প্রাচীন জীবনের সাক্ষী।

হ্বেরোণা আজকাল এমন-কিছু বড় শহর নয়। "সড়কের ধূলা খাইতে সাধ থাকিলে এখানে এক-বেলা কাটানো চলিতে পারে"—এইকথা বলিতে বলিতে এক গ্রীক ব্যবসায়ী স্ত্রীপুত্র লইয়া গাড়ীতে সওয়ারী হইলেন। নামিব কি না ইতস্তত করিতেছি। এমন সময়ে তাঁহারা আবার বলিলেন ঃ "আহা সখায়

ঝক্‌মারি।” যাহা হউক খানিকক্ষণ ষ্টেশনে পায়চারি করা গেল। বিকাল হইয়া আসিয়াছে। চা ইচ্ছা করিতেই বা আপত্তি কি!

রোম হইতে বার্লিন যাইতে হইলে হেবারোণার পথই সোজা। ত্রেন্ত, ইন্‌স্‌ব্রুক, মিউনিক্ হইয়া খাড়া উত্তরে যাত্রা করা হয়। হেবরোণায় লম্বার্দি জেলার শেষ আর হেবনেৎসিয়া জেলার সুরু। জার্ম্মাণ-ইতালিয়ান ব্যবসা-বাণিজ্যের স্রোত হেবরোণার আড়তে আড়তে কিছু-কিছু আসিয়া ঠেকে। সহযাত্রীর নিকট শুনা গেল :—“রেশম, চামড়া, ইত্যাদির কার্‌বার এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। হেবরোণার মর্ম্মর ইতালির বাহিরেও নামজাদা।”

দ্বিতীয় অধ্যায়

খৃষ্টান তীর্থরাজ পাদোহ্বা

পাদোহ্বার ঘরবাড়ী

১

হ্বেরোণা হইতে ঘণ্টা দুয়েকে পাদোহ্বায় পৌছানো গেল। এই শহরকে ফরাসীরা জানে "পাদু" বলিয়া। ইংরেজি নাম প্যাডুয়া। জার্ম্মাণদের উচ্চারণে ইহার রূপ পাডোহ্বা। ভারতবাসীও ইচ্ছা করিলে পাদোহ্বার এক ভারতীয় সংস্করণ জারি করিতে পারেন। বাধা দিবার কেহ নাই।

মাইলের পর মাইল চোখে পড়িল কেবল বিকট ন্যাড়া ডাল-পালাহীন গাছের সারি। মাঠগুলা সমতল। আশে পাশে দূরে অতি-দূরেও কোনো পাহাড়-পর্ব্বতের টিকি দেখা যাইতেছে না। শীত এবার জবর পড়িয়াছে—মায়, পাদোহ্বা অঞ্চলেও বরফ! ইতালি-য়ানরা হিন্দু হইলে এই ধরণের কাণ্ডকে বলিত "কাশীতেও ভূমিকম্প!" এখনও চাষের লক্ষণ মালুম হওয়া সম্ভব নয়।

ষ্টেশনে কেহই জার্ম্মাণও জানে না, ফরাসীও জানে না। শহরে প্রবেশ করিবার পথেই চুঙির আফিস। বাক্স পেঁট্‌রা খোলাখুলির ধূম পড়িয়া গেল। "নয়া কোনো চিজ আছে কি? থাকিলেই মাশুল!"

২

বড় সড়কটা মফঃস্বলের শহরের পক্ষে নিন্দনীয় নয়। কয়েকটা মস্ত মস্ত ইমারতও নতুন মাথা তুলিয়াছে। অনতিদূরে ফ্যাক্টরি মহাল্লার চিহ্নও দেখা যাইতেছে। একটা পুল (পন্তে মলিন) পার হইতে হইল।

ঘর-বাড়ীগুলা সাধারণতঃ দোতালা বা তেতালা। খিলান আর জানালার সারি মনোরম। বারান্দার স্তম্ভগুলা পর পর সাজানো। এই দৃশ্য গলি-ঘোঁচের ভিতরেও অজস্র। ইটের দালান। পাথরের রেওয়াজ বেশী নয়।

কোনো কোনো গলির দুই "ফুট পাথ"ই দালানগুলার বারান্দা বিশেষ। রাস্তার এক সীমা হইতে অপর সীমায় পৌঁছিতে আকাশের নীচে নামিতে হয় না। জল-বৃষ্টির সময়ও বিনা ছাতায়ই এইরূপ বারান্দা-ফুটপাথের সাহায্যে বহু দূর চলা-ফেরা করিতেছি।

আগাগোড়া পাড়াগাঁ বলিলেই চলে। বড় সড়কটায় যা কিছু শহুরে জীবনের ধূম-ধাম। মধ্যযুগের বাস্তু দু'একটায় জাঁক কিছু কিছু দেখিতেছি। ভারতীয় মফঃস্বলের দ্বিতীয় শ্রেণীর শহরে আর পাদোহ্বায় যেন বড় একটা প্রভেদ পাওয়া যাইবে না। তবে আধুনিক-

তার সাক্ষী এখানে বিজুলীবাতী আর তড়িতের ট্রাম। মোটর-কারও অবশ্য চলিতেছে। তবে বৃষ্টির সময় কাদা, আর রোদ উঠিলে ধূলা সকল রাস্তারই নিত্য-সহচর।

ইতালিয়ান নরনারীর রূপরঙ্

ইতালিয়ানদের চেহারায় ইতিমধ্যেই প্রধানতঃ দুই শ্রেণী দেখিতেছি। কোনো কোনো পুরুষকে জার্ম্মাণিতে কিম্বা ফ্রান্সে বা আমেরিকায় দেখিলে তাহাদিগকে নিশ্চয়ই ইহুদি বিবেচনা করিতাম। ইহুদি-জাতীয় নাক চোখ ও সাধারণ মুখশ্রী এ পর্য্যন্ত রেলে এবং পাদোহবার পথ-ঘাটে হামেশা পাইয়াছি। অথচ তাহাদের অনেকেই ইহুদি নয়, অর্থাৎ খৃষ্টান।

নাক চোখ ও মুখের ভঙ্গী ছাড়া ইহুদি চিনিবার আর এক উপায় হইতেছে গায়ের রঙ্। ইহুদিরা কিছু কালো। কাজেই ইয়োরামেরিকায় যে সকল ভারতসন্তান বসবাস করে তাহাদের রঙ্ কথঞ্চিৎ ফর্সা হইলে লোকে প্রথমেই তাহাদিগকে ইহুদি জাতির অন্তর্গত করিয়া বসে। কিন্তু অনেক স্থলেই কি মুখশ্রী কি রঙ্ দুইই ইহুদি, খৃষ্টান ও ভারতীয় ইত্যাদি জাতি-ভেদের কাজে ভুল সাক্ষ্য দেয়।

ইতালিয়ান নারী মহলেও "ইহুদি-সুলভ" মুখ চোখ এবং রঙ্ সর্ব্বদা চোখে পড়িতেছে। কিন্তু খাঁটি ইতালিয়ানদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে বুঝিতেছি, আমার অনুমান আগা-গোড়া অঠিক। অর্থাৎ খৃষ্টান ইতালিয়ান নর-নারী অনেকেই কিছু কালোও বটে। আর

তাহাদের মুখ কথঞ্চিৎ চ্যাপ্‌টা এবং নাকের মাঝখানটা কিছু উঁচাইয়াও উঠে।

ইহুদি ও খৃষ্টান জাতিভেদের "নৃতত্ত্ব"টা রপ্ত হইয়া গেলেও, ইতালিতে আর এক সমস্যায় আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়। যে সকল লোককে কোন মতেই ইহুদি শ্রেণীর অন্তর্গত করা যায় না, তাহাদেরও—অর্থাৎ খাঁটি শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান ইতালিয়ানদেরও অনেকেরই চুল কোঁক্‌ড়া। এইখানে নিগ্রো নৃতত্ত্বের মামলা। মিশরের মুসলমান মহলে এই ধরণেরই চুল দেখা যায়।

চুলগুলা কেবল কোঁক্‌ড়া মাত্র নয়। অনেকটা উস্‌খু-খুস্‌কুও বটে। ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোদের মাথায় প্রায় এই ধরণের চুলই দেখিয়াছি। ইতালিতে বলিব যে—উত্তর আফ্রিকার চুল বিরাজ করিতেছে। এ ঠিক নিগ্রো চুল নয়।

বলা বাহুল্য, বিশেষত্বহীন, "ইয়োরোপীয়ান-সুলভ" অঙ্গপ্রত্যঙ্গও পাদোহ্বার হাটে-বাজারে নজরে আসিতেছে। কিন্তু এই সকল মামুলি ধাচের ইতালিয়ান নর-নারীকে দেখিবামাত্র জার্ম্মাণ বলিয়া ভ্রম হওয়া কঠিন। শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান ইতালিয়ানরা "ছিপ্‌ছিপে" "রোগা"। অর্থাৎ বহরে তাহারা সাধারণতঃ বিশাল নয়। অধিকন্তু চুল তাহাদের কালো বা কৃষ্ণাভ অথবা বাদামি। কিন্তু জার্ম্মাণরা সাধারণতঃ "ব্লণ্ড্‌" বা শ্বেতাভ-লাল চুলের অধিকারী। আর জার্ম্মাণদের বপু—স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই—বেশ কিছু বিস্তৃত-পরিমাণ আকাশ দাবী করিতে অভ্যস্ত।

ইতালিতে বারকয়েক

পারিবারিক জীবন ও গৃহস্থালী

১

শীতকালেও ঘর গরম করা ইতালিয়ানদের দস্তুর নয়। কাজেই চীন-জাপান-ভারতের লোকজনের মতন ইতালিয়ান নর-নারীও শীত বরদাস্ত করিতে ভয় পায় না। কিন্তু ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইংরেজ, আমেরিকান ইত্যাদি পাশ্চাত্যেরা ফেব্রুয়ারী মাসে বাঘা শীতের জন্য প্রস্তুত থাকে। চৌপর দিন ঘর গরম রাখা তাহাদের দস্তুর। এই সব জাতীয় লোক ইতালিতে আসিলে মহা বিপদে পড়ে। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর হোটেল ছাড়া ইতালির কোনো শহরে ঘর গরম করিবার আয়োজন নাই। অবশ্য এই ধরণের হোটেলে বসবাস করা বহু লোকের পয়সায়ই কুলায় না।

বেচারা ভারত-সন্তান দশ বৎসর ইয়োরামেরিকায় থাকিতে থাকিতে শীতকালে গরম ঘরের মহিমা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছেন! পাদোহ্বায় পদার্পণ করা মাত্র ইতালিতে এই হিসাবে "আধুনিকতার অভাব" বেশ লক্ষ্য করিতেছি। ইহারই নাম "গরীবের ঘোড়া রোগ"! শীত যদিও দিল্লী লাহোরের মাত্রা ছাড়ায় না, তবুও ঠাণ্ডা ঘরে কয়েক ঘণ্টা কাটানো এক প্রকার অসম্ভব বোধ হইতেছে।

শাস্ত্রে আছে,—"শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়!" সুতরাং ঠাণ্ডা ঘরে বসবাস করা ইতালিয়ান, জাপানী, চীনা, ভারতবাসী ইত্যাদির পক্ষে একটা অতি-কিছু কৃচ্ছ সাধন

নয়। কিন্তু অপর দিকে, একবার গরম ঘরের মায়ায় পড়িলে সে মায়া কাটাইয়া উঠা রক্তমাংসের শরীরের পক্ষে অতি মাত্রায় সংযম পালন,—যাহার শেষ নিষ্পত্তি হয় সর্দ্দি-কাসিতে, ইনফ্লুয়েঞ্জায়, ম্যালেরিয়ায়।

যাহা হউক, একজন ছোটখাটো জমিদারের ঘরে অতিথি হইয়াছি। ইতালিয়ান জমিদারকে বলে "বারোণ"। তাঁহার পত্নী অষ্ট্রিয়ান (জার্ম্মাণ)। কাজেই বাড়ীতে উনন জ্বালিয়া ঘর গরম রাখা হইতেছে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইহাকে "জার্ম্মাণ কুণ্টুরে"র এক অঙ্গ বিবেচনা করিতে হইবে। কেন না "বারোণ" শ্রেণীর অন্যান্য ইতালিয়ান পরিবারে ঘর গরম করা হয় না। বাবু ব্যবসাতে চিকিৎসক। আবার অধ্যাপক হিসাবে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও নাম লেখানো আছে।

২

পরিবারে এক শিশু। ছেলে শাসন করিবার কায়দা দেখিতেছি—ইতালিয়ান বাবুটি প্রায় ভারতবাসীরই মাসতুত ভাই। মারপিট, চেঁচামেচি, চোখরাঙানি ইত্যাদি যন্ত্র কায়েম হইয়া থাকে যখন তখন। জননী এ বিষয়ে বিপরীত। এতদিন ইয়োরামেরিকার পরিবারে পরিবারে শিশু-সন্তানের লালন-পালন যতটুকু দেখিয়াছি, তাহাতে লাঠ্যৌষধি নজরে পড়ে নাই। ছেলেপুলেদিগকে কথায় কথায় ট্যা ট্যা করিতেও দেখি নাই।

বাড়ীতে দুই ঝী ঘরের কাজ করে। ইহারা আসিয়াছে বাবুর জমিদারী হইতে। বেতন দিতে হয় না। খোরপোষ পাইয়া

তাহারা সন্তুষ্ট। প্রত্যেক উঠা-বসায় তাহারা গিন্নীকে "বারোণা" রূপে সম্বোধন করিয়া থাকে।

এক অদ্ভুত চিজ খাওয়া যাইতেছে। নাম "বোলেন্তা"। ভুট্টার আটা সিদ্ধ করিয়া আগুনে সেঁকা হয়। খাইতে হয় গরম গরম। বাবুটি দুইবেলা বোলেন্তা খান। সঙ্গে থাকে স্যালাডের কচি পাতা। ব্যস্। ইহাতেই তিনি খুসী। গিন্নী জার্ম্মাণ কন্যা। তাঁহার পক্ষে "বোলেন্তা" গলাধঃকরণ করা যে-সে কথা নয়। জার্ম্মাণদের বিবেচনায় বোলেন্তা "ছোট লোকের" খাদ্য। বড় জোর সপ্তাহে একবার করিয়া মুখ বদলানো চলিতে পারে!

অষ্ট্রিয়ানরা রান্নাবাড়িতে ওস্তাদ। রান্নাবাড়ি বলিলে ঘরকন্নার সকল প্রকার কাজই বুঝিতে হইবে। এই হিসাবে ইতালিয়ানরা নাকি নেহাৎ পশ্চাৎপদ। শুনিলাম:—"অতি উচ্চশ্রেণীর ভদ্র-লোকের মেয়েরাও না জানে ঘর সুন্দর রাখিতে, না জানে রান্নাঘরের কোনো কাজ সামলাইতে। তাহারা বাড়ীর বাহিরে আসিবার সময় খুব দামী পোষাক পরিয়া লোক সমাজে দেখা দেয়। কিন্তু ঘরের ভিতর বিরাজ করে নোংরামি, শৃঙ্খলাহীনতা আর দুর্গন্ধ।" কথাগুলা পূরাপূরি বাঙালীর মাপে বুঝিতে হইবে না।

৩

ইতালিয়ানদের ঘরকন্না কিরূপ—এখনই বিচার করিতে বসা কঠিন। (কিন্তু জার্ম্মাণ-অষ্ট্রিয়ানরা যে এ বিষয়ে উচ্চতর মাপকাঠি অনুসারে নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি চালাইয়া থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই)

জার্ম্মাণদের রান্নাঘরে প্রবেশ করিলে আগন্তুক মাত্রের আনন্দ

হয়। দেখা যায়,—নুন, চিনি, ঘি, চর্ব্বি, মশলা, আটা, তরকারী ইত্যাদি প্রত্যেক জিনিস যথাস্থানে রক্ষিত হইতেছে। ভাঁড়গুলার গায়ে ছাপার অক্ষরে প্রত্যেক জিনিসের নাম লেখা থাকে। এমন কি দেওয়ালের, টেবিলের এবং আলমারির কোন্ কোনে কোন্ ভাঁড়টার ঠাঁই তাহাও ছাপার অক্ষরে দেখিতে পাই। বাসন-কোসন পরিষ্কার করিবার জন্য যে তোআলে বা ন্যাকরা ব্যবহৃত হয়, তাহার স্বতন্ত্র ঠাঁই আছে। টেবিল পরিষ্কার করিবার ন্যাকরার ঠাঁই স্বতন্ত্র। আবার হাত মুছিবার জন্য তোআলেও স্বতন্ত্র জায়গায় ঝুলাইয়া রাখা হয়।

জার্ম্মাণ-সমাজের যেখানে যেখানে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছি, সর্ব্বত্রেই এইরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আর নিয়মবদ্ধতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইয়াছে। প্রত্যেক পরিবারের গিন্নীই অতিথিকে নিজ রান্নাঘরটা দেখানো এক চরম গৌরব ও গর্ব্বের বিষয় বিবেচনা করিয়া থাকে। অতি উচ্চশিক্ষিতা নারীও হেঁসেল-ঘরের রাণী রূপে নিজের কৃতিত্ব জাহির করিতে লজ্জা বোধ করে না।

৪

আমেরিকার রান্নাঘরেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য করিবার বস্তু। তবে জার্ম্মাণরা এ বিষয়ে বোধ হয় একেবারে চরমে গিয়া ঠেকিয়াছে। ইতালিয়ানরা জার্ম্মাণদের নিকট পারিবারিক সুখ-স্বচ্ছন্দতার নিয়ম শিখিয়া থাকে। ঠাকু'মা বা ঠানদির নিকট যাহা কিছু শিখা যায়, জার্ম্মাণ বালিকারা একমাত্র তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে
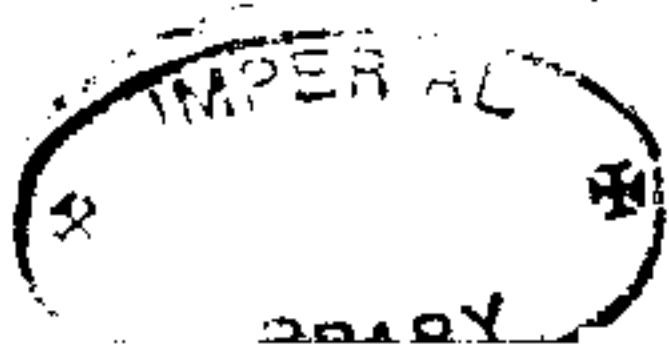
না। গিন্নীপনার বিদ্যালয় জার্ম্মাণিতে আর অষ্ট্রিয়ায় বিশেষ ইজ্জদ্-জনক প্রতিষ্ঠান। এই সকল প্রতিষ্ঠানে বড়ঘরের মেয়েরাও হাতে-কলমে গিন্নী হইতে শিখে।

এই বিদ্যাপীঠে কয়েক বৎসর কাটাইয়া যাহারা সংসারে প্রবেশ করে, তাহারা কম-সে-কম দুই হাজার "পদ" রাঁধিতে শিখে। "শুক্তানি হইতে আরম্ভ করিয়া ভুনী খিঁচুড়ি বা পোলাও কোপ্তা" ইত্যাদি বলিলে ভারতে নবরসের খানাপিনার বিশ্বকোষ সম্পূর্ণ হয়। জার্ম্মাণ বালিকারা ইয়োরামেরিকান খানাপিনার বিশ্বকোষখানা পূরা-পূরি দখল করিতে বাধ্য থাকে।

ইহার ভিতর "পিঠাপুলি পক্বান্নের" কোনো কিছু বাদ যায় না। পেটের অসুখ হইলে কিরূপ পথ্য দরকার, তাহাও গিন্নীপনার বিদ্যা-পীঠে জানা হইয়া যায়। দাঁতের ব্যথা, সর্দ্দি, জ্বর ইত্যাদি ব্যাধি হিসাবে পথ্য তৈয়ারী করা গিন্নীগিরির অন্তর্গত। এক কথায়, পরিবার যদি ঘটনাচক্রে রোগীর বাথানে বা হাস্‌পাতালে পরিণত হয়, তাহা হইলে জার্ম্মাণ গিন্নীরা পথ্য তৈয়ারি সম্বন্ধে হা-হুতাশ করে না।

রান্নাবাড়ির শিক্ষায় আগুনের তাপ ও মাত্রা, খাদ্য দ্রব্যের রাসায়ণিক দোষগুণ ইত্যাদি "বৈজ্ঞানিক" তথ্যও প্রচারিত হয়। অধিকন্তু, খরচপত্রের অঙ্ক কষিয়া এক একটা খানার দাম নির্দ্ধারণ করাও গিন্নী-বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের শিক্ষণীয়।

৫

রান্নবাড়ি আর রোগীসেবা গৃহস্থালীর দুই বড় কাজ। আর এক বড় কাজ হইতেছে কাঁথা শেলাই করা, জামা মেরামত করা,

আর কাপড় চোপড় ধোলাই করা। অর্থাৎ বুনন বলিলে যাহা কিছু বুঝা যায়—জার্ম্মাণ "হাউস-হাল্‌টুঙস্‌-শুলে"তে তাহার সকল দফাই শিখিতে হয়। কাপড় কাচা বড় সহজ চিজ নয়। তুলা, লিনেন, রেশম, পশম ইত্যাদি ভেদে ধোলাই-ভেদ হইয়া থাকে। তাহার উপর ইস্ত্রী করার ঝঞ্ঝাট ও রকমারি বলাই বাহুল্য।

গৃহস্থালী এইখানেই সম্পূর্ণ হয় না। ঘরের ভিতর-বাহির পরিষ্কার করা আর মেরামত সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান রাখাও গিন্নীগিরির সামিল। তাহার উপর চেয়ার টেবিল ইত্যাদি আসবাব-পত্রের সেবা আছে। ছবি, মূর্ত্তি ইত্যাদি স্থকুমার শিল্পের সৌখীন দ্রব্যে ঘর সাজাইবার কায়দাও না শিখিলে গিন্নীর লাইনে কেহ ওস্তাদ হইতে পারে না। অধিকন্তু, সঙ্গীত এবং শারীরিক ব্যায়ামের জন্য এই বিদ্যা-পীঠেই ছাত্রীদের অভ্যাস গড়িয়া তোলা হয়।

শুনিতেছি, ইতালিতে গিন্নী-শিল্পের জন্য এই ধরণের কোনো রূপ উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নাই। প্রায় "প্রিমিটিভ" বা আদিম অবস্থায়ই ইতালিয়ানদের পারিবারিক জীবন চলিয়া থাকে। ইহারা বৈঠকখানাটা ফিট্‌ফাট রাখে। কিন্তু রান্নাঘর, শোবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর ইত্যাদি কুঠ্‌রিতে অতিথিকে লইয়া যাইতে ইতস্ততঃ করে।

স্বদেশসেবায় মাৎসিনি বনাম গারিবাল্‌দি

১

মফঃস্বলের শহরে ও চৌরাস্তায় স্থাপত্যের ছড়াছড়ি দেখিতেছি। শহরের অতি লোক-সমাগমপূর্ণ স্থানে "পিয়াৎসা কাহ্বুর।"

পিয়াৎসা শব্দের অর্থ প্লাস, প্লাট্স্ বা প্লেস্, অর্থাৎ চৌরাস্তা জাতীয় রাস্তার উপরকার উঠান বিশেষ।

"পিয়াৎসা গারিবাল্দি"ও শহরের বড় কেন্দ্র। কাহ্বুরের কৌটিল্য-নীতি আর গারিবাল্দির সমর-শক্তি ইতালিকে অষ্ট্রিয়া হইতে স্বাধীন করিয়াছে। সে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের কথা। হ্বেনেৎসিয়া এবং লম্বার্দি এই দুই জেলা অর্থাৎ গোটা উত্তর ইতালি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারির অধীনস্থ প্রদেশ ছিল। কাজেই উত্তর ইতালির লোকেরা উঠিতে বসিতে এই দুই কর্ম্মবীরের মূর্ত্তি দেখিতে পাইবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে।

সেই যুগের "রিসর্জিমেন্ত" বা বিপ্লব-প্রচেষ্টায় পিয়েমন্তে প্রদেশের রাজা বা নবাব বিপ্লবীদের সহায় হন। তাঁহার নাম হ্বিক্তর এমানুয়েল। পিয়েমন্তে উত্তর-ইতালির পশ্চিমতম জেলা,—ফ্রান্সের লাগাও। হ্বিক্তর এমানুয়েলের বিরাট মূর্ত্তিও পাদোহ্বা-বাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বিশ্ববিত্থালয়ের একজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম:—"রিসর্জিমেন্তর সকল বীরেরই মূর্ত্তি দেখিতেছি। কিন্তু মাৎসিনির মনুমেণ্ট কোথায়?" সে "মাৎসিনি পিয়াৎসায়" লইয়া গিয়া বলিল:—"এই দেখুন মাৎসিনি-মূর্ত্তি।" পাড়াটা ঠিক জাঁকজমকপূর্ণ নয়, কিন্তু মূর্ত্তি অন্যান্য মূর্ত্তিগুলার জুড়িদারই বটে।

২

মাৎসিনিকে ইয়োরোপে এবং ভারতে যত বড় বিবেচনা করা হইয়া থাকে, ইতালিয়ানরা স্বয়ং তত বড় বিবেচনা করে না।

ইতালিয়ানদের চিন্তায় বীর ত বীর গারিবাল্‌দি বীর। গারিবাল্‌দি বড় কি কাহ্বুর বড়—ইতালিতে এই বিষয়ে তর্ক-প্রশ্ন চলে। কিন্তু গারিবাল্‌দি বড় কি মাৎসিনি বড়, অথবা কাহ্বুর বড় কি মাৎসিনি বড় – এই ধরণের সওয়াল সাধারণতঃ উপস্থিত হয় না।

ভারতে ১৯০৫ সাল যাঁহারা সুরু করিয়াছিলেন তাঁহারা মাৎসিনি এবং গারিবাল্‌দি এই দুইজনকে সমান চোখেই দেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন। এই দুই জনের চিন্তা ও কর্ম্মরাশি ভারতীয় জননায়ক-গণকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে বিশেষ রূপেই অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। বলিতে কি, মাৎসিনি-গারিবাল্‌দি ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের দীক্ষাগুরু-স্থানীয়। তাঁহাদের নাম জপ করা সেকালে স্বাদেশিকতার অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইত।

মাৎসিনি আদর্শ-প্রচারক, ভাবুক, দার্শনিক। যুবক ইতালিকে কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া তিনি স্বাধীনতার পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পথ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া আর একটা জাতিকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া দুই স্বতন্ত্র বস্তু।

ইতালিয়ান যুবক বলিতেছেন—"সেনাপতি গারিবাল্‌দির সমর-প্রচেষ্টাই ইতালিকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছে। জনসাধারণ সেই কর্ম্মবীরের অসাধ্য-সাধনই পূজা করিতে অভ্যস্ত। দার্শনিক, কবি বা আদর্শ-প্রচারকের সাহায্যে সে যুগের ইতালিবাসীর চিত্ত কতখানি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা আলোচনার সামগ্রী। বলা বাহুল্য, দেশের সাধারণ লোক সে সব বুঝে সুঝে না। গারিবাল্‌দি না থাকিলে ইতালি স্বাধীন হইত না,—এ কথা যে-সে লোকই বুঝিতে পারে। কিন্তু মাৎসিনির মতন লোক না থাকিলে ইতালিয়ান

জাতি স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিত না,—এ কথা স্বীকার করিতে বহু লোকই রাজি হইবে না।”

৩

স্বদেশ-সেবা, স্বার্থত্যাগ, কষ্ট-স্বীকার, নির্য্যাতন ভোগ ইত্যাদি হিসাবে মাৎসিনি-গারিবাল্‌দিতে উনিশ-বিশ করিতে বসিবার প্রয়োজন নাই। বরং অনেকে হয় ত মাৎসিনিকে উচ্চতর স্থানই দিবে।

কিন্তু স্বাধীনতা চিজটা বক্তৃতার বা লেখালেখির মাল নয়। “কেজো” লোকের বীরত্ব, কেজো লোকের ধড়িবাজি, লাঠিশোটার আওয়াজ, এই সব যেখানে নাই, স্বাধীনতা সেখানে মুখ দেখায় না। গারিবাল্‌দি এই কেজো লোকের একজন। এই জন্যই ১৯২৪ সালের ইতালিতে গারিবাল্‌দি যত বড়, মাৎসিনি তত বড় নন। এই কারণেই আবার কাহ্‌বুরও মাৎসিনির চেয়ে ইতালিয়ান সমাজে বেশী পরিচিত। ইতালি চোখে দেখিয়া এইরূপই বুঝিতেছি।

অথচ যখন গোটা ইয়োরোপের সাহিত্য বা দার্শনিক চিন্তার ধারা আলোচনা করিতে বসি, তখন দেখি যে, মাৎসিনির কিম্মৎ অতি উঁচু। উনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় চিন্তামণ্ডলে মাৎসিনি এক যীশুখৃষ্ট বিশেষ। চিন্তায় আর কর্ম্মে এই প্রভেদ। কর্ম্মবীর পূজ্যতে স্বদেশে, দুনিয়ায় পূজ্যতে চিন্তাবীর,—এই সূত্র প্রচার করিতে প্রলুব্ধ হইতেছি। চিন্তা জিনিসটা বিশ্ববাসীর সম্পত্তি,—কর্ম্মের প্রভাব প্রধানতঃ স্বজাতি ও স্বদেশের দেওয়ালের ভিতর ঘেরাও হইয়া থাকে।

ইতালিতে বারকয়েক

যুবক দুনিয়া,—"যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্"! পথগুলা সবই বড়, সবই মহান, সবই উঁচু। কিন্তু কে কোন্ পথে চলিবে, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ খেয়াল, শক্তি ও সুযোগের উপর নির্ভর করে।

স্থাপত্যের ছড়াছড়ি

পাদোহ্বার পথঘাটে ইতিহাস-বিশ্রুত বিজ্ঞানবীর, সাহিত্যবীর ইত্যাদির "বাস্তুভিটা"র সঙ্গে পরিচিত হইতেছি। গালিলেও নামক জ্যোতির্ব্বিদের কথা ভারতে কে না জানে? সেই যুগ-প্রবর্ত্তক বৈজ্ঞানিকের পর্য্যবেক্ষণালয় এই শহরেরই এক স্মৃতিস্তম্ভ।

কবিবর পেত্রার্কা (১৩০৯-১৩৭৪) ছিলেন ইতালির অন্যতম যুগান্তর-সাধক। ভারতে আমরা অন্ততঃ এইটুকু জানি যে, তিনি ছিলেন প্রেমের কবি। আর, "সনেট" বা চতুর্দ্দশপদী কবিতা-বলীর জন্মদাতা রূপেও পেত্রার্কা ভারতে পরিচিত বটে। বোধ হয় মধুসূদনের কাব্যে পেত্রার্কার কিছু পরিচয় আছে। সেই পেত্রার্কার মূর্ত্তিও পাদোহ্বায় দেখিলাম।

মহাকবি দান্তে (১২৬৫-১৩২১) কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের লোক। তাঁহার বিরাট মূর্ত্তিও দেখিতেছি "প্রাত দেল্লা হ্বাল্লে" নামক পিয়াৎসায় বা পার্ক-সদৃশ চৌরাস্তায়। পার্শ্বেই বিরাজ করিতেছে চিত্রশিল্পী জ্যত্তর মূর্ত্তি। জ্যত্ত দান্তের সমসাময়িক। দান্তেকে ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দীর যুগাবতার বিবেচনা করা চলিতে পারে।

"প্রাত দেল্লা হ্বাল্লে" এক অপূর্ব্ব বাগান। গড়নে ডিম্বাকৃতি।

সীমানার উপর সারি সারি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। মূর্ত্তিগুলায় হ্বেনেৎসিয়া প্রদেশের মধ্যযুগ বাঁচিয়া রহিয়াছে।

মূর্ত্তি গড়িতে ইতালিয়ানরা চিরকালই ওস্তাদ। পাদোহ্বার মতন একটা ছোটখাটো শহরেও "রূপদক্ষ"দের তৈয়ারি এতগুলা স্থাপত্য একটা বিশেষ-কিছু, সন্দেহ নাই। ইয়োরোপের সকল দেশেই স্থাপত্যের এত ছড়াছড়ি দেখা যায় না।

ইতালির দোস্ত্ ইংরেজ

১

ব্যবসাপাড়ার এক কাফেতে খানিকক্ষণ কাটানো গেল। পাশেই এক ব্যক্তি গম্ভীর ভাবে কাগজ পড়িতেছে দেখিতেছি। বিশেষ মনোযোগের সহিত ইনি "ষ্টক-এক্স্‌চেঞ্জে"র দরগুলা পড়িতেছেন। নয়া-পুরাণা কতকগুলা চিঠির তাড়া কাফির পেয়ালার নিকট টেবিলের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। পরিচয়ে জানা গেল ইনি দালাল। ফরাসী এবং জার্ম্মাণ দুই-ই তাঁহার জানা আছে। পূর্ব্বে হ্বিয়েনায় গতিবিধি ছিল।

দালাল মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম:—"ফরাসীদের সঙ্গে ইতালির বন্ধুত্ব আর কত দিন টিকিবে?" ইনি বলিতেছেন:— "লড়াই থামার পর হইতেই ফ্রান্সের সঙ্গে ইতালিয়ানদের মন-কষাকষি চলিতেছে। মুসলিনির আমলে আজকাল শেয়ানায় শেয়ানায় কোলাকুলি ছাড়া আর কিছু নাই। ফ্রান্সের সঙ্গে বনিবনাও হওয়া ইতালির পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব।"

অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে ইতালির ঝগড়া ছিল ত্রেন্তিনো বা দক্ষিণ টিরোল লইয়া। আর একটা বিবাদের কারণ ছিল আদ্রিয়াতিক সাগরের ত্রিয়েস্তে বন্দর। দুই মুল্লুকই আজকাল যুদ্ধের ফলে ইতালির হাতে। কাজেই অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখিয়া চলাই ইতালির বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতি।

আর, জার্ম্মাণির সঙ্গে প্রকৃত প্রস্তাবে ইতালির কোনো ঝগড়াই ছিল না। বর্ত্তমানে মুসলিনি জার্ম্মাণির সপক্ষে ইতালির চিত্ত গড়িয়া তুলিতেছেন। দালাল মহাশয়ের নিকট শুনিলাম :—"জার্ম্মাণ ভাষা শিখিবার দিকে ইতালির ছাত্র সমাজে বিশেষ আগ্রহ দেখিতে পাইবেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ইস্কুল-কলেজে জার্ম্মাণ একপ্রকার অবশ্য পাঠ্য। তাহা ছাড়া, ইতালির বড় বড় ফ্যাক্‌-টরিতে জার্ম্মাণ এঞ্জিনিয়ার ও রাসায়ণিক বাহাল করিবার ঘটা পড়িয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণির শিল্প-বিজ্ঞানও বাণিজ্য-শক্তির সাহায্য না পাইলে ইতালি উন্নতি-লাভ করিতে পারিবে না।"

২

ফ্রান্সের সঙ্গে আড়াআড়িই আজকাল ইতালির রাষ্ট্রীয় জীবনের বড় কথা। দালালের নিকট এক কাগজওয়ালা আসিয়া বসিলেন। তিনি ফরাসী জানেন। ইতালিয়ান পররাষ্ট্র-নীতির চর্চ্চা চলিতে থাকিল।

কাগজওয়ালা বলিতেছেন :—"ভূমধ্য সাগর লইয়া ইতালিতে ফ্রান্সে ঠোকাঠুকি অনিবার্য্য। জার্ম্মাণির সঙ্গে এই বিষয়ে ইতালির কোন গোলযোগ হইতেই পারে না। স্পেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব আমাদের

পাকিয়া উঠিতেছে। রুশিয়াকে হাত করিবার জন্ত মুসলিনির চেষ্টার ক্রটি নাই।”

জিজ্ঞাসা করিলাম :—“ভূমধ্য সাগরের আসল মালিক ত ইংরেজ। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে ইতালির যোগাযোগ আজকাল কিরূপ ?” জবাব :—“ইংরেজের নিকট ইতালি অনেক কিছু পাইয়াছে। ১৯১৫ সালে লণ্ডনে যে গুপ্ত সন্ধি হয়, তাহার জোরেই আমরা অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে লড়িতে গিয়াছিলাম। কথা ছিল, যুদ্ধে জয়লাভ হইলে উত্তর ইতালির ত্রেন্তিনো প্রদেশ আর ত্রিয়েস্তে বন্দর আমরা পাইব। ইংরেজের সাহায্যে ইতালির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। কাজেই সকল বিষয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে এক মতে কাজ করা ইতালিয়ানদের স্বার্থ।”

আফ্রিকার কেনিয়া প্রদেশের জুবালাণ্ড জেলা লইয়া আলোচনা হইল। এই মুল্লুকটাও ১৯১৫ সালের গুপ্তসন্ধি অনুসারে ইতালির পাওয়ার কথা। কিন্তু এখনও ইংরেজ ইতালির হাতে জুবালাণ্ডের দখল সমঝাইয়া দেয় নাই। কাগজওয়ালা বলিতেছেন—“এই লইয়া মুসলিনি-র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডে কথা কাটাকাটি চলিতেছে। আপোষ হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী।”

দি স্কন্ত ব্যাঙ্কের ঠাঁইয়ে ক্রেদিত বাঙ্কা

“বাঙ্কা নাৎসিঅনালে দি ক্রেদিত” নামক ব্যাঙ্কের এক শাখা কাহ্বুর চৌরাস্তার উপর অবস্থিত। ভিতরে প্রবেশ করিয়া ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করা গেল। ব্যাঙ্কটা গত বৎসর

ইতালিতে বারকয়েক

১৯২১ সালে "বাঙ্কা ইতালিয়ানা দি স্কন্ত" নামক রোমের বিপুল ব্যাঙ্ক ফেল মারে। ব্যাঙ্ক ফেল মারার কারণ অতি সোজা। লোকেরা যে টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখে, ব্যাঙ্কওয়ালারা সেই টাকা লোহার সিন্দুকে পুঁতিয়া রাখে না। সেই টাকা নানা ব্যবসায়ে খাটাইয়া লাভ উঠানোই ব্যাঙ্কের কাজ। যে যে ব্যবসায়ে টাকা খাটিতেছে, সেই ব্যবসাগুলার এদিক-ওদিক ঘটিলেই ব্যাঙ্ক স্বয়ংই টলমল করিতে বাধ্য।

লড়াইয়ের হিড়িকে "দিস্কন্ত বাঙ্কা"র জন্ম হয়। ইতালিতে লোহা-লক্কড়ের যন্ত্রপাতির কারবার পূর্ব্বে এক প্রকার ছিল না বলিলেই চলে। ইতালিয়ান শিল্পপতিরা ভাবিয়াছিল যে,যুদ্ধসামগ্রী জোগাইবার অর্ডার পাইলে লোহা-লক্কড়ের কারখানা ইতালিতে পা গাড়িতে পারিবে।

যুদ্ধের সময়টায় গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে অবশ্য কারখানাগুলা চলিতেছিল একপ্রকার ভালই। কিন্তু লড়াই থামিবার পর গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে লোহার কারখানায় নিয়মিত প্রচুর চাহিদার আমল উঠিয়া যায়। কাজেই ইতালির "স্বদেশী" লোহার কারখানাগুলা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে থাকে।

এই সব লোহার ব্যবসায়েই দিস্কন্ত ব্যাঙ্কের টাকা লাগানো হইয়াছিল অনেক। কারখানাগুলার বিপদের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কটা লইয়াও টানাটানি পড়ে। গভর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া ইতালিয়ান নর-নারীকে সর্ব্বনাশ হইতে বাঁচাইতে পারিয়াছে। "দিস্কন্ত" ব্যাঙ্ককে তুলিয়া দিয়া তাহার ঠাঁইয়ে, তাহার জমাপুঁজি কাগজপত্র লইয়া একটা নতুন ব্যাঙ্ক কায়েম করা হইয়াছে। তাহারই নাম "বাঙ্কা নাৎসিঅনালে দি ক্রেদিত।"

ম্যানেজার বলিলেন ঃ—"পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাঙ্কে যাহাদের টাকা জমা ছিল, তাহাদিগকে প্রায় দশ আনা অংশ দিয়া নয়া ব্যাঙ্কের সূত্রপাত করা হইয়াছে। এই নতুন প্রতিষ্ঠানের আর ভয়ের কোন কারণ নাই।"

জোর জবরদস্তি করিয়া কতকগুলা ফ্যাক্টরি খাড়া করিলেই "স্বদেশী আন্দোলন" সুরু করা সম্ভব নয়। কোন্ কারবারটা টেকসই, সে সম্বন্ধে অনেক পাকা মাথা খেলানো দরকার।

সাধু আন্তনিঅ

১

পাদোহ্বা রোমাণ ক্যাথলিক খৃষ্টানদের অন্যতম তীর্থরাজ। সেইণ্ট বা সাধু আন্তনিঅর কবর এই নগরে অবস্থিত। সেই কবরের উপর যে মন্দিরটা উঠিয়াছে, তাহার নাম-ডাক দুনিয়ার সর্ব্বত্র। "গথিকের" ছায়া ইহার গড়নে কিছু কিছু লক্ষ্য করিতেছি।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি, গির্জ্জায় বহুমূল্য ধাতুরত্নের উপহার জুটিয়াছে প্রচুর। খ্রীষ্টানদের দেবালয়গুলা, আমাদের মঠ-মন্দিরের মতনই, উপাসকদের ভক্তির চিহ্নস্বরূপ বহুবিধ "কাঞ্চন-মূল্যং" পাইয়া থাকে। দেশ-বিদেশের তীর্থযাত্রীরা অনেক প্রকার দেবোত্তর প্রদান করিতে অভ্যস্ত। ধাতুরত্নের সংগ্রহটা তীর্থ-যাত্রীদিগকে দেখাইবার ব্যবস্থা ও আছে।

আন্তনিঅ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। পাদোহ্বার

নিকটবর্ত্তী এক পল্লীতে তাঁহার অসুখ হয়। গরুর গাড়ীতে করিয়া তাঁহাকে মঠে লইয়া আসা হইয়াছিল। সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরা রোগী মুমূর্ষু সাধুকে গাড়ী হইতে নামাইতেছেন—এই বিষয় লইয়া সেকালের এক চিত্র আছে। ইতালিতে গরুর গাড়ীর চল মধ্য-যুগের মামুলি কথা। গরুর গাড়ী আজও ইতালির পল্লী হইতে উঠিয়া যায় নাই। গরুর গাড়ীর ভিতর যতখানি ভক্তিযোগ এবং আধ্যাত্মিকতা মূর্ত্তি গ্রহণ করে, তাহা একমাত্র ভারতবর্ষেরই একচেটিয়া গুণ নয়। খৃষ্টানরাও সেই রসে বঞ্চিত নয়।

২

সাধু আন্তনিঅ সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। "ঠাকুরমার ঝুলি"র ভিতর ক্যাথলিক বালক-বালিকারা সেই সব ছেলেবেলায়ই শুনিয়া থাকে।

আন্তনিঅ "ভগবান" যীশুকে "শিশু" ভাবে পূজা করিতেন। দেবতার শিশুত্ব ছিল তাঁহার ভক্তিরসের উৎস। এই কারণে নিজ নিজ শিশুর জীবনে মঙ্গল কামনা করিবার জন্য ক্যাথলিক নর-নারীরা আন্তনিঅকে পূজা করে।

আন্তনিঅর নামে "মানত্" করা, আন্তনিঅর মন্দিরে তীর্থ-যাত্রা করিতে আসা সেই পূজারই অন্তর্গত। জাপানী বৌদ্ধেরা "জিজো"র এবং বাঙালীরা "মা মঙ্গলচণ্ডী" বা 'মা ষষ্ঠী'র কৃপায় ছেলেপুলেদের জন্য যা কিছু লাভ করিয়া থাকে—ক্যাথলিকরা আন্তনিঅর মাহাত্ম্যে সেই সবই পায়।

একজন জার্ম্মাণ-মহিলা ব্যাহ্বেরিয়ার লাণ্ডস্‌হুট্ নগর

ব্যাধিতে ভুগিয়া অথবা অন্য কোনো রোগের দরুণ যে সব নরনারী লাঠির আশ্রয় লইতে বাধ্য হইত, তাহারা সারিয়া উঠিবার পর লাঠিগুলা আন্তনিঅর চরণতলে রাখিয়া গিয়াছে।

ধর্ম্ম ও রক্তমাংসের দুর্ব্বলতা

বাস্তবিক পক্ষে, ধর্ম্ম প্রকারান্তরে "অন্ধের যষ্টি"। দেবদেবীর পূজা, সাধু-সন্তের আরাধনা, পরকাল-চর্চ্চা, ধর্ম্মকর্ম্ম,—এক কথায় তথাকথিত আধ্যাত্মিক জীবনের জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ সবই প্রধানতঃ দুর্ব্বলের বল। মানুষকে সংসার-যাত্রায় শক্ত করিয়া তুলিবার জন্যই এই সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান কায়েম হইয়াছে। মানুষ যদি দুর্ব্বল না হইত তাহা হইলে আধ্যাত্মিকতা এই সব সুপরিচিত রূপে দেখা দিত কি না সন্দেহ।

মানুষ মরে,—ইহা দুনিয়ার নরনারীর এক মহা দুঃখ। এই দুঃখের শান্তি চাই। সেই শান্তি ছড়াইবার কলই ধর্ম্ম-জীবনের ষোড়শোপচার।

মানুষ অন্নবস্ত্রের অভাবে কষ্ট পায়। জগতে পয়সাওয়ালা লোকের সংখ্যা নেহাৎ কম। অধিকাংশ নরনারীই ভাত-কাপড়ের তাড়নায় জর্জ্জরিত। এই "অন্নচিন্তা চমৎকারা" বা দারিদ্র্য দুনিয়ার আর এক মহা দুঃখ। এই দুঃখকে কাবু করা চাই। কি উপায়ে সম্ভব? অনেক উপায় আছে। কিন্তু একটা বড় উপায় হইতেছে,—লাগাও পরকালের চর্চ্চা, অর্থাৎ তথাকথিত আধ্যাত্মিক সাধনের রকমারি তুক্‌মুক্‌।

মানুষের অসুখ হয়। পয়সাওয়ালা জমিদার, নবাব, বাদশা

ক্রোরপতি, ফ্যাক্টরিপতি, পুঁজিপতি ইত্যাদি কেহই ব্যাধির হাত এড়াইতে পারে না। এই ব্যাধি দুনিয়ার এক চরম সত্য আর এই সত্যটা মহাদুঃখও বটে। কবিরাজ, ডাক্তার, অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ—ইত্যাদির সাহায্যেও এই সনাতন দুঃখ কাটাইয়া উঠা অনেক সময়েই ঘটিয়া উঠে না। কাজেই মানব-চিত্ত আশ্রয় লয় দেবদেবীর। সাধু-সন্তকে প্রার্থনা করা হয়, তাঁহারা যেন দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট রোগীর মঙ্গলের জন্য আর্জিটা সুপারিশ করিয়া পাঠাইয়া দেন।

মানুষ চায় বাঁচিতে, অমর হইতে। মানুষ চায় ধন-দৌলতে সুখী হইতে, গৃহস্থালী সুখে-স্বচ্ছন্দে চালাইতে। মানুষ চায় সুস্থ সবল শক্তিমান রূপে চিরযৌবনের আনন্দ উপভোগ করিতে। কিন্তু মানুষের রক্ত-মাংসের "ম্যাদ" বিচিত্র। সেই অমরতা, পার্থিব সুখভোগ এবং যৌবনশক্তির অবিনশ্বরতা তাহার কপালে লেখা নাই।

জগতের সনাতন দুঃখগুলার কথা বুদ্ধদেবের আবিষ্কার-করা মাল নয়। এই সব মানব-রক্তের অতি আদিম কথা। সেই আদিম তত্ত্ব হইতেই আন্তনিও, জিজো আর মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতানুষ্ঠান গজিয়া উঠিয়াছে। আর সেই তত্ত্বটাকেই দুনিয়ার "রূপ-দক্ষেরা" ছবিতে, গানে, সাহিত্যে ফুটাইয়া রাখিয়াছে। রূপগুলার ভিতর দেখিতে পাই,—সেই এক কথা। দুঃখ নামক দুর্ব্বলতা আর দুর্ব্বলের বল তথাকথিত ধর্ম্ম এবং আধ্যাত্মিকতা। এইখানে প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, খৃষ্টান, হিন্দু ইত্যাদি প্রভেদ করিতে বসিলে মানবের রক্তমাংস সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করা হইবে মাত্র।

ইতালিতে বারকয়েক

মানুষের রক্তমাংস যদি অন্য কোনো গুণের অধিকারী হইত, —যদি মানুষ অমর হইয়া জন্মিত, যদি পৃথিবীতে ধনদৌলতের অভাবে কোনো নরনারীকে ভুগিতে না হইত, যদি অসুখ-বিসুখ নামক অভিজ্ঞতা মানব-জীবনে অজানা থাকিত, তাহা হইলে আধ্যাত্মিকতা দেখা দিত কোন্ রূপে? এই সওয়ালটা বেশ চিত্তাকর্ষক বটে। কিন্তু জবাব দেওয়া সোজা নয়।

এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, তাহা হইলে হয়ত দেব-দেবীর আবিষ্কার সাধিত হইত না। মানুষ পরকাল-চর্চ্চা সম্বন্ধে একটা কিছু আবিষ্কার করিত কি না সন্দেহ। বোধ হয় গির্জ্জা, মন্দির, মঠ, সাধু, মোহন্ত, স্বারাজ্য-সিদ্ধি, ভগবৎপ্রাপ্তি, যোগসাধন,—ইত্যাদি বস্তু আবিষ্কৃত হইত না। এক কথায় জগতে তথাকথিত ধর্ম্ম হয়ত দেখা দিত না।

অনন্তের কথা, অসীমের কথা, ভূমার কথা তখন হয়ত নরনারীরা অন্য কোনো উপায়ে চিন্তা করিত। তাহা হইলে দার্শনিকদের মাথায় গজিত হয়ত অন্য কোনো সাহিত্য; শিল্পীরা গড়িত অন্য কোনো মূর্ত্তি; কবিরা গাহিত তখন অন্য কোনো গান। অর্থাৎ মানবজাতি এ যাবৎ আধ্যাত্মিকতাকে যে মূর্ত্তিতে চিনিতে শিখিয়াছে সে মূর্ত্তি না থাকা সত্ত্বেও জগতে আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ সাধিত হইতে পারিত।

ইতালিয়ান জমিদারির এক ছটাক

ডাক্তারবাবুর ঝী দুইটি দুই বোন। ইহারা ভাইয়ে-বোনে এক ডজন। ইতালিয়ান নারী সম্বন্ধে এই কারণে আজকালকার

"নব্য" নারীরা বলিয়া থাকেন :—"তাহারা বিড়ালজাতীয় লোক। বৎসর বৎসর ছেলে বিয়ানো তাহাদের পেশা।"

জমীদারী হইতে বাবু বৎসরে পান বাটটী দুর্গী। সারা বৎসর আটা, মাংস, দুধ, তরীতরকারী ইত্যাদি যত দরকার হয় সবই "প্রজারা" দিতে বাধ্য। তাহার উপর ঋতু অনুসারে ফল মূলও আসে। মাত্র সাতঘর রাইয়তের ইনি মালিক। নগদ আয় বার্ষিক প্রায় চার হাজার টাকা।

ঝীদের সঙ্গে "কুলের কথা" আলোচনা করা গেল। তাহাদের বাপমারা লিখিতে পড়িতে জানে না। যে পল্লীতে তাহাদের বাস্তুভিটা সেখানকার প্রবীণেরা সকলেই নিরক্ষর। বাবু বলিতেছেন—"ইতালিতে এখনো বাধ্যতামূলক সার্ব্বজনিক শিক্ষার বিধান সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় নাই।"

জমিদারী প্রথা সম্বন্ধে "বারোণ" এবং "বারোণা"র নিকট নানা কথা শুনিলাম। বাবুর পিতা রাইয়তদিগকে চাবুক মারিয়া শাসাইতে অভ্যস্ত ছিলেন। "প্রজারা" টুঁ শব্দ পর্য্যন্ত করিতে অধিকারী ছিল না,—করিতও না। এই কয়দিনের অভিজ্ঞতায়ও দেখিতেছি,—ডাক্তারবাবু কথায় কথায় দাসীদিগকে "জানোয়ার" বলিয়া গালাগালি করিয়া থাকেন। "শূয়ার," "হারামজাদা," "শূয়ারকা বাচ্চা" ইত্যাদি বোলের যে ভাবার্থ, ইতালিয়ান জমিদারের মুখনিঃসৃত "জানোয়ার" সম্ভাষণের কিম্মৎ ও তাই।

একবার জিজ্ঞাসা করিলাম :—"আচ্ছা, এত গালাগালি সহ্য করিয়াও ইহারা আপনাদের জন্য গতর খাটাইতেছে কেন? ইচ্ছা করিলেই ত কাজে জবাব দিয়া চলিয়া যাইতে পারে।" স্বামী-স্ত্রী

উভয়ে বলিলেন :—"সেটি হবার জো নাই। যাবে কোথায়? তাহা হইলে ইহাদিগকে বাপ মা পরিবার শুদ্ধ জমিদারী হইতে খেদাইয়া দিব। অপর দিকে অন্য কোনো জমিদারের অধীনে ভিটামাটি পাওয়া ইহাদের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। কাজেই ইহারা সবই নীরবে সহিতে বাধ্য।"

শহরের এদিক ওদিক

১

এক যুবার সঙ্গে শহরের এটা ওটা দেখিয়া আসা গেল। কবিবর দান্তে এক গলিতে কিছুদিন কাটাইয়াছিলেন। বাড়ীটার দেওয়ালে তথ্যটা খোদা রহিয়াছে। গথিক রীতির দুয়ার ও জানালা দেখিতেছি।

ইহারই অল্প দূরে বিশ্ববিদ্যালয়। * পুরাণা ইমারতের ভিতর ভারত-প্রসিদ্ধ চকমিলানো বাড়ী দেখিলাম। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রতিষ্ঠান। ইয়োরোপের সর্ব্বপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় ইতালির বোলোনিয়া শহরে স্থাপিত হইয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর কথা।

যুবা বলিতেছেন :—"বোলোনিয়া আজও চিকিৎসাবিদ্যায় ইতালিতে শ্রেষ্ঠ। তাহার পরই পাদোহ্বার ঠাঁই।"

খোলা উঠানে বাজার বসিয়াছে। কমলা লেবু ও অন্যান্য ফলমূল বিক্রী হইতেছে। সম্মুখেই এক বিপুল "পালাৎসো" বা

* দ্বিতীয় বারকার ইয়োরোপ-ভ্রমণের সময় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইবার,—ইতালিয়ান ভাষায়, বক্তৃতা করিতে হইয়াছে (ফেব্রুয়ারি, ১৯৩০)।

প্রাসাদ। তাহার নীচের তলায় মাছমাংসের হাট। বাড়ীটা ষোড়শ শতাব্দীর রচনা। রেণেসাঁসের গড়ন দেখা যাইতেছে। সে কালের নবাবেরা এই ভবনে রাজ-কার্য্য চালাইতেন।

এখানে ওখানে খাল পার হইতে হইল। হ্বেনিসের খালের সঙ্গে পাদোহ্বার খালের যোগাযোগ আছে। এখান হইতে রেলে দেড় ঘণ্টায় হ্বেনিস পৌছানো যায়। খালের জল অপরিষ্কার। দেখিলেই মনে হয় ম্যালেরিয়ার বাথান।

গির্জ্জার সংখ্যা অনেক। ভিতরে ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাইতেছি কম নয়। অধিকাংশ ঘর-বাড়ীই মেরামতের অভাবে কদাকার দেখাইতেছে। বারান্দাওয়ালা ঘরগুলা ইতালির বিশেষত্ব। জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এই ধরণের বারান্দা দেখা যায় না। ভারতের কথা মনে পড়িবে।

ইটগুলা মধ্যযুগের ভারতীয় (বঙ্গীয়) ইটেরই অনুরূপ। যে সকল ছোট খাটো চৌকা ইটকে আমরা "গৌড়ের ইট" বলিতে অভ্যস্ত সেই ধরণের বস্তু এখানে "রোমাণ ইট" নামে পরিচিত।

ইয়োরোপের অন্যত্র দেখিয়াছি ঘরের মেঝেগুলা কাঠের তৈয়ারি। ইতালিতে ঘরের মেঝে শানে বাঁধানো,—সিমেণ্টকরা। এইখানেও আবার ভারত।

কম্ফার্টারের মতন উলে তৈয়ারি আলোআন জড়াইয়া মেয়েরা চলা ফেরা করিতেছে। "কেপ্"-জাতীয় ওভার-কোটেও দুচার জন পুরুষকে দেখিতেছি। বাজারের মেয়ে-দোকানদারেরা সকলেই আলোআন গায়ে সওদা বেচিতেছে।

ইতালিতে বারকয়েক

২

ইতালিতে "সেকাল" বলিলে প্রধানতঃ তিনটা যুগ বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ,—ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী। সেটা রেণেসাঁসের আমল। দ্বিতীয়তঃ ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দী। এই সময়ে মধ্যযুগের ভরা জোআর চলিতেছে। তৃতীয়তঃ, রোমাণ সাম্রাজ্যের যুগ বা রোমাণ আমল। সে খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বেকার কথা।

পাদোহ্বায় সেই "রোমাণ আমলে"র ঘরবাড়ীও দুইচারখানা দেখা যায়। অন্ততঃ তাহাদের ধ্বংসাবশেষ কিছু কিছু লক্ষ্য করিতে পারি। "রোমাণ আমল" বলিলে "ক্লাসিক" যুগ বুঝিতে হইবে। সেই ক্লাসিক রীতিই নবরূপে দেখা দিয়াছিল "রেণেসাঁসের" আমলে। অর্থাৎ যেখানে "রেণেসাঁস" সেখানেই "ক্লাসিক"ও কিছু কিছু আত্মপ্রকাশ করিতেছে এইরূপ সমঝিয়া রাখা দরকার। কম সে কম বাস্তরীতির ক্ষেত্রে এই কথা বিশেষরূপেই খাটে।

বিজ্ঞান-বিরোধী খৃষ্টিয়ান

১

বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-ভবন সম্বন্ধে একটা কাহিনী প্রচলিত আছে। সেকালে শবচ্ছেদ করা খৃষ্টানদিগের সমাজে প্রচলিত ছিল না। পুরোহিতদের চিন্তায় এই কাজ মহাপাতক বিবেচিত হইত। কোনো চিকিৎসক বা বিজ্ঞানসেবী মরা শরীর লইয়া কাটা ছিঁড়া করিতে সাহসী হইত না।

এক ব্যক্তি এই দিকে পথ-প্রবর্ত্তক হন। নাম তাঁহার মর্গাণি। তিনি রাত্রিকালে দুয়ার বন্ধ কারয়া একটা ঘরে আসিয়া

শবচ্ছেদ করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহা এক অসমসাহসিকতার পরিচয়। কেননা পুরোহিত এবং সমাজের হাতে নির্য্যাতনের ভয় কম ছিল না।

যে টেবিলের উপর মর্গাণি শবচ্ছেদ করিতেন সেই টেবিলটা দর্শক মাত্রকে দেখানো হয়। গত বৎসর পাদোহ্বার জীবনে অষ্টম শতাব্দীর সুরু উপলক্ষ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জ্জাতিক পণ্ডিত-সম্মেলন ডাকা হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছিলেন কলিকাতার তিন প্রতিনিধি। দুনিয়ার অন্যান্য লোকের সঙ্গে সঙ্গে ভারত-সন্তানেরাও মর্গাণির টেবিলটা দেখিয়া গিয়াছেন।

২

ভারতের পণ্ডিতমহলে একটা ব্যাধি আছে। তাঁহারা কথায় কথায় হিন্দুজাতিকে কুসংস্কারপূর্ণ রূপে গালাগালি করিয়া থাকেন। হিন্দু ধর্ম্ম এবং হিন্দু সমাজের "জাতিভেদ"টাই নাকি ভারতে বিজ্ঞান-সেবার দুসমন। এই সূত্রে পূর্ব্বে পশ্চিমে তফাৎ দেখানোও তাঁহাদের এক বাতিক।

এই ধরণের মত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রণীত "হিন্দু রসায়ণের ইতিহাস" গ্রন্থে অতি বিকট রূপে প্রচারিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক মহাশয় বিজ্ঞানের ইতিহাস লিখিতে যাইয়া ধীর বৈজ্ঞানিকতার মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার মত বোধ হয় কোনো দিন বদলাইতে পারিবেন কি না সন্দেহ।

কিন্তু যুবক ভারতে বিজ্ঞান-চর্চ্চা আজকাল কোনো একমাত্র বীরবরের একচেটিয়া প্রভাবে পথভ্রষ্ট হইবে না। ভারতসন্তান চোখ খুলিয়া দুনিয়ায় বেড়াইতে শিখিয়াছে। মানব জাতির অতীত

কথা, মধ্যযুগের অবস্থা এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যের গতি—সবই নিরপেক্ষভাবে পরখ করিয়া দেখিবার ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে ভারতে দেখা দিতেছে।

বিজ্ঞানের দুসমন ইয়োরোপে বড় কম ছিলনা। কুসংস্কার, ধর্ম্মের গোঁড়ামি, চিত্তের অন্ধতা, ও সঙ্কীর্ণতা খৃষ্টান সমাজে বেশী ছিল কি হিন্দু সমাজে বেশী ছিল তাহার আলোচনায় বসিলে নিক্তির ওজনে উনিশ বিশ করা সহজ নয়। মর্গাণির টেবিলটা অতীত সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনাকারীদের ভুল দেখাইয়া দিয়া যুবক ভারতকে কুসংস্কার হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তি দিবে সন্দেহ নাই! প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে কোনো দিনই প্রভেদ ছিল না। খাঁটি তুলনামূলক সমাজ-বিজ্ঞান এই কথাই বলিবে।

ইয়োরোপের সু-কু গভীরভাবে তলাইয়া বুঝিবার ক্ষমতা ভারতসন্তানের যতই বাড়িতে থাকিবে ততই পূর্ব্বে-পশ্চিমে প্রভেদের কাহিনী অলীক ও মিথ্যারূপে স্পষ্ট হইতে থাকিবে। ভারতকে বুঝিবার ক্ষমতাও ততই বাড়িতে থাকিবে। এই উদ্দেশ্যে যুবক ভারতে "বিদেশী-আন্দোলন" পাকিয়া উঠুক।

ইতালিয়ান অস্ত্র-চিকিৎসক

ইতালিয়ান ভাষায় এখনও হাতে খড়ি সুরু করি নাই। করিব কি না এখনো বলিতে পারি না। কিন্তু মাঝে মাঝে দুএকটা খবরের কাগজ এবং মাসিক পত্রিকা ঘাঁটাঘাঁটি করিতেছি। দুই চার দশ বিশটা শব্দের চেহারা দেখিয়া রাখিতেছি মাত্র।

ডাক্তারবাবুকে একদিন ইতালিয়ান সাহিত্য পাঠ করিতে

অনুরোধ করিলাম। দান্তের "দিহ্বিনা কমেদিয়া" (ভগবদ্-গাথা) হইতে কয়েক পৃষ্ঠা পাঠ শুনা গেল। "ইন্‌ফার্ণো" বা নরক অধ্যায় তাঁহার বিশেষ পছন্দসই। পড়িতে পড়িতে বলিলেন :—"আওয়াজ হইতেই মালুম হয় ঠিক যেন নরককুণ্ড,—নয় কি ?"

বাজারে পথেঘাটে এবং পরিবারের ভিতর সাধারণতঃ যে সব ইতালিয়ান আওয়াজ শুনিতেছি তাহাতে মধুরতার অভাব লক্ষ্য করিতেছি। কিন্তু ইতালিয়ান গানের আওয়াজ বড়ই হৃদয়গ্রাহী।

ছবি আঁকায় ডাক্তারবাবুর সখ আছে। নিজের আঁকা কয়েকটা চিত্র দেওয়ালে ঝুলানোও দেখিতেছি। ইঁহার পিতাও ছবি আঁকিতে ভালবাসিতেন। তিনি অবশ্য ছিলেন সামরিক নৌ-বিভাগের কাপ্তেন। তখনকার দিনে পালের জাহাজ চলিত। সেই সূত্রে চীন জাপান পর্য্যন্ত ঘুরাফিরা ঘটিয়াছিল। কিছু কিছু প্রাচ্য সওদা ঘরের আসবাবপত্রে মজুত দেখা যাইতেছে।

বাইসাইকেলে চড়িয়া ডাক্তারবাবু আল্পস পাহাড়ের শত শত মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন। ইহাই দেখিতেছি যুবা জমিদার মহাশয়ের একমাত্র নেশা। মদ বা সিগারেট ইত্যাদির দিকে ঝোঁক নাই। কাফেতে বসিয়া ইয়ারদের দলে আড্ডা মারাও তাঁহার দস্তুর নয়।

তাঁহার আর এক নেশা টাকা জমানো। একমাত্র শিশু—তাহার জন্য টাকা পুঁজি করা তাঁহার জীবনের একমাত্র সাধ। শিশুটি দেখিতে রোগা,—জার্ম্মাণ শিশুদের তুলনায়! কিন্তু সুস্থ ও সুন্দর বটে। ইনি অস্ত্র-চিকিৎসক। এ জন্য যা কিছু যন্ত্রপাতি দরকার সবই হিবয়েনা, প্যারিস এবং বার্লিন হইতে আমদানি করিয়াছেন। গ্রন্থশালায় যে সকল চিকিৎসা-বিষয়ক কেতাব

দেখিতেছি, তাহার অধিকাংশই হয় জার্ম্মাণ না হয় ফরাসী। ইহার মতে উচ্চশ্রেণীর চিকিৎসার জন্য জার্ম্মাণি অথবা ফ্রান্সের শরণাপন্ন না হইলে ইতালির উদ্ধার নাই। শুনিলাম,—ইতালির হাসপাতাল সন্তোষজনক নয়। ব্যবসা হইতে ফুরসৎ পাইলেই ইনি কেতাব ও বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় ডুবিয়া থাকেন।

শিল্পগুরু জ্যত্ত

১

একটা পুরাণা গির্জ্জার ভিতর "ফ্রেস্কো"-চিত্রগুলা দেখিতে দেখিতে কিছু এদিক ওদিক চিন্তা করিবার সুযোগ জুটিল। মন্দিরটা পুরাণা অবস্থায় নাই। তবে সাবেক বাস্তুরীতি রক্ষা করিয়া ইহার বাহিরটা পুনরায় গড়িয়া তোলা হইয়াছে। ভিতরটা সেকালের অবস্থায়ই রহিয়াছে। বাড়ীর গড়নকে "গথিক" জাতীয় বলা চলে।

"ফ্রেস্কো" বলিলে দেওয়ালে লেপা চিত্রাবলী বুঝিতে হইবে। ভারতের অজন্তা চিত্রগুলা ফ্রেস্কো-শিল্পের অন্তর্গত। ইয়োরোপের যেখানে যেখানে মন্দির দেখিয়াছি, সেখানেই খৃষ্টান "রূপদক্ষ" দের হাতের ফ্রেস্কো নজরে আসিয়াছে। তাহা ছাড়া গির্জ্জার থাম্বায়, দেওয়ালে, বেদিতে কাচের ফ্রেমে বাঁধানো আল্‌গা তৈল-চিত্রও সর্ব্বত্রই দেখা যায়। জলে গোলা রঙের ব্যবহার ইয়োরোপীয় চিত্রশিল্পে,—বিশেষতঃ গির্জ্জাশিল্পে কোথাও দেখি নাই।

পাদোহ্বার এই গির্জ্জায় যে ওস্তাদ দেওয়াল লেপিয়াছেন তাঁহার নাম জ্যত্ত। ছবিগুলায় বাইবেলের গল্প চিত্রিত হইয়াছে বলাই বাহুল্য। মূর্ত্তিসমূহের ভিতর জীবনবত্তা লক্ষ্য করা অতি

সহজেই সম্ভব। অথচ কোনো প্রকার রঙের সাহায্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-গুলা অতিমাত্রায় ফুলাইয়া তুলিবার চেষ্টা নাই। বর্ণ-সমাবেশে বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছে বটে,—কিন্তু মনে হইবে যেন কতকগুলা সরল রেখার গতিভঙ্গীই দেওয়ালের উপরকার রঙীন গড়ন গুলার প্রাণ।

অস্থিবিদ্যায় পাণ্ডিত্য দেখানো জ্যত্তর মতলব ছিল না, এ কথা বিনা কষ্টেই বুঝিতে পারি। অধিকন্তু পারিপ্রেক্ষিকের কৌশল এই রূপদক্ষের মূর্ত্তিগঠনে দেখা দেয় নাই। প্রাচীন ভারতের চিত্রশিল্পে,—বিশেষতঃ মধ্যযুগের "রাজপুত"-"পাহাড়ী" অঙ্কনগুলায় জ্যত্ত-সুলভ কায়দাই দেখিতে পাওয়া যায়।

২

দান্তের মতন জ্যত্তও ফ্লোরেন্সের লোক। ইহারা দুই জনে সমসাময়িকও বটে। জ্যত্তর আঁকা দান্তেমূর্ত্তি ফ্লোরেন্সের মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

জ্যত্ত পুরোহিত, সন্ন্যাসী বা মঠবাসী ছিলেন না। শিল্পসেবাই ছিল তাঁহার একমাত্র ব্যবসা। একজন ইতালিয়ান ইস্কুলমাষ্টার বলিতেছেন :—"জ্যত্তর জন্ম হয় এক গোয়ালা-কিষাণের ঘরে। তখনকার দিনে তস্কানা প্রদেশে শিল্পী চিমাবুয়ে (১২৪০-১৩০২) ছিলেন গুরুস্থানীয়। তিনি জ্যত্তকে পাথরঘষা এবং অন্যান্য মামুলি কাজে দু একবার লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছিলেন,—ছোকরাটার হাতে রূপ গড়িবার দক্ষতা খেলিতেছে। জ্যত্ত চিমাবুয়ের শাগ্‌রেতি করিতে থাকে।"

ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতালিতে আসিসি পল্লীর "সান্ত" বা সাধু

এই সকল রকমারি রূপ গড়িবার দক্ষতা এবং বিচিত্র উপায়ে রসসৃষ্টি করিবার ক্ষমতা ভারত হইতে লুপ্ত হইয়াছিল। ভারতের এই দুর্ব্বলতার কথা সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করিলে অথবা দুর্ব্বলতাটাকে অস্বীকার করিলে জগতের লোক হাসিবে মাত্র।

বিজ্ঞানের মুল্লুকে ভারতমাতা চরক-সুশ্রুত ইত্যাদির জন্ম দিয়াছিলেন। কিন্তু পশ্চিমের লোকেরা চরক-সুশ্রুতের মতন লোক ত জন্ম দিয়াছিলই; "পাঁচনের মাহাত্ম্য" মধ্যযুগের খৃষ্টান সংসারে বেশ সুবিদিতই ছিল; তাহার উপর যুগে যুগে আজ পর্য্যন্ত নয়া নয়া চরক-সুশ্রুত পাশ্চাত্য সংসারে জন্মিয়াছে। এই কথা ভারতসন্তান আর বোধ হয় অস্বীকার করে না।

ভারতমাতা আর্য্যভট্ট ভাস্করাচার্য্য ইত্যাদির জননী। ভাল কথা। কিন্তু খৃষ্টান জগতে সেকেলে ভাস্করাচার্য্যগুলা আজকাল প্রায় বাতিল হইয়া গিয়াছে। আইনষ্টাইন, মাদাম কুরী ইত্যাদির যুগে গালিলেও ইত্যাদি বিজ্ঞানবীরের যুগ অতি নিষ্প্রভ এইরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। পাশ্চাত্য নরনারীর সৃষ্টি-শক্তি অফুরন্ত ভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে। ভারতের কোনো লোক এ কথা অস্বীকার করিবে কি ?

ইয়োরোপে আগে গরুর গাড়ী চলিত। আজ চলে সেই জায়গায় মোটর লরি, উড়ো জাহাজ। পুরুষানুক্রমে ইয়োরোপীয়ান-দের আর্থিক কর্ম্ম-প্রচেষ্টায় নব নব রূপ দেখা যাইতেছে। ইহাও অস্বীকার করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু ভারতীয় এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের স্বাধীন বিশ্বকোষে গরুর গাড়ীই অবশ্য চরম আবিষ্কার।

ইতালিতে বারকয়েক

২

বড়ই আশ্চর্য্যের কথা,—সুকুমার-শিল্প সম্বন্ধে গতিবিধির জরীপ লইয়া ভারতীয় পণ্ডিত-মহলে গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। সঙ্গীতের মুল্লুকে আমাদের ভরত এবং তানসেন জ্যন্ত মাত্র, আর ইয়োরামেরিকায় সেকেলে ভরত-তানসেনের ঠাঁইয়ে নয়া নয়া ভরত-তানসেনের আবির্ভাব হইয়াছে,—এ কথা বিশ্বাস করিবার মতন লোক ভারতে আজকাল কয়জন আছেন ?

সেইরূপ চিত্রকলার তরফ হইতেও প্রশ্ন চলে। ভারতীয় জ্যন্তর জুড়িদারগণ যাহা কিছু করিয়াছেন প্রায় তাহাই ভারতের রূপদক্ষ মহলে শিল্পের একপ্রকার শেষ কথা ছিল। ভারতমাতা যেরূপ নয়া নয়া চিকিৎসা-বীর, নয়া নয়া জ্যোতির্ব্বিদ, নয়া নয়া রাসায়নিক, নয়া নয়া জীবতত্ত্ববিৎ, নয়া নয়া এঞ্জিনিয়ারের জন্ম দিতে পারেন নাই, ঠিক সেইরূপই নবীন ইয়োরামেরিকার শিল্পবীর শ্রেণীর কোনো ওস্তাদের জন্ম দেওয়াও তাঁহার ক্ষমতায় কুলায় নাই।

ভারতবর্ষের অক্ষমতা একসঙ্গে হাজার পথে প্রায় সমানভাবে দেখা দিয়াছিল। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর যুবক ভারতে যে "রেণেসাঁস" সুরু হইয়াছে তাহার হিসাব সম্প্রতি করা হইতেছে না।

ভারতীয় ওস্তাদগণের দৌড় একটা সীমানায় আসিয়া ঠেকিয়াছিল। সেই সীমানা হইতে আগাইয়া যাওয়া ভারত-শিল্পের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। যতটুকু হইয়াছিল তাহা পাশ্চাত্যের তুলনায় ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য নয়। যুবক ভারতের যে গণ্ডা দেড়েক শিল্প

সমালোচক বা ঐতিহাসিক মান্ধাতার আমলের ভারতখানা লইয়া নাড়াচাড়া করেন তাঁহাদের মগজে এই সোজা কথাটা প্রবেশ করিতেছে না কেন ?

৩

বরং তাঁহাদের আখড়ায় একটা উল্টা বাতিকই মাথা খাড়া করিয়া আছে। নতুন নতুন সৃষ্টি সাধন করিয়া ইয়োরামেরিকান শিল্পশক্তি যেখানে যেখানে তুনিয়ার চৌহদ্দিটা বাড়াইয়া দিয়াছে ও দিতেছে, সেখানে আমাদের ভারতীয় ঋষিত্ব ও আধ্যাত্মিকতার পাঁড় ধুরন্ধরেরা কোনো রূপ-দক্ষতাই দেখিতে পান না। তাঁহাদের চিন্তায় অথবা খেয়ালে ভারতীয় এবং প্রাচ্য "আদর্শ" পশ্চিম আদর্শ হইতে উন্নততর। ইহার নাম "ছোট মুখে বড় কথা" অথবা গা-জুরি কিম্বা "অতি-পাণ্ডিত্য", অথবা ইহাকেই বলে "আঙুর ফল খাট্টা।" ভারতে যেখানে যেখানে সৃষ্টিশক্তির অভাব সেখানেও উন্নত আদর্শ, আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম্মপ্রাণতা, উচ্চতর শিল্পকলা ইত্যাদি আবিষ্কার করিতে থাকা চিত্তের চরম দৈন্যই প্রকাশিত করে।

আঙুর ফল খাট্টা নয়। পাশ্চাত্য মুল্লুকের সর্ব্বঘটে নব নব সৃষ্টিগুলাও উন্নতিহীনতা, আধ্যাত্মিকতাহীনতা, পাশবিকতা এবং বর্ব্বরতার পরিচয় নয়। যতদিন এশিয়ার হৃদয় ও মাথা স্বাধীন-ভাবে নয়া নয়া জগৎ গড়িতেছিল ততদিন প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে জীবনের কোনো ঘরে মূলতঃ কোনো প্রকার ফারাক ছিল না। তাহার পর ইয়োরামেরিকা বাড়িয়া চলিয়াছে। এশিয়া বেচারা বাড়িতে পারেন নাই। এই জন্যই কি এশিয়া বলিতে অধিকারী যে পাশ্চাত্য তুনিয়ার

বর্ব্বর খৃষ্টান সভ্যতা পাশবিক, ইয়োরামেরিকার প্রাণে অধ্যাত্মের পিয়াসা জাগে না ?

"প্রাগ্-রাফায়েল" "প্রিমিটিভ্" ও "ভবিষ্য-নিষ্ঠা"

(১)

জ্যত্তর প্রভাবমণ্ডলে থাকিতে থাকিতে আর একটা কথা মনে পড়িতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রোজেটি, ব্যর্ণ্-জোন্স, মিলেস ইত্যাদি ইংরেজ চিত্রশিল্পীরা একটা অতীত-মুখো আন্দোলন রুজু করেন। তাহার নাম "প্রি-রাফায়েলিটিজ্ম্" বা প্রাগ্-রাফায়েল শিল্পশাস্ত্রের আন্দোলন।

তাঁহারা বিবেচনা করিতেন যে, রাফায়েলের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে যে সকল ইয়োরোপীয় (ইতালিয়ান) ওস্তাদেরা আঁকিয়াছেন তাঁহাদের কায়দা পুনরায় ফিরাইয়া আনা উচিত। তাহা হইলে বর্ত্তমান জগতের শিল্প-সংসারে একটা স্বাভাবিকতা ও সরলতা হাজির হইতে পারিবে।

"প্রাগ্-রাফায়েল" যুগ বলিলে যে সকল শিল্পবীরের নাম মনে উঠে তাঁহাদের ভিতর জ্যত্তকে বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান বলিতে পারি। বাস্তবিক পক্ষে সেই "প্রিমিটিভ" বা আদিম শিল্পরীতির নিদর্শন ইয়োরোপে বড় বেশী নাই। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত কাল চিত্রশিল্পে সেই আদিম কাল। জ্যত্তকে পুরাণা ও নয়ার সন্ধিকালে ফেলা যাইতে পারে।

জ্যত্তর আমল, "গথিক" আমল ইত্যাদি সময়কার শিল্প ও

সাহিত্যের দিকে "প্রাগ্-রাফায়েল আন্দোলন" শিল্পী, কবি, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, সমালোচক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর মাথা-ওয়ালা লোকের দৃষ্টি টানিয়া লইয়া যায়। পাশ্চাত্য জ্ঞানমণ্ডলে "মধ্যযুগের পুনরাবিষ্কার" সাধিত হয়।

ইয়োরোপীয় মধ্যযুগের গৌরব প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জগতে সকল দেশের "প্রিমিটিভ্"গুলা পণ্ডিত ও স্রষ্টা মহলে আদর পাইতে থাকে। প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে চীনা, জাপানী, মিশরীয়, ভারতীয় সকল আবিষ্কারই বর্ত্তমান জগতের রূপরস জোগাইতে সুরু করে। অধিকন্তু, আমেরিকান-ইণ্ডিয়ান, কঙ্গো-আফ্রিকান অর্থাৎ নিগ্রো, আজ্‌টেক-মেক্‌সিকান ইত্যাদি শিল্পরীতিও নবীন রূপ-দক্ষদের খোরাক জোগাইয়াছে। এক কথায়,—"মান্ধাতার আমল"টা নবীনতম যুগের "ভবিষ্যবাদ" গড়িয়া তুলিতেছে। এ এক বিপুল আধ্যাত্মিক বিপ্লব।

ভারতীয় চিত্রশিল্পীরা অজন্তা-রাজপুত ইত্যাদির প্রেমিক হইয়া সেই "প্রাগ্-রাফায়েল" আন্দোলনেরই জের চালাইতেছেন। মধ্যযুগ বা মান্ধাতার আমল যুবক ভারতের "ভবিষ্য-নিষ্ঠায়" অনেক কথাই বলিতেছে।

পুরাণা কোনো চিজ একদম বাতিল হইয়া যায় না। বর্ত্তমান যুগের চরম বিপ্লবেও অনেক সময় মান্ধাতার আমলের ধরণ-ধারণ খুব কাজে লাগিয়াছে। সোহ্বিয়েট রুশিয়ার বোলশেভিকরা আমদানি করিয়াছে কোন্ "আদর্শ"? বিলকুল আদিম কমিউনিজ্‌ম বা ধন-সাম্য! আজকালকার লড়াইয়ে বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ মাইল দূর হইতে গোলাগুলি বর্ষণ করাই দস্তুর। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে

ইতালিতে বারকয়েক

দুর্গ দখল করিবার সময় অথবা তড়িতের ব্যাড়া (ট্রেঞ্চ) তাঁবে আনিবার জন্য তলোয়ার কিরীচ সঙ্গীন লইয়াও লড়িতে হয়। অথচ এই ধরণের হাতাহাতি বা মল্লযুদ্ধ মধ্যযুগের বা নেহাৎ "ত্যাহ্বেজ" আমলেরই সেকেলে রীতি মাত্র। "লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষার" কিম্মৎ আজও ঢের।

সেইরূপ রেল এরোপ্লেন অটোমোবিলের যুগেও গরুর গাড়ী ঘোড়ার গাড়ী পূরাপূরি উঠিয়া যায় নাই। নবীনতম "ফার্ম্মাসি"-কারখানার তৈয়ারি "ট্যাব্‌লেট্" বড়ী ও অন্যান্য ওষুধ ব্যবহার করাই আজকালকার রেওয়াজ। কিন্তু কি ইয়োরোপে, কি এশিয়ায়, রকমারি পাঁচন এবং "নেচ্যর কিউর" বা প্রাকৃতিক চিকিৎসার ব্যবস্থা এখনো অনেক কাজে লাগে। গণিতের চরমতম আবিষ্কারের যুগেও এক দুই হইতে দশ গণনা রূপ ভারতমাতার বড় আবিষ্কারটা ইয়োরামেরিকার কেহই ফেলিয়া দিতে রাজি নয়।

এই জন্যই অনাতল ফ্রাঁস, দস্তয়েব্‌স্কি, হামস্থন ইত্যাদির যুগেও হোমার, বাল্মীকি, কালিদাস, দান্তে, গ্যেটে ইত্যাদি সাহিত্য-বীরগণ মানবজীবনকে সরস করিয়া তুলিতে সমর্থ। এই কারণেই "জ্যত্ত," "সেশ্যু," "হ্বাঙ্‌-হ্বে," "রাজপুত" ইত্যাদি নামের শিল্পরীতি যুগে যুগে নয়া নয়া "রেণেসাঁস," নয়া নয়া "রোমান্টিকতা" নয়া নয়া জীবনবত্তার বিপ্লব আমদানি করিতেছে। পুরাণাগুলা মরিয়াও মরে না। জ্যান্ত জীবনের সৃষ্টিগুলার ইহাই স্বধর্ম।

তৃতীয় অধ্যায়

আদ্রিয়াতিক কূলের বণিক-নগর

হ্বেনেৎসিয়া

"শাইলক দি জু লিহ্বড্ অ্যাট্ হ্বেনিস",—ইহুদি শাইলকের মোকাম ছিল হ্বেনিসে। চার্লস্ ল্যাম্ব্ প্রণীত "শেক্সপীয়ারের কথামালা"য় এই সংবাদ ভারতের পাঠশালায় পাঠশালায় প্রচারিত আছে। সেই হ্বেনিসেই আজ হাজির।

এই শহরের ইতালিয়ান স্বদেশী নাম "হ্বেনেৎসিয়া"। জার্ম্মাণরা ইহাকে জানে "ফেনেডিগ্" বলিয়া।

হ্বেনিসের আদালতে শাইলক এক মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিল। প্রতিবাদীর পক্ষ হইতে উকিল আসিয়াছিল পাদোহ্বার এক "যুবা নারী।" নাম তাহার পোর্শিয়া। কিন্তু পোর্শিয়ার যান ছিল গো-শকট কি খালবাহী পান্সী সে খবরটা শেক্সপীয়ার দেন নাই।

বায়রণের কবি-যশ

১

আজকাল অবশ্য রেলে পৌঁছিতে লাগে মাত্র ঘণ্টা খানেক। এই পথেই বিলাতী কবি বায়রণ অশ্বপৃষ্ঠে আদ্রিয়াতিক সাগর কূলে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। "লর্ড" কবিবরের মোট ছিল পাঁচ গাড়ীতে বস্তাবন্দি। তাঁহার গৃহস্থালীর অন্তর্গত ছিল সাত ভৃত্য,

নয় ঘোড়া, এক গাধা, দুই কুকুর, দুই বিড়াল, চার ময়ূর আর কতকগুলা মোরগা মুরগী। সাহিত্য-প্রেমিকদের নিকট বায়রণের "দেশত্যাগ" এবং ইয়োরোপে শফরের কাহিনী অজানা নয়।

বিশেষতঃ আজ ১৯২৪ সাল চলিতেছে। শীঘ্রই আসিবে ১৯ এপ্রিল। বায়রণের মৃত্যুর শতবর্ষ পূর্ণ হইতে চলিল। দুনিয়ার লোকেরা বায়রণ-তিথিটা পালন করিবার ব্যবস্থা করিবে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের ও মহলে মহলে বায়রণ-কথা সমারোহের সহিতই বোধ হয় আলোচিত হইবে। ভেনিসে পৌছিতে পৌছিতে পথে তাই বায়রণের নামটা মনে পড়িল।

একটা মজার কথা অনেক দিনই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। কি ফরাসী, কি জার্ম্মাণ দুই জাতীয় নরনারীই বিলাতী সাহিত্যের প্রতিনিধি বলিলে প্রথমেই বুঝে শেক্সপীয়ারকে, তাহার পরেই তাহারা চিনে বায়রণকে। অন্য কোনো ইংরেজ সাহিত্যবীর "ইয়োরোপীয়ান"দের চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই। মিল্টন কিম্বা ব্রাউনিঙ্ ইত্যাদির নাম নেহাৎ বিশেষজ্ঞ মহলের দু'চার জনের নিকট পরিচিত। শেলী, কীট্‌স্ ইত্যাদি যাঁহারা ফ্রান্স হইয়া সুইস আল্‌প্‌স্ দেখিয়া গিয়াছিলেন তাঁহারা এই ভৌগোলিক কারণে কিছু কিছু জানা-লোক বটে। কিন্তু শেক্সপীয়ারকে বাদ দিলে একমাত্র বায়রণই ইয়োরোপে বিলাতী বাণীর প্রচারক।

২

ভারতে বায়রণ বিপ্লবের অবতার। ইয়োরোপীয় মজলিসে ও বায়রণের এই খ্যাতি। আবার শেলীর দুঃখবাদ ও নৈরাশ্যই

বায়রণের "চাইল্ড্ হারল্ড" গড়িয়াছে। একথা ভারতবাসীর মতন পশ্চিমারাও জানে।

জেনেহ্বা হ্রদের আকাশ-পাহাড়ের বর্ণনায় বায়রণ প্রকৃতি-পূজার পুরোহিত। ষোড়শ শতাব্দীর ইতালীয় কবিবর তাস্‌সো তাঁহার গ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ করিবামাত্র দুঃখে ভরপূর হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই বিষয় লইয়া বায়রণের যে বিতা আছে সেটা অনন্ত-পিপাসার ভাবুকতায় পরিপূর্ণ।

গ্রীসকে উপলক্ষ্য করিয়া, ইতালিকে উপলক্ষ্য করিয়া, নেপোলিয়নকে উপলক্ষ্য করিয়া বায়রণ যে সকল কবিতা তাঁহার রচনার এখানে ওখানে ঝাড়িয়াছেন সেগুলা আদর্শবাদের দানা বিশেষ। "শিলোঁর (চিলনের) বন্দী" কবিতাটা ও সুইস-ফরাসী সমাজের সর্ব্বত্র স্বাধীন আত্মার গাথা রূপে সমাদৃত।

কি বেদনা, কি স্বাধীনতা, কি অসীম উৎসাহ, কি প্রকৃতিনিষ্ঠা,—সকল তরফ হইতেই বায়রণ চরম "রোমাণ্টিকতার" প্রতিমূর্ত্তি। সেই রোমাণ্টিক ঝাঁঝের জন্যই বায়রণ গোটা ইয়োরোপকে "মাত্" করিতে পারিয়াছিলেন

৩

ফ্রান্সের লামার্তিন, মুসে, হ্বিঞি সকলেই বায়রণকে গুলিয়া খাইতেন। হ্বিক্তর হুগোর "হার্ণানি" এবং এমন কি "রুই ব্লা"ও বায়রণের "মান্‌ফ্রেড্" কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত। স্পেনের রোমাণ্টিক আন্দোলনে বায়রণ রসদ জোগাইয়াছেন। ইতালির লেওপার্দি

ছিলেন বায়রণের রসে মসগুল। রুশ রোমাণ্টিক পুশ্‌কিনের সাহিত্যেও বায়রণের নেশা বিরাজ করিতেছে।

ইংরেজ (স্কচ) দার্শনিক কার্লাইল ছিলেন সেকালের জার্ম্মাণ "কুল্‌টুরে"র প্রপাগাণ্ডিষ্ট। ইংরেজ নরনারীকে কার্লাইল বলিতেনঃ—"আরে বাপু, বায়রণ পড়ে' পরকাল ঝর্‌ঝরে কর্‌ছিস্‌ কেন? পড়্‌বি ত পড়্‌ গ্যেটে পড়। বায়রণখানাকে ছিঁকেয় তুলে রাখ্‌।"

কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, স্বয়ং গ্যেটে ছিলেন বায়রণের গুণগ্রাহী। জার্ম্মাণ সাহিত্যবীরের "হ্ব্যার্টারের বিষাদ" বায়রণের নাড়ীর সঙ্গেই সংযুক্ত। বস্তুতঃ গ্যেটের মতে বায়রণ ছিলেন ফাউষ্ট আর হেলেনার সন্তান!

বায়রণের কাব্যকে জার্ম্মাণ সঙ্গীতগুরু শুমান নানা সুরে রূপ দিয়াছেন। এক কথায় ঊনবিংশ শতাব্দীর "ইয়োরোপ" বিলাতী বায়রণকে সকল দিক হইতেই "আপনার" করিয়া লইয়াছিল। ফরাসী সাহিত্য-সমালোচক তেইন বায়রণকে গ্রীক নাট্যকার এস্‌কীলসের জুড়িদার বিবেচনা করেন। ইয়োরোপের বাজারে বায়রণের পসার এই সকল কথায় সহজেই বুঝিয়া লওয়া যায়।

ভারত-সন্তান ও বায়রণকে ঘরে ঠাঁই দিয়া ইজ্জদ্‌ হারায় নাই! বোধ হয় নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ইত্যাদির কাব্যে বাঙ্গালীরা বায়রণের দস্তুর কিছু কিছু চাখিতে অভ্যস্ত।

মাৎসিনি পন্থী আমেন্দলা

১

মিলান, ভেরোণা ইত্যাদি অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্যই এখনো চলিতেছে। ঘরবাড়ী গুলায় দারিদ্র্য বিরাজমান। ভারতবাসীর মতন ইতালিয়ানরাও বাস্তুভিটাকে সেকেলে অবস্থায় রাখিতে অভ্যস্ত। মেরামত করা চূণকাম করা ইত্যাদির রেওয়াজ বড় একটা নাই। পল্লীকুটিরে কিষাণদের জীবন জার্ম্মাণ-মার্কিণ মাপে নেহাৎ শোচনীয়।

এক বিশবাইশ বৎসরের যুবা কিছু কিছু জার্ম্মাণ জানে। বাড়ী ইহার ত্রেন্তিনো প্রদেশে। ত্রেন্তিনোকে অষ্ট্রিয়ানরা জানিত দক্ষিণ-টিরোল বলিয়া। অষ্ট্রিয়ান আমলে এখানকার ইতালিয়ান বাসিন্দারা ও কমবেশী জার্ম্মাণ শিখিত।

যুবা জাতে তাঁতী। পোলু পোষা ইহার পারিবারিক ব্যবসা। রেশমের সূতা কাটিয়া আর রেশমের কাপড় বুনিয়া ইহাদের আয় হয় প্রচুর। ঘরে কয়েকজন মজুর ও খাটে। অবশ্য হাতের চরখা আর নাই। কিছুকাল ধরিয়া কলের চরখা আর কলের তাঁতই চলিতেছে।

কিন্তু ব্যবসার কথায় বা কৃষিশিল্পের কথায় ইহার বিশেষ অনুরাগ দেখা গেল না। প্রথমেই শুনিলাম :—"মহাশয়, বিদেশে আপনারা মুসলিনিকে ইতালির আত্মিক প্রতিনিধি বিবেচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইতালিয়ান সমাজে মুসলিনির শত্রু অনেক।"

২

তৃতীয় শ্রেণীতে চলিতেছি। গাড়ীর সহযাত্রীরা ইতালিয়ান ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানে না। যুবা মন খুলিয়া বক্তৃতা সুরু করিল। বুক পকেট হইতে দুএক টুকরা খবরের কাগজ বাহির করা হইল। টাইপ-করা লেখা ও খানিকটা দেখিলাম একথা ওকথার পর কথা উঠিল,—"আচ্ছা, মুসলিনিকে ঢিট্ করিতে পারে এমন লোক ইতালিতে কোথাও আছে কি ?"

যুবার নিকট শুনিলাম ঃ—"এপ্রিল মাসে যে পার্ল্যামেণ্ট বাছাই হইবে তাহাতে মুসলিনি ফেল মারিতে বাধ্য। মুসলিনির দল একথা প্রাণে প্রাণে জানে। কিন্তু নিজ দল যাহাতে জয়ী হয় তাহার জন্য মুসলিনি অকথ্য জুলুম চালাইতেছে। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে ইতালিতে বোধ হয় রক্তারক্তি ঘটিবে।"

"লোকেরা তাহা হইলে মুসলিনির একাধিপত্য সহ্য করিতেছে কেন ?"

"লড়াইয়ের পর ইতালিয়ানরা এখন পর্য্যন্ত সুস্থ হইয়া উঠিতে পারে নাই। জনসাধারণ হয়রাণ হইয়া পড়িয়াছে। অধিকন্তু ১৯২২ সালে সোশ্যালিষ্ট এবং কমিউনিষ্ট দল ইতালির সকল অঞ্চলে কারখানাগুলা দখল করিয়া বসিয়াছিল মজুরদের উৎপাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার শক্তি জনগণের হাতে নাই। এই সকল কারণে মুসলিনির বিরুদ্ধে ইতালিয়ান স্বদেশ-সেবকরা এখনো উচ্চ বাচ্য করিতেছে না। মুসলিনির একাধিপত্য আরও কিছু

দিন চলিবে। কিন্তু মুসলিনির উপর ইতালিয়ানরা হাড়ে হাড়ে চটা। যদি বাছাইয়ের সময় ফাশিষ্ট-গুণ্ডারা জোর জবর দস্তি না চালায় তাহা হইলে ডেমোক্রাটিক এবং রিপাব্লিকান দল ইতালিতে রাজত্ব করিবে।"

৩

ডেমোক্রাটিক বা সাম্যবাদী দলের কর্ত্তা আমেন্দলার মতামত মাঝে মাঝে জার্ম্মাণ এবং ফরাসী কাগজে অনূদিত দেখিয়াছি। তাঁহার কাগজের নাম "মন্দ" (দুনিয়া)। "মন্দ" আর ফাশিষ্ট "পপল"য় ঠোঁকাঠুঁকি প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু ইতালিতে "রিপাব্লিকান" দলের অস্তিত্ব একটা নতুন কিছু বোধ হইল। যুবা বলিতেছে:—"বর্ত্তমান পার্ল্যামেণ্টে রিপাব্লিকান বা গণতন্ত্রী দলের প্রতিনিধি আছে মাত্র তিনজন। কিন্তু এই দলের শক্তি চাষী মহলে অসীম।"

রিপাব্লিকান দল ডেমোক্রাটদের মতন সাম্যবাদী মাত্র নয়। তাহারা ইতালির রাজাকে গদি হইতে সরাইয়া জনগণের আসল স্বরাজ কায়েম করিতে চায়। শুনিবা মাত্র বলিলাম:—"দেখিতেছি তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত মাৎসিনির ইজ্জদ্ রক্ষা করিতেছে ইতালির চাষীরা!"

একথা শুনিবা মাত্র যুবা ক্ষেপিয়া উঠিল। পকেট হইতে মাৎসিনির এক ফটো বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল:—"তোমরাও মাৎসিনিকে চেন?' বলিতে লাগিল:—"আমি মাৎসিনিয়ান, গণতন্ত্রীরা সকলেই মাৎসিনিয়ান। আর আমেন্দলা যদিও

গণতন্ত্রী নন, তাঁহার রচনায় এবং বক্তৃতায় মাৎসিনির গীতাই প্রচারিত হইয়া থাকে।"

"চাষী মহলে মাৎসিনির পসার এত বেশী কেন?"

"মাৎসিনি একমাত্র মধ্যবিত্ত বাবুসমাজের স্বরাজ প্রচার করেন নাই। সাম্যবাদের আর্থিক ভিত্তিটা তিনি যেরূপ নিরেট ভাবে ধরিতে পারিয়াছিলেন সেরূপ আর কোনো আদর্শ-প্রচারক ভাবুক ন্যাশন্যালিষ্টের চিন্তায় দেখিতে পাই না। সেকালে ইতালিতে শিল্প ছিল নেহাৎ আদিম ধরণের। চাষ আবাদই ছিল ইতালিয়ানদের ধনাগমের উপায়। চাষীরাই সেকালের মেরুদণ্ড। জমিদারের দৌরাত্ম্য হইতে চাষীদিগকে বাঁচাইবার জন্য মাৎসিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। জমিদারীগুলাকে ভাঙ্গিয়া চাষীদের ভিতর জমিজমা ভাগবাটোয়ারা করিবার দিকে মাৎসিনির ঝোঁক ছিল। দক্ষিণ ইতালিতে মাৎসিনির আদর্শ দু একবার কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল ও।"

"মুসলিনির দল মাৎসিনিয়ানদিগকে কি চোখে দেখে?" এদিক ওদিক তাকাইয়া যুবা বলিল:—"ফাশিষ্টরা রাজতন্ত্রী। মাৎসিনিয়ানরা রাজতন্ত্রের যম। কাজেই মুসলিনি আমাদিগকে ইতালির শত্রু বিবেচনা করে। তাহার উপর মুসলিনি জমিদারদের স্বার্থরক্ষা করিতে দাঁড়াইয়াছেন। আমরা দাঁড়াইয়াছি জমিদারদের বিরুদ্ধে, কিষাণদের সপক্ষে। এই সূত্রেও ফাশিষ্টে মাৎসিনিয়ানয় আদায় কাঁচ কলায় সম্বন্ধ।"

"মাৎসিনিয়ানর দল তাহা হইলে ইতালিতে চলিতেছে কি করিয়া?"

ইতালিতে বারকয়েক

"চলিতেছে না বলিলেই চলে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে মাৎসিনির নাম ও মাৎসিনির রচনা ইতালির এবং অষ্ট্রিয়ার রাজা বাদশা মহলে যেরূপ ছিল আজকালকার রাজ-তন্ত্রে-প্রতিষ্ঠিত ফাশিষ্ট-শাসিত ইতালির "বড় মহলে"ও মাৎ-সিনিয়ানদের সেই ঠাঁই। অর্থাৎ কুকুর বিড়ালের মতন আমরা পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়া থাকি। মাৎসিনিকে মুস-লিনির দল প্রকাশ্য সভায় 'রসাতলে' পাঠাইতে অভ্যস্ত। সুতরাং মাৎসিনি-ভক্তদের দল আজকাল প্রায় সবই গোপনে গোপনে কাজ করিতেছে। তিনজনের বেশী মেম্বর খোলাখুলি পার্লামেণ্টে পাঠানো সম্ভব হয় নাই।"

দক্ষিণ ইতালিতে নাকি জমিদাররা মস্তমস্ত রাজ্য ভোগ করে। মান্ধাতার আমলের রাইয়ত-শাসন নাকি এখোনো চলিতেছে। অধিকন্তু "বাবুরা" সকলেই রোমে, হ্বেনিসে, মিলানে, তোরিনোয় সুখময় জীবন যাপন করেন।

এক ঘণ্টার রেলে অনেক নতুন খবর পাওয়া গেল।

খালে খালে ধূল পরিমাণ

১

হ্বেনিসের কাছাকাছি আসিয়া পুলে সাগর পার হইতে হইল। সাগর এখানে গভীর নয়। "লাগুনা" বলে। রেলের জন্য যে "পন্তে" বা পুল নির্ম্মিত হইয়াছে সেটা প্রায় দুই মাইল লম্বা। বোম্বাইয়ের মতন হ্বেনিস ও একটা দ্বীপ বিশেষ। ষ্টেশনে আসিয়া ঠেকিলাম। জাঁকজমক কিছু পাইলাম না।

ইতালিতে বারকয়েক

খালের কিনারায়ই ষ্টেশন। অঞ্চলটা নেহাৎ নোংরা। ঘরবাড়ীগুলায় সম্পদের চিহ্ন নাই। খালে ভাসিতেছে বহু সংখ্যক "গন্দলা"। মার্চ্চ মাস,—শীত এখনো চলিতেছে। এ বৎসর, বিশেষতঃ, ইতালিতেও বরফের প্রাদুর্ভাব। কিন্তু গন্দলার মাঝিরা পোষাকে প্রায় ভারতীয় মাঝিদের আধ্যাত্মিকতায়ই আসিয়া ঠেকিয়াছে। নৌকাগুলার গড়ন কিছু বিচিত্র। কিন্তু দেখিবামাত্রই লাফাইয়া তাহার ভিতর উঠিয়া দাঁড়াইতে বা বসিতে প্রবৃত্তি হয় না। সোজা কথায়,—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব।

ছোট্ট ষ্টীমারে সওয়ারি হওয়া গেল। এই খালই শিল্প-প্রসিদ্ধ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিশ্ব-বিশ্রুত কবি-প্রশংসিত "কানাল গ্রান্দে" বা বড়খাল। চওড়ায় প্রায় সেইন দরিয়ার সমান হইবে, হয়ত বা কথঞ্চিৎ ছোট।

সমুদ্রের দিকে—অর্থাৎ হেবনিস উপসাগরের দিকে—চলিতেছি। দুই কিনারায় দেখিতেছি কেবল প্রাসাদ, প্রাসাদের পর প্রাসাদ, সবগুলিই যেন পাথরের ফুল-বাগান। কোনো ইমারতকেই একটা মামুলি বাড়ী বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। পাঁচসাত তলার সৌধ ইহাদের একটাও নয়। লম্বায় চওড়ায় হ্বিয়েনার বা প্যারিসের বিপুলতাও লক্ষ্য করিতেছিনা। কিন্তু প্রত্যেকটাই চাঁছাছোলা সুশ্রী সম্মুখ ভাগ দেখাইয়া দর্শকদের মন ভুলাইতেছে। পাথরের রেখাগুলায় ঠিক যেন ফিতার জালি।

এইরূপ চিত্তাকর্ষক প্রাসাদশ্রেণী দেখিতে দেখিতে মাইল দুয়েক চলা গেল। এই খানেই কানাল গ্রান্দের খতম। তার

পর এই খালের জের অন্য এক নামে অভিহিত। এইখানে অবশ্য খাল নামটা চালানো চলে না। উপসাগরের এক টুকরা বলিলেই চলে। "দজে"-প্রাসাদ আর সুবর্ণমণ্ডিত সান মার্কো গির্জ্জা এইখানে অবস্থিত।

২

সহরের ভিতর এক পা চলিতে না চলিতেই এক একটা খাল পার হইতে হইতেছে। আঁকাবাঁকা খালগুলা জলের সরু নর্দ্দমার মতন দেখাইতেছে। তাহাতে ভাসিতেছে ফলের খোসা, কাগজের টুকরা, পুরণো পচা মাল আর ঐ ধরণের কিছু। জল একদম নির্জীব। দেখিলেই পিত্তি উঠিয়া আসে।

কোনো কোনো খাল কিছু বড়ও বটে। তাহার উপর গন্দলায় করিয়া মাল চলাচল হইতেছে দেখিতেছি। দুই ধারের ঘরবাড়ীগুলা একদম জলের উপর হইতে উঠিয়াছে। ঘাটে ঘাটে শেওলা। বলা বাহুল্য এপারের ঘরের লোকেরা ওপারের ঘরের লোকের কথা শুনিতে পায় নেহাৎ সহজেই।

ভেনিসে পথ হারাইয়া "বাঙাল" প্রমাণিত হওয়া অতি বড় ওস্তাদের পক্ষেও কঠিন নয়। একে ত খালের গোলক ধাঁধা। তাহার উপর গলিগুলার চক্রান্ত। একদম কাশীর গলি! কোনো কোনো গলি খালের ধারে ধারে,—অধিকাংশই খালের উপর কাটাকাটি করিয়া চলিয়াছে। পুলের জঙ্গলও খুব গভীর।

ঘরবাড়ীগুলা দোতলা তেতলা মাত্র। কিন্তু সূর্য্যের সঙ্গে মোলাকাৎ হওয়া আদৌ সম্ভবপর কিনা সন্দেহ হইতেছে। হাওয়ার

চলাচলও যারপরনাই কম। হ্বেনিস সম্বন্ধে কবিরা শিল্পীরা কেন যে রোমান্টিক ছবি আঁকিয়াছেন তাহার কারণ ঢুঁড়িতে যাইয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছি। হ্বেনিসকে ম্যালেরিয়ার বাথান ছাড়া আর কিছু বিবেচনা করিতে প্রবৃত্তি যায় না। কিন্তু দুনিয়ার লোকেরা এই শহরের নামে মূর্চ্ছা যায়। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ!"

হ্বেনিসের ইমারত

১

পয়সাওয়ালা নরনারীর ঘরবাড়ীতে আর দরিদ্র লোকের ঘর-বাড়ীতে তফাৎ "আবিষ্কার" করিতে "রিসার্চ্চ" দরকার হয় না। হ্বেনিসেও গরীব-পাড়া আর ধনী-পাড়া দুইই আছে। দোকান-পাট হাট বাজারের বহর দেখিয়াও সহজেই মালুম হয়।

ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী এক অঞ্চলকে "গেত্তো" বলে। নামেই প্রকাশ ইহা ইহুদি-টোলা। "কুটির-শিল্প" বলিলে যে ধরণের হাতের কাজ বুঝায় এই অঞ্চলের আবহাওয়ায় তাহার চিহ্ন দেখা যায়। ফিতার বুনন হ্বেনিসে প্রসিদ্ধ।

মার্কো-মন্দিরের আশে পাশে যে সকল দোকান দেখিতেছি সে সবে সৌখীন নরনারীর সওদা কেনা বেচা হয়। "গেত্তো"র লোকেরা—ইহুদি খৃষ্টান উভয়েই—যা কিছু তৈয়ারি করে সেই সবের খরিদ্দার হাজির হয় এই অঞ্চলে।

এক জার্ম্মাণ মহিলা পাঁচ হাজার লিয়ার অর্থাৎ প্রায় সাড়ে সাত শ টাকা দিয়া ফিতা কিনিলেন। আরও হাজার দশেক

লিয়ার খরচ করিয়া সেই এক দোকানেই রেশমের কিংখাবের থান ইত্যাদির অর্ডার দিলেন। মহিলা চলিয়া যাইবার পর দোকানের লোকেরা বলাবলি করিতেছে :—"জার্ম্মাণরা গরীব হইয়া পড়িয়াছে! ঠিক নয় কি?" একজন বলিল :—"চুপ্ চুপ,—জার্ম্মাণরা গরীব কি ধনী তাহাতে আমাদের যায় আসে না। মালগুলা বেচিতে পারাই আমাদের স্বার্থ।" আর একজন বলিতেছে :—"সে কথা আলাদা,—কিন্তু খবরের কাগজে ত রটানো হইতেছে যে জার্ম্মাণদের টাকা কড়ি কিছু নাই; ছুনিয়ার লোক জার্ম্মাণ নরনারীদিগকে সাহায্য করুক। অথচ জার্ম্মাণ নারী বিদেশে আসিয়া চরম বিলাসের সামগ্রী কিনিয়া অঙ্গ ঢাকিবার ব্যবস্থা করিতেছেন!"

২

ছোট খাটো গলির ভিতরেও সুন্দর কারুকার্য্য-সম্বলিত ইমারত দেখিতেছি অনেক। সবই "রেণেসাঁসে"র গড়ন। বারান্দা, জানালা ও স্তম্ভের সুকুমার শিল্প যারপরনাই চিত্তাকর্ষক। মর্ম্মরের রোয়াক, দেওয়াল ইত্যাদি বিরল নয়। স্থানে স্থানে মিস্ত্রীরা যেন পাথরের ফিতা বুনিয়া রাখিয়াছে।

গির্জ্জার সংখ্যাও কম নয়। "গেত্তো" পাড়ারই অদূরে,—একদম সমুদ্রের কিনারায় দেখিতেছি "মাদোনা দেল অর্ত্ত।" এই মন্দির "গথিক" রীতির বাস্তু। কিন্তু বাস্তুর সৌন্দর্য্যবিধানের জন্য যে সব ছবি দেখা যাইতেছে সে সব "রেণেসাঁসে"র চিজ। প্রসিদ্ধ ওস্তাদ তিন্তরেত্ত (১৫১৮-১৫৯৪) এই মন্দিরের জন্য ছবি

আঁকিয়াছিলেন। তাঁহার কবর ও এই মন্দিরেই গাড়া রহিয়াছে।

তিন্তরেত্তর কাজে রূপের গতিভঙ্গী বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার জিনিষ। সে যুগে রঙের কায়দায় সকল শিল্পীই দক্ষ ছিলেন। বাস্তব জীবনকে যথাসম্ভব কবিত্বময় করিয়া তোলা তিন্তরেত্তর এক কীর্ত্তি। ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ছবি আঁকিবার দিকেই তাঁহার মাথা খেলিয়াছিল।

গথিক রীতির মন্দির অথবা গথিকের প্রভাবসমন্বিত মন্দির হ্বেনিসের এখানে ওখানে অনেকই দেখা যায়। এই সকল গির্জ্জায় কিন্তু প্রধানতঃ ষোড়শ সপ্তদশ-শতাব্দীর রেণেসাঁস যুগই চিত্রশিল্প জোগাইয়াছে।

"জ্যহ্বানি এ পাঅল" মন্দির ত্রয়োদশ শতাব্দীর গথিক রীতি বহন করিতেছে। কি ফটকের কারুকার্য্য, কি ভিতরকার দেওয়াল ও কবরগুলা সবই চরম বিলাসের সাক্ষী। হ্বেনিসের বড় বড় "দজে" বা নবাব এবং সেনাপতি ইত্যাদি শ্রেণীর লোকে এই গির্জ্জায় কবর পাইয়াছে। প্রকারান্তরে মন্দিরটাকে এই শহরের "পান্থেয়ন" বা বীরভবন বলা চলে।

পাদোহ্বার মতন হ্বেনিসেও মনুমেণ্ট চোখে পড়িতেছে। "জ্যহ্বানি" মন্দিরের সম্মুখেই অশ্বপৃষ্ঠে সেনাপতি কোলেঅনি। পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। পিতলের মূর্ত্তি। সরকারী বা সার্ব্বজনিক বাগিচায় যাইবার পথে গারিবাল্‌দির মূর্ত্তিও দেখা যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হ্বেনিসে একবার প্লেগের মড়ক লাগিয়াছিল। তাহাতে লোক মারা পড়ে প্রায় হাজার

পঞ্চাশেক। মড়কের হাত হইতে নগরবাসীরা কোনো মতে রক্ষা পায়। সেই উপলক্ষে একটা মন্দির "মা-মেরী"র নামে মানত করা হইয়াছে। মেরী এখানে স্বাস্থ্যের দেবী রূপে পূজা পান। "রক্ষা-কালী" বলিলে হিন্দুরা যা বুঝে "মারিয়া দেল্লা সালুতে" বলিলে খৃষ্টান চিত্তে মেরীর সেই রূপই ফুটিয়া উঠে। "দজে"-প্রাসাদের অপর পারে,—খালের প্রায় শেষ সীমানায়—মন্দিরটা মুসলমানী গম্বুজ পরিয়া খাড়া আছে।

নানা যুগে নানা মন্দির মাথা তুলিয়াছে। কাজেই বিভিন্ন বাস্তু-রীতির গড়ন শহরের সর্ব্বত্র ছড়ানো দেখিতে পাই। "সাল্‌হ্বা-তরে", "জ্যুলিয়ান" ইত্যাদি মন্দির রেণেসাঁসের সাক্ষী।

ব্যবসা-কলেজ

হ্বেনিসে অটোমোবিলের উৎপাত নাই। গাড়ীও চলিতে পারে না। এমন কি দ্বিচক্রযানেরও গতিবিধি এক প্রকার অসম্ভব। যান দেখিতেছি একমাত্র গন্দলা আর নরনারীর শ্রীচরণ।

ব্যবসা-কলেজের এক ছাত্র শেষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। পাশ হইলে উপাধি পাইবে "দত্তরে" অর্থাৎ "ডক্টর"। ইতালিতে পরীক্ষার রীতি বিচিত্র। মৌখিক পরীক্ষাই একমাত্র পরীক্ষা। তিনজন অধ্যাপক একসঙ্গে বসিয়া পনর বিশ মিনিট ধরিয়া এক একজন ছাত্রের বিদ্যা যাচাই করেন। ঐ পর্য্যন্তই শেষ। অধিকন্তু কোনো এক বিষয়ে ত্রিশ চল্লিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটা "রিসার্চ্চ" জাতীয় অনুসন্ধান-মূলক প্রবন্ধ রচনা করিতে হয়। এইটাই একমাত্র লিখিত পরীক্ষা।

ইতালিতে বারকয়েক

মৌখিক পরীক্ষাগুলা সব এক সঙ্গে লওয়া হয় না। এক একটা বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা সময় নির্দ্ধারিত থাকে। মোটের উপর তিনচার বৎসরের ভিতর বিশ বাইশটা শিক্ষণীয় বিষয় ভাগাভাগি হইয়া যায়। এই ধরণের পরীক্ষা-প্রণালী কায়েম করিলে ভারতে বোধ হয় কোনো ছাত্রই কোনোদিন ফেল মারিবে না। পরীক্ষার প্রথাটা কঠিন করিয়া রাখা জগতে বিদ্যার পথ মারিয়া রাখিবার সমান।

"কা ফস্কারি" বা ফস্কারি প্রাসাদে ব্যবসায়-কলেজটা চলিতেছে। সৌধের সম্মুখ দিককার খিলানগুলায় "গথিকের" ছায়া পড়িয়াছে। ফস্কারি ছিলেন "দজে" অর্থাৎ বণিক-গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট।

ছাত্র বলিতেছে :—"হ্বেনিস সমুদ্র বন্দর বটে, কিন্তু ইতালির উত্তর অঞ্চলের আসল বন্দর মিলানো। হ্বেনিসের বাণিজ্য গৌরব বর্ত্তমানে একদম নাই।"

ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় ইতালি

"ক্রেদিত ইতালিয়ান," "বাঙ্কা কমার্চিয়ালে" ইত্যাদি বড় বড় ইতালিয়ান ব্যাঙ্কের শাখা দেখিতেছি। "কানাল গ্রান্দে"র ঘাটে ঘাটে যে সব "কা" বিরাজ করিতেছে তাহার অনেকগুলায় হোটেল। দেশী বিদেশী পর্য্যটকের চলা ফেরা হ্বেনিসে অনেক।

ফ্রান্সের মতন ইতালিতেও বিদেশী টুরিষ্টদের নিকট হইতে জনগণের প্রচুর আয় হয়। ইতালির ব্যবসা বাণিজ্যের তথ্য-তালিকায় টুরিষ্টদের আনাগোনা বিশেষ ঠাঁই অধিকার করে। যে

বৎসর ইতালিতে বিদেশীরা কম আসে সে বৎসর হোটেলে, ব্যাঙ্কে, দোকানে, রেল আফিসে হাহাকার পড়িয়া যায়। ভারতে অনাবৃষ্টি যেমন রাজস্বের খঁাকৃতির অন্যতম কারণ ইতালিতে বিদেশীদের "অনাগমন" ঠিক সেইরূপ। ইতালিয়ানরা "তীর্থের কাকের মতন" বিদেশীদের টাকার তোড়ার দিকে তাকাইয়া থাকিতে অভ্যস্ত। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড এবং ঈজিপ্টও এইরূপ টুরিষ্ট-প্লাবিত এবং টুরিষ্ট-পোষিত দেশ।

ইতালিয়ানরা ব্যাঙ্ক পরিচালনায় নাকি বিশেষ পটু নয়। যুবা বলিতেছে :—"চেকে কারবার ইতালির গৃহস্থ মহলে নাই বলিলেই চলে। ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখা অথবা কোম্পানী গড়িয়া ব্যবসায়ে টাকা লাগানো ইতালিয়ানদের দস্তুর নয়। আমরা বিদেশী পুঁজি-পতিদের শরণ লইতে বাধ্য। ইংরেজ ও মার্কিণ ধনীরা টাকা খাটাইলে ইতালিতে তেলের কূয়া গুলো খুঁড়িবার ব্যবস্থা হইতে পারিবে।"

তবুও প্রায় ১৭০০ ব্যাঙ্ক ইতালিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই গুলির ভিতর জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কের সংখ্যা প্রায় ৩৪০ মাত্র। কৃষি-কার্য্যের জন্য ১৫০টী ব্যাঙ্ক ইতালির বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার সাক্ষ্য দিতেছে। "কো-অপারেটিভ" ব্যাঙ্ক গুনতিতে প্রায় ৫০০। এই সংখ্যা হইতেও একটা অনুন্নত দেশের উন্নতি লাভের সিঁড়িটা ধরিতে পারা যায়।

ইতালি ইয়াঙ্কিস্থান নয়, ইংলণ্ড নয়, জার্ম্মাণিও নয়। ইতালির আবহাওয়ায় ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে হতাশ হইতে হয় না। খানিকটা খাটিতে পারিলেই বর্ত্তমান ভারতকে ইতালির ধাপে

ঠেলিয়া তোলা সম্ভব মনে হইতেছে। ভারত-সন্তানেরা একবার চোখ খুলিয়া বর্ত্তমান জগতের মাফিক কর্ত্তব্য পালন করিতে অগ্রসর হউন।

মোখা-নাচার ধুম

চৈত্র বৈশাখ মাসে বাঙালী গাজন-গম্ভীরার ঢাকে ঘা মারিতে অভ্যস্ত। আর সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় রকমারি মুখোস নাচ। সেই মোখার ধুমই দেখিতেছি হ্বেনিসে। কি পাদোহ্বা, কি জেনোহ্বা, কি নাপোলি,—ইতালির সর্ব্বত্রই হাটে বাজারে পিয়াৎসায় মোখা-পরা নরনারীর রং তামাসা চলিতেছে। কেবল ইতালিতেই কেন? ফ্রান্সে, সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে, জার্ম্মাণিতে, অষ্ট্রিয়ায়,—ইয়োরোপের সর্ব্বত্রই মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ মোখা নাচের তিথি। নানা নামে এই উৎসবকে পশ্চিমারা বলে "কার্ণিহ্বাল।"

হাল্লা, ছুটাছুটি, মিছিল, "নগর-কীর্ত্তন,"—এই সবই কার্ণিহ্বালের অঙ্গ। মুখোস আর ছদ্মবেশ এই উৎসবের প্রধানতম দ্রষ্টব্য বস্তু।

খৃষ্টানদের "ইষ্টার" তিথিতে খৃষ্টদেব "সশরীরে" পুনরায় দেখা দিয়াছিলেন। এই তিথির পূর্ব্ববর্ত্তী চল্লিশ দিনকে বলে "লেণ্ট্"। এই সময় চরম বিষাদের যুগ। উপবাস, "রোজা" ইত্যাদি পালন করা রেওয়াজ।

ঠিক যেদিন "লেণ্ট্" সুরু হইবার কথা তাহার আগেকার সাত দিন চলে—"সাত খুন মাপ।" ইহাকে বলে "নৈতিক ছুটি" ভোগ। এই সময়ে আমোদ প্রমোদ, যথেচ্ছাচার এবং সকল প্রকার

সামাজিক "স্বাধীনতা"র স্বোআদ নর নারীরা চাখিবার সুযোগ পায়।

ইষ্টারের নামেই চলুক বা "ভোলা মহেশ্বরে"র নামেই চলুক,—জগতের সনাতন আধ্যাত্মিক সাধনায় "নৈতিক ছুটি"গুলার মাহাত্ম্য সর্ব্ববাদিসম্মত। প্রাচ্য পাশ্চাত্য "আদর্শ" চুঁড়িতে বসিলেই গোলে পড়িতে হইবে। এখানে "রক্ত-মাংসের স্বধর্ম্ম" বিরাজ করিতেছে। একদম মান্ধাতার আমলের "নৃতত্ত্ব" এই সকল রীতিনীতির আসল ব্যাখ্যাকার। খৃষ্টানদের মুখোস নাচে আর চীনা-জাপানী-ভারতীয় হিন্দু-বৌদ্ধের তদনুরূপ কাণ্ডে একই তত্ত্বকথা পাওয়া যাইবে।

ইতালিয়ান ভাষার একাল-সেকাল

১

একজন ভাষাশিক্ষক বলিতেছেন :—"আমি ন্যাশন্যালিষ্ট বটে, কিন্তু ফাশিষ্ট নই! ফাশিষ্টদের কর্ম্মপ্রণালী বহু ন্যাশন্যালিষ্টেরই পছন্দসই নয়। ফাশিষ্টরা বেশী দিন গদীতে থাকিতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস করি না। আমার বিশ্বাস আগামী পার্ল্যামেণ্ট-বাছাইয়ে মজুরপন্থী সোশ্যালিষ্টরা ইতালিতে কর্ত্তা হইয়া বসিবে। হ্বেনিসে সোশ্যালিষ্টদের বড় আড্ডা। বস্তুতঃ গোটা উত্তর ইতালিতে 'আহ্বান্তি' কাগজই লোকের হাতে বেশী দেখিতে পাইবেন।"

ছাত্রের যুগ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল। ইনি বলিলেন :—

ইতালিতে বারকয়েক

"মহাকবি দান্তের সময় বলিলে আমরা একসঙ্গে তিন জন সাহিত্যবীরের কথা বুঝিয়া থাকি। তাঁহারা ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক। প্রথমতঃ দান্তে (১২৬৫-১৩২১)। ইনিই অপর দুই জনের পথ প্রদর্শক। দান্তের মৃত্যুর সময় ইহারা শিশু বা বালক মাত্র। এক জনের নাম পেত্রার্কা (১৩০৯-১৩৭৫)। ইনি কবি। অপর জন গদ্য-সাহিত্যে প্রসিদ্ধ। নাম বকাচিঅ ইহার 'দেকামেরোণে' ইতালির 'কথামালা' বিশেষ। পেত্রার্কা এবং বকাচিঅ দুই জনে সমসাময়িক।"

পেত্রার্কা এবং বকাচিঅ দুই জনের রচনাই মধ্যযুগের বিলাতী সাহিত্যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সেই সূত্রে দান্তে-যুগের ইতালিয়ান সাহিত্য ভারতীয় জ্ঞান-মণ্ডলে অল্পবিস্তর পরিচিত হইয়াছে।

শিক্ষক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম:—"আচ্ছা, এই যে রাস্তায় এক জন লোক 'আহ্বান্তি' পড়িতে পড়িতে যাইতেছে সে এই দান্তে-পেত্রার্কা-বকাচিঅ'র লেখা বই গুলা পড়িয়া সহজেই বুঝিতে পারিবে কি? এক মাত্র ভাষার তরফ হইতে প্রশ্নটা করিতেছি, সাহিত্যের রসবোধ স্বতন্ত্র।"

শুনিলাম:—"সে যুগের ইতালিয়ান ভাষায় আর আজ কালকার ইতালিয়ান ভাষায় প্রভেদ নেহাৎ কম। বিংশ শতাব্দীর যে কোনো লোক ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ইতালিয়ান বিনাকষ্টে বুঝিতে সমর্থ। দুই চার দশ বিশটা শব্দ হয়ত কিছু সেকেলে ঠেকিবে এই যা।"

বর্ত্তমান ইতালিয়ান ভাষার জন্মদাতা ছিলেন দান্তে। তখন-

ইতালিতে বারকয়েক

কার দিনে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের মতন ইতালিতেও লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা এক মাত্র ল্যাটিনের চর্চ্চা করিতে অভ্যস্ত ছিল। ইতালিয়ান নরনারীকে স্বদেশী অর্থাৎ মাতৃভাষায় হাতে খড়ি দেওয়ানো দান্তের অন্যতম কীর্ত্তি। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের কথা,—দান্তের হাতে যে ভাষাটার জন্ম হইল তাহার রূপ আজ পর্য্যন্ত সাতশত বৎসরের ভিতর বিশেষ রূপে বদলায় নাই? বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

এই হিসাবে বাংলা ভাষাকে ইতালিয়ানের ঠিক উল্টা বলিলেই বোধ হয় ভুল হইবে না। শুনিয়াছি,—উনবিংশ শতাব্দীতে রুশ ভাষা আগাগোড়া বদলাইয়া গিয়াছে। আজ কালকার রুশে আর অষ্টাদশ শতাব্দীর রুশে অনেক প্রভেদ। বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশকে রুশের ক্রমবিকাশের অনুরূপ বলিলে দোষ হইবে কি?

আসল কথা,—বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলা ভাষার যে মূর্ত্তি চলিতেছে সেইটাই কি ইহার স্থির রূপ? বাংলা কোন্ আকারে গড়িয়া উঠিবে তাহা এখনো জোরের সহিত ইঙ্গিত করা সহজ কি? যাঁহারা ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিতেছেন তাঁহারা হয়ত খানিকটা পাকা জবাব দিতে পারিবেন।

গুরু-চাণ্ডালীর মাহাত্ম্য

এইখানে একটা ছোট খাটো সমস্যা তুলিতেছি। ধরা যাউক "শব পোড়া" বা "মরাদাহ"। এই ধরণের বোল দোষ কি গুণ? ইহাকে পণ্ডিতেরা "গুরু-চাণ্ডালী" বলিতে অভ্যস্ত। অতএব ইহা "মহাপাতক" সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই মহাপাতক হইতে উদ্ধার পাওয়া বাংলা ভাষার পক্ষে সম্ভব কি ? বাংলা ভাষা এই ধরণের হাজার হাজার পাতক ঘাড়ে বহিয়া ছুটিতেছে। পাপ হইলেও এইগুলা বাঙালীর মজ্জাগত, অতএব সহজেই হজমযোগ্য।

সোজা কারণ ও আছে। (একমাত্র সংস্কৃত অথবা সংস্কৃত-ঘেঁশা শব্দের সাহায্যে বাংলা গড়িয়া উঠে নাই,—উঠিবেও না। অসংস্কৃত শব্দ আসিয়া জুটিয়াছে,—জুটিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও জুটিবে। প্রত্যেক বাক্যেই এক সঙ্গে কোনো শব্দ সংস্কৃত বা সাধু এবং কোনো শব্দ অসাধু বা গ্রাম্য থাকিবেই থাকিবে। ইহাই বাংলার গতি।)

পাড়াগেঁয়ে শব্দ গুলার ভিতর যদি "মাল" থাকে তবে সে গুলাকে বয়কট করা হইবে কেন ? এই গুলা যদি আপনা আপনিই সুবোধ্য হয় অথবা কয়েকজন পাকা লেখকের কলমের জোরে এই সবকে সুবোধ্য করিয়া ছাড়া যায় তাহা হইলে কে আপত্তি করিবে ?

কলিকাতার শব্দও এই হিসাবে "পাড়াগেঁয়ে" শব্দ। "পাড়াগেঁয়ে" বলিলেই বুঝিতে হইবে এইগুলা প্রথম প্রথম মাত্র কোনো এক মহকুমা বা জেলা বা সহরের খাশ পেটেণ্ট। নিজ নিজ বাসভুমি বা জন্মনিকেতনের বাহিরে কোনো পাড়াগেঁয়ে শব্দকে "চল" করা বা সাহিত্যের পংক্তিভোজনে ঠাঁই দেওয়া পরিশ্রম-সাপেক্ষ। প্রথম প্রথম এই গুলার বিরুদ্ধে সহরের তরফ হইতে না হয় মফঃস্বলের তরফ হইতে একটা না একটা আপত্তি থাকিবেই।

কিন্তু তাহা বলিয়া ওস্তাদেরা নিজ অভিজ্ঞতা মাফিক নয়া নয়া শব্দ গড়িতে ভয় পাইবে কি? "পাড়াগেঁয়ে" গুলা ত হাতের কাছেই রহিয়াছে। এই সবের দিকে অভিযান বাড়িবে ছাড়া কমিবেনা। অধিকন্তু হিন্দি, উর্দ্দু, উড়িয়া, আসামী, পাহাড়ী এবং মধ্যযুগের পালি প্রাকৃত ইত্যাদির মুল্লুক হইতেও অনেক সরস শব্দ বাছিয়া বাছিয়া বাংলায় আমদানী করা সম্ভব। তাহাতে বাঙালীর ভাষা সম্পদ বাড়িতে বাধ্য। একমাত্র সংস্কৃতের বিশ্বকোষ ঘাঁটিয়া বাংলার ঘর ভর্ত্তি করা হইতে থাকিবে,—এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ নাই।

আজকাল ভারতে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা সুরু হইয়াছে। এই আলোচনার ফলে ভারতের নানা অঞ্চলের নানা সরস শব্দ সাহিত্য-সেবীদের পাতে পড়িতেছে। বাংলা সাহিত্যের "স্রষ্টারা" কি সেই সকল শব্দ "বেমালুম গাপ" করিবার লোভ সামলাইতে পারিবেন?

বণিক-পরিবার

১

শেক্স্পীয়ারের কৃপায় "হ্বেনিসের সওদাগর" ভারতবাসীর সুপরিচিত লোক। আর ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণের রচনাবলীর প্রভাবে বণিক-পর্য্যটক মার্কো পোলোকে আমরা আমাদের অতি-নিকট আত্মীয় বিবেচনা করিতে শিখিয়াছি। মার্কো পোলো হ্বেনিসের লোক। ত্রয়োদশ শতাব্দীর চীন, ভারত এবং অন্যান্য এশিয়ান দেশের কথা এই হ্বেনিস-সন্তানের বিবরণেই প্রচারিত হইয়া থাকে।

ইতালিতে বারকয়েক

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া হ্বেনেৎসিয়ার লোকেরা এশিয়ার সঙ্গে ইয়োরোপের সওদা-বিনিময়ের কাজে অগ্রণী রহিয়াছে। "আদ্রিয়াতিক-রাণী" হ্বেনেৎসিয়া চিরকালই বণিক-পুরী।

ঘটনাচক্রে এখানে বন্ধুও জুটিয়াছেন এক সওদাগর। কারবার ইহার বড় গোছেরই দেখিতেছি। সান মার্কো গির্জ্জার নিকটেই ইহার বসতবাড়ী ও দোকান। বণিক-পত্নী ফরাসী ভাষায় কথা বলিতে পারেন। ঘরে মাষ্টার রাখিয়া ফরাসী শিখিয়াছিলেন। ইনিই স্বামী মহাশয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় দোভাষীর কাজ করিলেন।

সওদাগর বলিতেছেন—"হ্বেনিসের হাটে বাজারে যে সব মাল দেখিতেছেন তাহার অধিকাংশই বিদেশী পর্য্যটকদের অভাব মোচনের উপযোগী। এই সমুদয়ের খুব কম জিনিষই হ্বেনিসের তৈয়ারি। বস্তুতঃ ইতালিয়ান চিজ ও অতি অল্পই দেখিতে পাইবেন। বিলাতী, আমেরিকান এবং জার্ম্মাণ মালের কেনাবেচাই এইখানে চলিয়া থাকে।"

২

বণিক-বন্ধু "সপরিবারে" ব্যবসা করেন। ইহার ছেলে এবং জামাই দোকানে বাহাল আছেন। পত্নীকে দেখিলে মনে হইবে ঠিক যেন ভারত-নারী। চুলের রংয়ে ত বটেই, মুখশ্রীতে ও ইয়োরোপীয়ান-সুলভ শ্বেতাঙ্গিত্ব লক্ষ্য করা কঠিন। কন্যাকে দেখিয়া মনে হইতেছে অবিকল ইহুদি। বাবু স্বয়ং "শ্বেতাঙ্গ" রূপে চলিতে পারেন। ইহারা খৃষ্টান এবং ক্যাথলিক।

ইহারা ধনীলোক। কিন্তু চালচালন সাদা সিধা। ইহাদের গ্রীষ্মভবন একটা প্রাসাদ বিশেষ। এটা বিলাসী মহলে সুপ্রসিদ্ধ লিদো দ্বীপের এক সুন্দর বাগান-বাড়ী। গ্রীষ্মকালে দুনিয়ার পয়সাওয়ালা নরনারী লিদোয় আসিয়া মজা লুটেন। সাগরে সাঁতার কাটা তখন এক আমোদ। মিনিট দশ-পনর'র ফেরিতে ভেনিস হইতে পৌঁছানো যায়।

মহিলাকে পুত্রশোকে অধীর দেখিলাম। লড়াইয়ে বড় ছেলে মারা পড়িয়াছে। সে দুঃখ এখনো ভুলিতে পারেন নাই। আসল কথা সেই শোকে মাথার ব্যারামই সুরু হইয়াছে। কথায় কথায় মূর্চ্ছা যাওয়া বা হাত-পা কাঁপা ঘটে। "মায়ের প্রাণ" ইতালিতেও বিরল নয়।

৩

সওদাগর মহাশয় হরেক রকম ছাতার কারবার করেন। চামড়ার ব্যাগ ইত্যাদিও দোকানে দেখিলাম। কচ্ছপের খোলে তৈয়ারি নানা প্রকার বাঁট এবং এই ধরণের বাঁটে তৈয়ারি বাক্স, ব্যাগ, ঢাকনা সবই মজুত আছে। মালগুলা অধিকাংশই বিদেশী। সুমাত্রা, মালাক্কা ইত্যাদি দেশের ছড়িও এক বড় বিভাগ।

ইহার নিকট শুনিলাম ভেনিসদ্বীপের আশে পাশে ছোট বড় মাঝারি প্রায় দুই শ দ্বীপ অবস্থিত। এইগুলার কোনো কোনোটায় বর্ত্তমান জগতের শিল্প মাথা তুলিতেছে। অর্থাৎ ফ্যাক্টারির কারবার গড়িয়া উঠিতেছে। তেলের কল আর তুলার কল এই দুই দিকে ভেনিস জাঁকিয়া উঠিবে বলিয়া বিশ্বাস করা চলে।

বণিক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম :—"ভেনিসে মজুর-পন্থীদের প্রভাব এত বেশী কেন ? নবীন শিল্প ত সবে মাত্র সুরু হইতেছে।" জবাব—"পুরাণা গৃহশিল্প বা কুটির-শিল্প ও ভেনিসে প্রচুর। আর সে সবে কারিগরদের আর্থিক অবস্থা বিশেষ সন্তোষ-জনক নয়। অধিকন্তু, ভেনিসের দুই কোণে দুইটা বড় কুলীর আড়ত আছে। এক কোণে জাহাজ-ঘাটা। এখানে মাল উঠা-নামার কাজে জাহাজের কুলীরা বাহাল থাকে। অপর কোণে আর্সেনাল। এখানে মজুরেরা কুলীগিরি ছাড়া শিল্পীর কাজেও নিযুক্ত। ছোটখাটো জাহাজ এই কারখানায় তৈয়ারি হয়। তাহা ছাড়া লড়াই-সংক্রান্ত অস্ত্রবিস্তর মাল ও প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভেনিস একটা শক্ত, প্রায় দুর্ভেদ্য জলদুর্গ বিশেষ।"

"ভেনিসের আসল শিল্প কি কি ?"

"প্রথমতঃ, কাচ। মান্ধাতার আমল হইতেই ভেনিসের কাচ জগদ্বিখ্যাত। ভেনিসের কাচ অত্যুচ্চ সুকুমার শিল্প-সমন্বিত হইয়া এসিয়াবাসীর চিত্ত দখল করিয়াছে। কাচের কারখানাগুলা দেখিতে হইলে মুরাণো দ্বীপে যাইতে হইবে। ছোট দ্বীপ,—মাত্র হাজার পাঁচেক লোক।

"দ্বিতীয়তঃ,—ফিতার কাজ। ভেনিসের ফিতার জন্য ইয়ো-রোপীয়ান নারীরা পাগল হয়। পোষাকের জন্য, আসবাবের জন্য, বিছানার জন্য, পর্দ্দার জন্য,—এক কথায় নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের সকল কাজেই ফিতার রেওয়াজ খুব বেশী। এই ফিতা শিল্পের কেন্দ্রস্থল দেখিতে হইলে আর একটা দ্বীপে যাইতে হইবে। নাম বুরাণো।"

মার্কো পোলোর বাস্তুভিটা

হ্বেনিসে আসিলে মার্কো পোলোর বাস্তুভিটা ঢুঁড়িয়া বাহির করা পর্য্যটক মাত্রেরই বাতিক। কি ইয়োরোপীয়ান, কি এশিয়ান সকল জাতীয় ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিকের পক্ষেই মার্কো পোলোর কৃতিত্ব খুব বড়দরের। বাস্তুভিটার একটা খিলান মাত্র খাড়া আছে। ১২৫৬ সালে পোলোর জন্ম। অনেক দিনের কথা। অতদিনের ঘরবাড়ী ছুনিয়ার সর্ব্বত্রই ধ্বংসস্তূপ মাত্র রূপে দেখা যায়।

পোলোর প্রাসাদের পূর্ব্বে "মারিয়া দেই মিরাকলি" গির্জ্জা এবং পশ্চিমে "জ্যহ্বানি ক্রিসস্তম" গির্জ্জা পরবর্ত্তী কালে মাথা তুলিয়াছে। রেণেসাঁসের শিল্প-বীর তিৎসিয়ান (১৪৭৭-১৫৭৬) এই মহাল্লায়ই বসবাস করিতেন।

ব্যবসা-বাণিজ্যের আড়ৎ

হ্বেনিস ছিল প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের পুল বিশেষ। এশিয়ার মাল—লেবান্ত দ্বীপের সওদা নামে মুসলমানদের তদবিরে হ্বেনিসের বন্দরে পৌঁছিত। এই বন্দর হইতে জার্ম্মাণরা—হান্সা বণিকসঙ্ঘের মারফৎ এশিয়ান মাল ইয়োরোপে বাঁটিয়া দিত। আবার এই পথেই ইয়োরোপের মাল এশিয়ায় গিয়া ছড়াইয়া পড়িত।

বড় খালের ছুই ঘাটে এই সূত্রে ছুইটা প্রাসাদ দ্রষ্টব্য। একটার নাম "ফন্দাচ দেই তেদেস্কি" বা জার্ম্মাণ-ভবন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই বাস্তু নির্ম্মিত হয়। ষোড়শ

শতাব্দীতে ভিংসিয়ান এই ইমারতের দেওয়াল লেপিয়াছিলেন। কিন্তু নোনা জলের আবহাওয়ায় শিল্পকর্ম্ম সবই মুছিয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণ সওদাগরেরা এইখানে আড্ডা গাড়িতে বাধ্য থাকিত। মাল কেনাবেচার উপর পাহারা ছিল খুব জবর। হ্বেনেৎসিয়ার সরকারী কর্ম্মচারীদের অসাক্ষাতে এবং বিনা হুকুমে দরদস্তুর অথবা লেন দেন চলিতে পারিত না।

এই ধরণেরই আর এক প্রাসাদ "ফন্দাচ দেই তুর্কি" অর্থাৎ তুর্কী-ভবন নামে পরিচিত। তুর্কীরা ছিল বাণিজ্য মহলে এশিয়ার প্রতিনিধি।

জার্ম্মাণ-ভবনে আজকাল চলিতেছে ডাকঘর। তুর্কী-ভবনটা "মুজেঅ চিহ্বিক" বা নগর-মিউজিয়াম। এই সংগ্রহালয়ে সেকালের এশিয়ান-ইয়োরোপীয়ান অস্ত্রশস্ত্র একসঙ্গে তুলনা করিয়া দেখা যায়। তাহা ছাড়া কুটিরশিল্প-জাত দ্রব্যের তরফ হইতেও প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে তুলনা করা চলে। হ্বেনিসের নরনারী মধ্যযুগে কিরূপ জীবন যাপন করিত সে কথা বুঝিতে হইলে এই মিউজিয়ামের চিত্রসংগ্রহ বিশেষ কাজে লাগে।

শেক্স্পীয়ারের শাইলক "রিয়াল্‌তো"র বাজার-পাড়া উল্লেখ করিয়াছে। কাজেই রিয়াল্‌তোর নাম সর্ব্বত্র সুপরিচিত। হ্বেনিসে পদার্পণ করিবা মাত্র রিয়াল্‌তো ঢুঁড়িয়া বাহির করিবার জন্য মাথা ঘামাইতে হয় না। প্রকাণ্ড পাথরের পুল "পন্তে দি রিয়াল্‌তো" নামে "কানাল গ্রান্দে"র গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। এইটাই বড় খালের উপরকার একমাত্র প্রস্তর-সেতু। খালের উপর আর দুইটা মাত্র পুল আছে। দুইটাই লোহায় গড়া।

রিয়াল্‌তো মহাল্লার দোকান পাট আজও সুপ্রসিদ্ধ। বিদেশী পর্য্যটকের হুড়াহুড়ি এখানে খুব বেশী। মায় পুলের উপরেই দুই সারি দোকান। "গন্দলা" হইতে সাঁকোর খিলান বিপুল মূর্ত্তির পরিচয় দেয়। শেক্‌স্পীয়ারের যুগেই এই পুল গড়া হইয়াছিল।

হ্বাগ্নার ব্রাউনিঙ্‌ ইত্যাদির আড্ডা

বড় বড় বিদেশী সুধী অনেকেই হ্বেনিসের জল খাইয়া গিয়াছেন। জার্ম্মাণ সঙ্গীতগুরু হ্বাগ্নার ১৮৮৩ সালে এই নগর-দ্বীপেই মারা পড়েন। বাড়ীটা "পালাৎস হ্বেন্দ্রামিন" নামে পরিচিত। বড় খালের এক ঘাটে হ্বেন্দ্রামিন-ভবন রেণেসাঁসের মর্ম্মর-বাহার বহন করিয়া আসিতেছে। রেখাগুলার সামঞ্জস্য দেখিলেই চোখ জুড়ায়।

এই ধরণেরই আর এক পালাৎস'য় বা প্রাসাদে বিলাতী কবি রবার্ট ব্রাউনিঙ ছিলেন প্রবাসী। "রেৎসনিক-ভবনে" বসিয়া ব্রাউনিঙ্‌ ইংরেজ জাতির নিকট ইতালির পথঘাট সুধীগুণী সবই আপনার করিয়া ছাড়িয়াছেন। ইতালির "গলি ঘোঁচ" স্বচক্ষে না দেখিলে ব্রাউনিঙ্‌-সাহিত্য দুর্ব্বোধ্য থাকে। অর্থাৎ ইতালির একাল-সেকাল গুলিয়া খাওয়া দরকার,—তাহার পূর্ব্বে ব্রাউনিঙের সাহিত্যে রস ভোগ করা কঠিন।

বায়রণ ও বসবাস করিয়াছিলেন এক প্রাসাদে। "মোচেনিগ পালাৎস" তাহার নাম। বড় খালেরই ধারে। বায়রণ সেকালের ইতালীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে গুপ্তসমিতির লোকজনকে টাকা

সাহায্য করিতেন। তবে যুবক ইতালি তখনও স্বাধীনতার জন্য পাকিয়া উঠে নাই। সে মাৎসিনি-গারিবাল্‌দির ও একপুরুষ আগেকার কথা,—ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক।

চিত্রশিল্পের ভেনিস-রীতি

যদি কেহ ছবি দেখিবার সাধ মিটাইতে চায় তবে তাহাকে লোহার পুল পার হইয়া "আকাদেমিয়া দে বেল্লে আর্তি" বা সুকুমার শিল্প-পরিষদের ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে। সেখানে প্রবেশ করা সহজ, বাহির হওয়া কঠিন। চোখ "ছানা বড়া" হইয়া যায়। আর একদিনে "নমো নমো" করিয়া সংক্ষেপে সারা অসম্ভব! এক সপ্তাহ পায়ের জোর যার,—এক মাত্র তাহার পক্ষে "আকাদেমিয়া"র সুবিচার করা চলে।

লণ্ডনে, নিউইয়র্কে, প্যারিসে, বার্লিনে "ভেনিসের শিল্প-রীতি" দুই চার দশখানা নমুনায় আটক দেখিয়াছি। তাহাদের অনেক-গুলাই আবার মূলের নকল মাত্র। ভেনিসে দেখিতেছি মন্দিরে প্রাসাদে সেই শিল্পরীতিরই বাছা বাছা জিনিষগুলা। মন্দির প্রাসাদের বাহিরে যেসব ছবি একত্র সংগ্রহ করা সম্ভব সেই সবই এই "আকাদেমিয়া"য় ঠাঁই পাইয়াছে।

নেপোলিয়ন উত্তর ইতালি দখল করিয়াছিলেন। সেই যুগে নেপোলিয়নের হুকুমে (১৮০৭ সালে) এই আকাদেমিয়া স্থাপিত হয়। আজ এখানকার প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে হাজার হাজার ছবির স্থায়ী মেলা। ইয়োরামেরিকার প্রায় প্রত্যেক নামজাদা চিত্র-

শিল্পীই বোধ হয় যৌবনে,—ছাত্রাবস্থায়,—অথবা প্রৌঢ় বয়সে হ্বেনিসের এই আকাদেমিয়ায় আসিয়া রূপের লহর আর রঙের বাহার সৃষ্টি করিবার কৌশল শিখিয়া গিয়াছে।

২

রেণেসাঁসের ভরা জোয়ারে যে সকল হ্বেনিস-শিল্পী কাজ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম লণ্ডনে, নিউইয়র্কে সর্ব্বত্রই দেখা গিয়াছে। কিন্তু হ্বেনিসের শিল্প-ধারা অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বজায় ছিল। এই যুগের এক বড় কারিগরের নাম তিয়েপল (১৬৯৩-১৭৭০)। আকাদেমিয়ার সংগ্রহে তিয়েপলর "অঙ্কন"-ক্ষমতা বেশ স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। অতি স্বচ্ছ শুভ্র বর্ণ-সমাবেশেও এই শিল্পী ওস্তাদ বটে।

হ্বেনিসের রেণেসাঁস বলিলে আমরা জানি প্রধানতঃ দুই ওস্তাদকে। প্রথমতঃ, তিৎসিয়ান (১৪৭৭-১৫৭৬), দ্বিতীয়তঃ, হ্বেরণেজে (১৫২৮-১৫৮৮)। তাঁহাদের কাজে আকাদেমিয়ার অনেক অংশ ভরা বটে। কিন্তু হ্বেনিসের ঘরে বাইরেই তিৎসিয়ান এবং হ্বেরণেজে অমর। বিশেষতঃ শতবর্ষব্যাপী জীবনে তিৎসিয়ান যে সব ছবি আঁকিয়াছেন তাহার অনেক গুলাই হ্বেনিসের চতুঃসীমার বাহিরে বিরাজ করিতেছে।

হ্বেরণেজের রংয়ে-রূপে হ্বেনিসের সম্ভ্রান্ত জীবন অর্থাৎ "বড় ঘরের কথা" গুলা ফুটিয়া রহিয়াছে। বুড়া বয়সেও তিৎসিয়ান রঙের দরিয়ায় সাঁতার কাটিতে আনন্দ পাইতেন।

তাঁহাদের সকলেরই গুরু অথবা গুরুর গুরু বেলিনি। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বেলিনি-পরিবার হ্বেনিস-রীতির স্থত্রপাত করে। দুই ভাই এবং এক ভ্রাতুষ্পুত্র এই বংশের উজ্জ্বল রত্ন। জেন্তিলে বেলিনি ছিলেন প্রবর্ত্তক।

বেলিনি বংশের স্থকুমার শিল্পে ধর্ম্মভাব ও আধ্যাত্মিকতা কিছু কিছু বজায় ছিল। তাঁহাদের অঙ্কনে এবং রংয়ে ও রেখার দাগে "আদিম" বা সেকেলে—অনেকটা জ্যত্তপন্থী তুলীর পোঁছ দেখিতে পাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু এই সরলতা এবং সহজ গতিভঙ্গী তিৎসিয়ান-হ্বেরণেজের শিল্পে ঢুঁড়িতে আসা বিড়ম্বনা মাত্র। ইহারা "আধুনিক",—নবজগতের স্রষ্টা।

রোমে এই সময়ে মিকেলাঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৩) এবং রাফায়েল (১৪৮৩-১৫২০) পুরাণা ভাঙিয়া নতুন গড়িবার কাজে মোতায়েন। এই চতুষ্টয়েরই আর এক সতীর্থ স্থহৃৎ দাহ্বিঞ্চি লম্বার্দি প্রদেশে রেণেসাঁস কায়েম করিতেছিলেন।

মার্কো মন্দিরের আঙিনায়

১

মার্কো-মন্দিরের "পিয়াৎসায়" বা আঙিনায় পায়চারি করিতেছি। ঠিক দুপুর বেলা। অগণিত পায়রার ঝাঁক উড়িয়া উড়িয়া মেজেয় আসিয়া বসিতেছে। পায়চারি করিতেছে অথবা কাফেতে বসিয়া পানাহার করিতেছে বহুসংখ্যক দেশী-বিদেশী নরনারী।

ইতালিতে বারকয়েক

চীনা, জাপানী, তুর্কী, মিশরী, যায় পাগ্রীওয়ালা ভারত-সন্তানকেও ভিড়ের মধ্যে দেখিতেছি। শাল জড়াইয়া ইতালিয়ান নারীরাও চলাফেরা করিতেছে। ইংরেজিভাষী, জার্ম্মাণ-ভাষী লোকজনের সাড়া পাইতেছি। এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ঠিক যেন স্বপ্নের মুল্লুক ;—অথবা নভেলে বিবৃতকাহিনীর ছবি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

একটা রেষ্টরাণ্টে আসিয়া খাইতে বসা গেল। টেবিল চেয়ার পাতা আছে পিয়াৎসারই উপর,—খোলা আকাশের নীচে। শীত চলিতেছে বটে, কিন্তু মারাত্মক কিছু নয়। অধিকন্তু, কয়েকদিন বৃষ্টি বরফের পর আজ স্থর্য্যের মুখ দেখা যাইতেছে। আকাশ সুনীলও বটে।

"রিজত্ত" খাওয়া যাইতেছে। মুর্গীর রসে সিদ্ধ করা ভাত ইতালিতে এই নামে প্রসিদ্ধ। গরম মশলার দৌরাত্ম্য নাই। তবে মাখনে অথবা চর্ব্বিতে রান্না করা হয়। খাইতে লাগে মন্দ নয়।

সম্মুখেই "কাম্পানিলে" বা ঘড়ি-স্তম্ভ নামে মিনারটা সটান ভাবে খাড়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান আকারে এটা চার শ বৎসরের ও বেশী দণ্ডায়মান। মার্কো-"বাজিলিকা"টাকে পাহারা দেওয়াই যেন ইহার কাজ।

"কাম্পানিলে"র পাশেই "রাজবাড়ী।" পুরাণা পুস্তকাগার এই রাজবাড়ীর অন্যতম ঐশ্বর্য্য। সহভোজী বলিতেছেন :—"গ্রন্থশালাটী কবিবর পেত্রার্কার গড়া প্রতিষ্ঠান। ১৩৬২ সালে

পেত্রার্কা কাব্য রচনায় যত বড়, পাণ্ডিত্যেও তত বড় ছিলেন। ইতালিয়ানরা পেত্রার্কাকে গ্রন্থকীট বলিয়া জানিত।" সহভোজী মহাশয় রাসায়নিক। কেরোসিন তেলের শিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালানো ইঁহার কাজ।

রাজবাড়ী—গ্রন্থশালা—বর্ত্তমান আকারে নিখুঁত "রেণেসাঁসে"র মূর্ত্তি। তিৎসিয়ান, ভেরণেজে এবং তিন্তরেত্ত ইত্যাদির আঁকা ছবি কোনো কোনো দেওয়াল ও ছাদের শোভা সৃষ্টি করিয়াছে; বাস্তুশিল্পী সান্সভিনি ১৫৩৬ সালে ইমারত তৈয়ারি সুরু করেন। সান্সভিনির গড়া প্রাসাদ ভেনিসে গণ্ডা গণ্ডা। অন্যান্য প্রাসাদের রচয়িতারা সান্সভিনিরই চেলা, ভেনিসে রেণেসাঁস বাস্তু বলিলে সান্সভিনির রীতিই" বুঝিতে হইবে।

কেবল গ্রন্থশালাটা কেন,—দুই ধারের হর্ম্ম্যশ্রেণী সবটাই সান্সভিনির সুরু-করা গড়নে তৈয়ারি। এই সকল ভবনের নীচের তলায় মনিহারীর দোকান, কাফে ইত্যাদি। পেছন দিককার প্রাসাদ-সারি ও সম্মুখ ভাগে চোস্তো থাম্বার শ্রেণী সাজাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তিন তলার প্রত্যেক ধাপেই রেখার সৌসাদৃশ্য অতি মনোরম। তিন দিকেই এই এক সুষমার রাজ্য।

"বাজিলিকা"র মুসলমানী গুম্বজগুলার পশ্চাতে, এক কোণে "দজে"-প্রাসাদের এক টুকরা "গথিক" দেওয়াল ও জানালা দেখা যাইতেছে। মন্দির নির্ম্মাণের শেষ তারিখ শুনিলাম ১৪২০। ভিতরকার অলঙ্কার পূর্ণ করিতে ষোড়শ এবং এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কারিগরের কাজ লাগিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতেই

"পালাৎস দুকালে" অর্থাৎ দজে-প্রাসাদও নির্ম্মিত হয়। মন্দির এবং প্রাসাদ দুইই বাস্তুশিল্পী বোন বা বোন-পরিবারের কীর্ত্তি।

অতীতের চাপ

মার্কো-মন্দিরের আবহাওয়ায় সর্ব্বত্র পাইতেছি অতীত আর অতীতের চাপ। আর ভাবিতেছি, যে মুল্লুকে অতীত এত সজাগ ভাবে কথা কয় সে মুল্লুকের নরনারী তাজা জ্যান্ত জীবন চাখিতে পারে কি? এই আঙিনার চারিদিকে,—কাম্পানিলের চূড়ায়, প্রাসাদশ্রেণীর সুগোল পাথরের স্তম্ভে, সোনালী গুম্বজশীর্ষে, মর্ম্মরে, প্রস্তরে, কেতাবে, ছবিতে,—"সেকাল" অতি বিকটরূপে আজও বাঁচিয়া রহিয়াছে। ইহাকে বলে "ঘাড়ে ভূত চাপা।"

এইরূপ অতীতের অভিভাবকতায় সজীব প্রাণ আনন্দে খেলিতে পারে কি? এখানে নিঃশ্বাস ফেলাই যেন কষ্টকর। ভবিষ্যতের কল্পনা করা, বর্ত্তমানকে ভুলিয়া একটা নবীন দুনিয়ার স্বপ্ন দেখা এই সব গথিক-মুসলমানী-রেণেস াঁসের অত্যাচারে অসম্ভব। ইতালি অতীত-প্রপীড়িত দেশ। হ্বেনেৎসিয়ায় অতীতের নির্য্যাতন পদে পদে লক্ষ্য করিতেছি।

এখানে সবই যেন বাসি, সবই যেন পচা, সবই যেন দুর্গন্ধময়। টাট্‌কা কিছু খাড়া করিতে যাওয়া এক প্রকার অসাধ্য। বিপুল অতীত,—"কাম্পানিলে"র অঙ্গুলি-সঙ্কেতে নরনারীকে শাসাইয়া বলিতেছে:—"খবরদার! বাপ-দাদাদের কীর্ত্তি অতুলনীয়।

তাহাদের সমান কীর্ত্তি লভিবার অথবা তাহাদেরকে ছাড়াইয়া যাইবার প্রয়াস পাগ্‌লামি মাত্র।"

যে দেশের অতীত খুব বড় সে দেশের নর-নারীর পক্ষে একটা গৌরবজনক ভবিষ্যৎ গড়িয়া তোলা বিষম সমস্যা। ইতালিতে গতিবিধি সুরু করিবামাত্র বার বার এইরূপই মনে হইতেছে।

নতুন নতুন সৃষ্টি হইতেছে আজকাল কোথায়? যেখানে অতীত নাই অথবা যেখানকার অতীত অতিমাত্রায় চটকদার নয়। ইয়াঙ্কিস্থানে অতীতের চাপ পাই নাই,—সবই সেখানে "ভবিষ্য-নিষ্ঠা", নয়া সৃষ্টির, নবীন যৌবনের, নব-জীবনের আনন্দ। জার্ম্মাণিতেও এইরূপ লক্ষ্য করিয়াছি। জার্ম্মাণরা অতীতের গন্ধে মাতোয়ারা নয়। তাহাদের নবীনেরা প্রবীণকে ডুবাইয়া ফেলিতেছে। ইংলণ্ডের এবং ফ্রান্সের সমাজে ও কম বেশী এই ইয়াঙ্কি-জার্ম্মাণ যৌবন-নিষ্ঠা দেখিতে পাইয়াছি।

ইতালিতে যে বিপদ প্রথম দেখিলাম পাশ্চাত্য মুল্লুকে, সেই বিপদ বুড়ী এশিয়ার সর্ব্বত্রই অল্প বিস্তর বিরাজ করিতেছে। চীনে দেখিয়া আসিয়াছি ভারতবাসীর মাসী-বাড়ী, আর ভারত মাতার অতীত-দৌরাত্ম্য ত চোপর দিনরাতেই আমরা সহিতে অভ্যস্ত। জাপানীরা বাঁচিয়া গিয়াছে, তাহাদের একটা বড় গোছের অতীত নাই বলিয়া। বোধ হয় তুর্কী ও এই কারণেই বাঁচিয়া যাইবে।

অতীত যৌবন মাত্রের দুস্‌মন। অতীত উন্নতির কণ্টক,— দুনিয়ার শত্রু। ইতালির পথে ঘাটে, পাথরে, ছবিতে, নরনারীর

চলাফেরায়, বসতবাড়ীর আবহাওয়ায় এই একটা মস্ত শিক্ষালাভ করিতেছি। যাহারা অতীতের মোহে না পড়িয়া একমাত্র বর্ত্তমানের সমস্যায় মজিতে পারে জগতের সেই সকল যুবারা মানব জাতির রক্ষাকর্ত্তা। তাহাদের সৃষ্টি-প্রয়াসেই মানুষের জীবন-স্রোত বাড়িয়া চলিয়াছে।

রসায়ণ-শিল্পে আধুনিক ইতালি

কেরোসিন তেলের ওস্তাদকে জিজ্ঞাসা করা গেল :—"ইতালির রসায়ণ এবং রাসায়ণিক শিল্প দুনিয়ার বাজারে কিরূপ ঠাঁই পায়?" ইনি পাদোহ্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের "দত্তরে" বা ডক্টর।

শুনিতেছি,—"নামজাদা রাসায়ণিক ইতালির বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কয়েকজন আছেন। তাঁহাদের গবেষণা বিদেশে সম্মানিত হয়ও। কিন্তু উচ্চ অঙ্গের অনুসন্ধান এবং কেতাব ও বৈজ্ঞানিক পত্রের জন্য আমরা জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়ার দিকে তাকাইয়া থাকিতে অভ্যস্ত।"

"ফরাসী বিজ্ঞানসেবীদের সঙ্গে ইতালিয়ানদের লেনদেন কিরূপ?"

"অতি সামান্য। মাঝে মাঝে ফ্রান্সের কাজকর্ম্মও ইতালিতে আলোচিত হয় বটে। তবে ফরাসীদের সঙ্গে ইতালির বনিবনাও বড় একটা নাই। এই কারণে ফরাসী সভ্যতার দিকে ইতালিয়ান-দের ঝোঁক এক প্রকার নাই।"

ইংরেজী ভাষায় যে সব গবেষণা হয় অর্থাৎ বিলাতী ও মার্কিণ পণ্ডিতদের রিসার্চ্চ সমূহ ইতালিতে নেহাৎ অল্প পরিমাণে আলোচিত

হইয়া থাকে। ইংরেজীতে দখল বেশী লোকের নাই। ওস্তাদ বলিতেছেন :—"রাসায়নিক শিল্প বলিলে জার্ম্মাণরা যা বুঝে সেই হিসাবে কোনো শিল্প ইতালিতে একদম নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বাস্তবিক পক্ষে,—১৯১৪ সালে যখন মহা-লড়াই সুরু হয় তখন ইতালিয়ান সমাজে নবীন ফ্যাক্টরি একপ্রকার ছিলই না। লড়াইয়ের ফলে জার্ম্মাণির সঙ্গে ইতালির কারবার বন্ধ হইয়া যায়। তখন বাধ্য হইয়া আমরা নয়া নয়া কারখানা গড়িয়া তুলিতে বাধ্য হইয়াছি।"

দেখা যাইতেছে,—ভারতের মতন ইতালিও লড়াইয়ের ধাক্কায় "আধুনিকতা"র পথে অগ্রসর হইয়াছে। ইতালিতে স্বদেশী শিল্পের আন্দোলন অতি কচি শিশু। আরও শুনা গেল :—"১৯১৪ সালের পূর্ব্বে আমাদের যে দুচারটা কারখানা ছিল তাহার অধিকাংশেই জার্ম্মাণ ওস্তাদ ও পরিচালক বহাল হইত। বিগত দশ বৎসর ধরিয়া স্বদেশী আন্দোলন চলিতেছে। বিদেশী ওস্তাদ বয়কট করিবার প্রয়াস চলিয়াছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আবার আমরা জার্ম্মাণ কর্ম্মকর্ত্তা নিয়োগ করিবার দিকে ঝুঁকিয়াছি।

মুরাণোর কাচ

রেশম, কিংখাব, ফিতা ইত্যাদির দোকানগুলার আবহাওয়ায় ঘুরাফিরা করিতেছি, এমন সময়ে একজন আসিয়া বলিল :—"বাবু! কাচের বাজার দেখবে? মুরাণোর কাচ? বিনা পয়সায়!"

পেছন পেছন ছুটা গেল। কয়েকটা আঁকাবাঁকা গলি ভাঙিয়া আড়কাঠি মহাশয় এক পুরাণা বাড়ীর দোতলায় লইয়া গিয়া প্রস্থান করিল। সম্মুখের ঘরেই দেখিতেছি মেয়েরা কাচ গুলিয়া ছবি আঁকিতেছে। কাহারও কাহারও গায়ে শাল বা আলোয়ান।

এক মহিলা প্রদর্শকের কাজ করিলেন। এ-ঘর ও-ঘর করিতে করিতে ঘণ্টা খানেক কাটাইয়া দেওয়া হইল। মাইসেনের পোর্সলেন বা চীনামাটির বাসনে আটপৌরে হাঁড়ী-কুঁড়ী হইতে বাস্তু, স্থাপত্য ইত্যাদি পর্য্যন্ত সবই দেখিয়াছি। এখানেও মুরাণোর কাচশিল্পে পেয়ালা, থালা বাটি, বাতীদান হইতে সুরু করিয়া সকল প্রকার ঘর সাজাইবার সরঞ্জাম দেখিলাম।

প্রদর্শক বলিলেন :—"মুরাণোর কাচশিল্পই হ্বেনিসের চিত্র-শিল্পের জন্ম দিয়াছে। হ্বেনিস-রীতির প্রবর্ত্তক বেলিনির গুরুরা মুরাণোর "মোজাইক" বা মীনা-শিল্পীদের নিকট সাগ্‌রেত্তি করিয়াছিলেন। গির্জ্জা সাজাইবার জন্য মুরাণোর লোকেরা কন্‌-ষ্টান্‌টিনোপল হইতে মোজাইক শিল্প শিখিয়া আসে। সে প্রায় একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর কথা। তাহার পর মুরাণোয়ই মোজাইক শিল্পের কারবার চলিতে থাকে। মোজাইকের কাজে পাকিয়া উঠিতে উঠিতেই চিত্রশিল্পের দিকে রূপদক্ষদের খেয়াল যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুরাণোয় চিত্রশিল্পের একটা রীতি বা ধারা গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহারই জের বেলিনি-তিৎসিয়ান-ভিয়েপল।"

মার্কো-মন্দির বনাম তাজমহল

"মোজাইকে"র সতরঞ্জ বা গালিচা চরম মাত্রায় দেখিতে পাই মার্কো-মন্দিরের ছাদে ও দেওয়ালে। একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচনাগুলায় খৃষ্টজীবন এবং বাইবেলের কাহিনী প্রচারিত হইতেছে। গোঁফ-দাড়ীহীন যীশুমূর্ত্তি বড় একটা দেখা যায় না। এখানে তাহাও দেখিলাম। শুনিতেছি—ইহা বিজান্টিন বা প্রাচ্য প্রভাবের নমুনা। মুসলমান বা প্রাচ্য প্রভাবান্বিত কন্‌ষ্টান্‌টিনোপল অঞ্চলের খৃষ্টশিল্পীরা যীশুকে গোঁফ-দাড়িহীন রূপে আঁকিত।

নানাপ্রকার মূর্ত্তি আঁকিবার জন্যই মোজাইক কায়েম করা হইয়া থাকে। মার্কো-মন্দিরে ভিন্ন ভিন্ন যুগের অঙ্কন দেখিতেছি। তিৎসিয়ান, তিন্তরেত্ত ইত্যাদি চিত্রশিল্পীরা যে সকল রূপ গড়িতেছিলেন মোজাইকশিল্পের রূপদক্ষেরা সেইসব মূর্ত্তির কোনো কোনোটা এই মন্দিরে কায়েম করিয়াছেন।

মার্ব্বেল পাথরের ব্যবহার দেখিতেছি স্তম্ভে স্তম্ভে। ধাতুরঙ্গের কাজে চোখ ঝলসিয়া যায়। বাহিরে, মাথায় সোনার গুম্বজ। "গথিকে"র ছুঁচোল ত্রিকোণ শীর্ষও সম্মুখের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই রঙের ছটা, রূপের বৈচিত্র্য।

কিন্তু তথাপি মার্কো-"বাজিলিকা"টা দেখিয়া "নয়নে লাগে না ধাঁধা।" তাজমহলের অনুপাত ও সামঞ্জস্য যাহাদের চোখে একবার পড়িয়াছে তাহারা বড় শীঘ্র কোনো বাস্তু দেখিয়া মূর্চ্ছা যাইবে না। মিনারের সঙ্গে গুম্বজের খেলা, গুম্বজগুলার পরস্পরের

হইতে এই তীর্থে আসিয়াছেন। ভক্তির মাত্রায় ইনি ভারতের যে কোন নারীকে হটাইতে সমর্থ, এইরূপ বিশ্বাস করিতেছি। অন্ততঃ সমানে সমানে টক্কর চলিবে। এই ক্যাথলিক নারী ভদ্রলোকের ঘরেরই মেয়ে, অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিত এবং সঙ্গতিপন্ন লোকে ইহার স্বামী।

খৃষ্টিয়ানদের ভক্তিযোগ

১

শুনিলাম, সেইন্ট আন্তনিঅ যখন পূজায় বসিতেন, তখন তাঁহার ঘরের দুয়ার খিল দিয়া বন্ধ করা থাকিত। কিন্তু তাঁহার সহবাসী সাধু-সন্তরা ঘরের ভিতর এক অপূর্ব্ব আলোকরশ্মি দেখিতে পাইত। অথচ অন্ধকার ঘরে প্রার্থনা করিতে বসাই ছিল আন্তনিঅর দস্তুর।

সহবাসীরা ভিতরকার খবরটা জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল বলাই বাহুল্য। দুয়ারে এক ফুটার ভিতর দিয়া তাহারা আন্তনিঅর কোলে যীশুর মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিল। ভগবানের আবির্ভাবেই ঘর আলোকে ভরিয়া উঠিয়াছিল। আন্তনিঅ স্বয়ং অবশ্য তন্ময় অর্থাৎ ভূমানন্দে ভরপূর।

আন্তনিঅর আর এক বিশেষত্ব এই যে,—তাঁহার এই ভগবৎ-প্রাপ্তির কথা ঘুণাক্ষরেও তিনি কোনো বন্ধুকে বলিতেন না। একে "সাধনায় সিদ্ধিলাভ," তাহার উপর কীর্ত্তিলোভ সম্বন্ধে চরম সংযম। আন্তনিঅ সাধু মহলে "মহাত্মা" এবং ভক্ত সমাজে দেবতায় পরিণত হইয়াছেন।

সাধক-শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ যখন "মালসী" গাহিতে গাহিতে ঘরের ব্যাড়া বাঁধিতেন তখন স্বয়ং মা কালীই না অপর দিকে দাঁড়াইয়া ভক্তের কাজে সাহায্য করিতেন? সাধনা, ভক্তিযোগ, "এক্স্টাসি," ভাবোন্মাদ ইত্যাদির বিকাশ মানবচিত্তে এক পথেই চলে। কি খৃষ্টান, কি হিন্দু উভয় চিত্তের ভক্তিধারায় একই "সংস্কার," একই বিশ্বাস, একই "ধর্ম্ম-রূপ" দেখিতেছি।

২

মন্দিরের ভিতর দেখিলাম অনেক কানা খোঁড়া বোবা পুরুষ-নারী ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া "ধর্ণা" দিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যাহারা পূর্ব্বে আন্তনিঅর মানত করিয়া অথবা আন্তনিঅ-তীর্থে আসিবার পর দৃষ্টিশক্তি, বাক্‌শক্তি অথবা চলনশক্তি লাভ করিয়াছে, তাহারা যথোচিত উপায়ে নিজ নিজ ভক্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতে ভুলে নাই।

আন্তনিঅর নিকট মানত্ করিবার ফলে অনেক জননী নিজ নিজ পুত্র-কন্যার চোখ ফুটাইতে পারিয়াছেন। যে সকল শি[illegible] অন্ধ হইয়া জন্মিয়াছিল, তাহাদের অনেকে আজকাল অন্যা[illegible] লোকের মতই চোখ ব্যবহার করিতে সমর্থ। এই ধরণের গল্পে[illegible] ভিতর ঝুটা নাকি বেশী নাই।

এক রুগ্ন শিশুকে পুরোহিত বেদীর উপর শোয়াইয়া তাহ[illegible] স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। জনক-জননী জোড়করে হাঁ[illegible] পাতিয়া নম্রশির।

মন্দিরের এক ঠাঁইয়ে কতকগুলা লাঠি দেখিলাম। বা[illegible]

আদান-প্রদান, চতুষ্কোণের সঙ্গে গোলাকারের মেলমেশ,—এই সকল রূপ-সম্বন্ধ তাজে অপূর্ব্ব। তাহার দোসর ঢুঁড়িয়া পাওয়া বড় কঠিন। মার্কো-গির্জ্জায় তাহার কাছাকাছি কিছু পাইলাম না বলিতে বাধ্য।

দজে-প্রাসাদের ভিতর বাহির

পালাৎস ডুকালে বা দজে-প্রাসাদটার গড়ন অতি বিচিত্র। জাঁকালো সন্দেহ নাই, তবে কথঞ্চিৎ কিম্ভূতকিমাকার বটে।

উপরের দিককার আধখানা যেন জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। কতকগুলা "গথিক" জানালায় এই জমাট বাঁধার প্রভাব ভাঙা দেখিতে পাই। নীচের আধখানায় "গথিক" খিলানের দোতালা বাগান। এই দুই তলের ও উপরে নীচে দুই স্বতন্ত্র ধরণের খিলান ও স্তম্ভের সারি দেখিতেছি। বারান্দাগুলা অপূর্ব্ব রেশমী বুননের কাজের মতন দেখাইতেছে। টালিগুলা নানা রঙের। ভবনটা একবার দেখিলে আর ভুলিবার সম্ভাবনা নাই।

পঞ্চদশ শতাব্দী ভরিয়া বাস্তর শেষ নির্ম্মাণ কার্য্য চলিয়াছিল। অনেক ওস্তাদেরই হাতে বাড়ীটা খাড়া হইয়াছে। ভিতরের সিঁড়িগুলা দেখিবার জিনিষ। প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে নামজাদা চিত্র-শিল্পীদের ছবিতে দেওয়াল ও ছাদ লেপা।

"মাজ্যরে কনসিলিও" বা মহাসভার ঘরে তিন্তরেত্তের আঁকা ঐতিহাসিক ছবি দেখিতেছি। ভেনিসকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে মিলানের বিরুদ্ধে লড়িতে হইয়াছিল। সেই সকল যুদ্ধের ছবি ভেরণেজে এবং তিন্তরেত্তের হাতে আঁকা রহিয়াছে।

আদান-প্রদান, চতুষ্কোণের সঙ্গে গোলাকারের মেলমেশ,—এই সকল রূপ-সম্বন্ধ তাজে অপূর্ব্ব। তাহার দোসর ঢুঁড়িয়া পাওয়া বড় কঠিন। মার্কো-গির্জ্জায় তাহার কাছাকাছি কিছু পাইলাম না বলিতে বাধ্য।

দজে-প্রাসাদের ভিতর বাহির

পালাৎস দুকালে বা দজে-প্রাসাদটার গড়ন অতি বিচিত্র। জঁাকালো সন্দেহ নাই, তবে কথঞ্চিৎ কিম্ভুতকিমাকার বটে।

উপরের দিককার আধখানা যেন জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। কতকগুলা "গথিক" জানালায় এই জমাট বাঁধার প্রভাব ভাঙা দেখিতে পাই। নীচের আধখানায় "গথিক" খিলানের দোতালা বাগান। এই দুই তলের ও উপরে নীচে দুই স্বতন্ত্র ধরণের খিলান ও স্তম্ভের সারি দেখিতেছি। বারান্দাগুলা অপূর্ব্ব রেশমী বুননের কাজের মতন দেখাইতেছে। টালিগুলা নানা রঙের। ভবনটা একবার দেখিলে আর ভুলিবার সম্ভাবনা নাই।

পঞ্চদশ শতাব্দী ভরিয়া বাস্তুর শেষ নির্ম্মাণ কার্য্য চলিয়াছিল। অনেক ওস্তাদেরই হাতে বাড়ীটা খাড়া হইয়াছে। ভিতরের সিঁড়িগুলা দেখিবার জিনিব। প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে নামজাদা চিত্র-শিল্পীদের ছবিতে দেওয়াল ও ছাদ লেপা।

"মাজ্জ্যরে কনসিলিও" বা মহাসভার ঘরে তিন্তরেত্তের আঁকা ঐতিহাসিক ছবি দেখিতেছি। হ্বেনিসকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে মিলানের বিরুদ্ধে লড়িতে হইয়াছিল। সেই সকল যুদ্ধের ছবি হ্বেরণেজে এবং তিন্তরেত্তের হাতে আঁকা রহিয়াছে।

সেই যুগেই,—১৪৫৩ সালে তুর্কীরা গ্রীক সাম্রাজ্য ভাঙিয়া কন্‌ষ্টান্টিনোপল দখল করে। তখন হইতে হেবনিসকে আত্মরক্ষার জন্য তুর্কীর বিরুদ্ধে লড়িতে হয়। স্মীর্ণায় (১৪৭১), স্কুটারিতে (১৪৭৪), এবং গালিপলিতে (১৪৮৪) যে সকল যুদ্ধ ঘটে তাহাতে এশিয়ান ফৌজেরাই বিজয়লাভ করে। শেষ পর্য্যন্ত হেবনিস তুর্কীর সঙ্গে বন্ধুত্বের সমঝোতা কায়েম করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সকল জলযুদ্ধের ছবিও "মহাসভার" সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে।

তিৎসিয়ানের হাতের কাজ ও এই বিপুল সৌধের এখানে ওখানে দেখা যায়। তবে নামজাদাদের ভিতর তিন্তরেত্ত এবং হেবরণেজেই এখানে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে।

"কনসিলিও দেই দিয়েচি" অর্থাৎ "দশের সভা" যে ঘরে বসিত সেই ঘরে হেবনিসের বিভিন্ন প্রতাপ অঙ্কিত রহিয়াছে। হেবানসের বাণিজ্য সম্পদ, হেবনিসের রাষ্ট্রশক্তি, হেবনিসের সঙ্গে ধর্ম্মগুরু পোপের লেন দেন এই সকল চিত্রে দেখিতে পাই।

একটা প্রকোষ্ঠে সেকালের ভৌগোলিক মানচিত্র সংগৃহীত দেখিলাম। মার্কো পোলোর মূর্ত্তি দেখা গেল। ইনি কিন্তু চীন-ভারতের বৃত্তান্ত লেখক সওদাগর নন। এই মার্কো পোলো আফ্রিকার অভ্যন্তরের সঙ্গে হেবনিসের বাণিজ্য সম্বন্ধ কায়েম করেন। তুনিসের হাজি মহম্মদ ১৫৫৯ সালে একটা পৃথিবীর মানচিত্র রচনা করিয়াছিলেন। সেইটাও এই ঘরে দেখিলাম।

ইতালিতে বারকয়েক

হ্বেনিসের শেঠ রাজা

হ্বেনিসে কোনো রাজা বা বাদশা ছিল না। হ্বেনেৎসিয়ার শাসন ছিল বণিক বা "শেঠ"দের হাতে। এখানকার ধনদৌলত, বাড়ীঘর, সম্পদ সৌষ্ঠব, সবই শেঠজিদিগের কীর্ত্তি।

শেঠরা সকলে মিলিয়া নিজেদের ভিতর হইতে একটা শাসন-সমিতি কায়েম করিত। এই শাসন-সমিতির বা বণিক-পঞ্চায়তের "মুখ্য" "প্রধান" বা প্রেসিডেণ্টকে বলে "দজে"। ভারতীয় পারিভাষিকে বলিতে পারি যে, দজেরা ছিল শেঠ্-স্বরাজের বা বণিক-গণতন্ত্রের মোড়ল।

স্বাধীনতা স্বরাজ ইত্যাদি যা কিছু সবই শেঠ বাবুদের ভোগের জিনিষ। তাহাদের সমাজ হইতেই সেনেটার, সভ্য, মাতব্বর, প্রতিনিধি ইত্যাদি বাছাই হইত। তাহারাই "কন্‌সিলিও"য় গোটা রিপব্লিকের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিত। তাহারাই ছিল "গণ-রায়াণ"।

"জনসাধারণের,"—চাষী, মজুর, দাসদাসী এবং মধ্যবিত্ত "ভদ্রলোক" ইত্যাদি শ্রেণীর লোকেরা এই স্বরাজে কেনো ঠাঁই পাইত না। হ্বেনিসের রিপাব্লিক ডেমোক্রেসি ইত্যাদি শব্দ মুখে আনিবার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটা মনে রাখা আবশ্যক।

বণিক-রাজারা পরস্পর কামড়া কামড়ি করিত,—যেমন দুনিয়ার লোক করিয়া থাকে। টাকা পয়সা লইয়া, গৃহস্থ ঘরের স্ত্রী কন্যা লইয়া, "কন্‌সিলিও"য় নাম ও ক্ষমতা লইয়া, ঝগড়া ঝাঁটি চলিত দস্তুর মতন। বিদেশী শত্রুর সম্মুখে ও হিংসা কোঁদল এবং পরস্পর আড়াআড়ি চাপা পড়িত না। সেকালে "বিদেশ" বলিলে হ্বেনেৎ-

সিয়ার সীমানার বাহিরের সব মুল্লুকই বুঝাইত। অর্থাৎ গোটা ইতালিই হ্বেনিস দ্বীপ গুলার শেঠ মাতব্বরদের চিন্তায় ছিল রাষ্ট্রীয় লেনদেনে বিদেশী মুল্লুক।

১৪৫৩ সালে তুর্কী ইয়োরোপে পা গাড়ে। তাহার পর পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর এশিয়ান সাম্রাজ্য প্রায় হ্বেনিসেরই ঘাটে আসিয়া ঠেকে। অপরদিকে তুর্কদের মুল্লুক অষ্ট্রিয়ার হ্বিয়েনার দেওয়ালের কাছা কাছি গিয়া ঠেকিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হ্বেনিসের অবসান সুরু হয়।

কিন্তু তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চার পাঁচশ' বৎসর ধরিয়া হ্বেনিসের সওদাগরেরা ইয়োরোপে বিপুল খ্যাতিলাভ করে। ধনাগমও হইয়াছিল প্রচুর। সেই ধন-সম্পদের সাক্ষী স্বরূপেই পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর "কা পালাৎস" বা প্রাসাদগুলা খাড়া আছে। চিত্রশিল্পের "রেণেসাঁস" ও হ্বেনিসের অন্তিম যুগেই প্রকটিত হইয়াছিল। তখন হ্বেনিসের প্রতাপ বিশ্বব্যাপী নয় বটে। কিন্তু বাপ দাদাদের টাকার তোড়াগুলা তখনও শেঠজিদের ঘরে ঘরে মজুত ছিল।

ভোগের হ্বেনিস

পালাৎস "কা দর" বা স্বর্ণ-প্রাসাদ নামক বাড়ীটা "কানাল গ্রান্দের" অন্যতম গৌরব। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাশেষি,—তাজমহলের যুগে,—এইটা গড়া হইয়াছিল। রেণেসাঁসের গড়নে গথিক ও বিজান্টিন অলঙ্কার বিরাজ করিতেছে। হ্বেনিসের অন্যান্য ভবনের মতন এখানেও মেয়েলি সৌন্দর্য্য প্রচুর পরিস্ফুট।

গাম্ভীর্য্য বা গরিমার পরিবর্ত্তে সুষমার আবহাওয়া। প্রাসাদের ভিতর বিলাসের চরম সীমা দেখা যায়।

হ্বিয়েনায় এবং প্যারিসে "রেণেসাঁস" গড়নের যে সকল বাস্তু দেখিয়াছি সেগুলা ঊনবিংশ শতাব্দীর রচনা,—কাজেই আধুনিক। কিন্তু তাহাদের আবহাওয়ায় সৌন্দর্য্যের সঙ্গে দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্য্যের সমাবেশ উপভোগ করা সম্ভব। বিনা গথিকেও খানিকটা গথিকের বিপুলতা পাইয়াছি। কিন্তু হ্বেনিসের তেতলা প্রাসাদ গুলা সবই ভোগবিলাসের কামরা ছাড়া আর কোনো দৃশ্য মনে আঁকে না। সবই যেন গন্দলা-বিহার আর ছুটিভোগের আবহাওয়া। একমাত্র দজে-প্রাসাদটায় গাম্ভীর্য্যের গুণ আছে।

হ্বেনিসের সে যুগে,—বাস্তবিকপক্ষে লোকেরা ভোগ বিলাসের জন্যই এখানে আসিত। রোমের এক কবি স্বদেশ ছাড়িয়া,—ফ্লোরেন্সে না গিয়া,—ত্রিশ বৎসরকাল এই হ্বেনিসের নীল আকাশতলেই কাটাইয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র সাধ ছিল—"হ্বিহ্বেরে রিজলুতমেন্তে"। কবির নাম আরেতিন (১৫২৭)।

রেণেসাঁস যুগের এই কবি বলিতেন:—"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ,—অতএব চল হ্বেনিস-প্রবাসে।" আরেতিন হ্বেনিসে আসিয়া ইন্দ্রিয়ারামের চরম মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

হ্বেনিসের শেঠবাবুরা বুঝিতেন:—"রেখে দে তোর য়াকপনে দা তদির (১২৩০—১৩০৭) অধ্যাত্ম তত্ত্ব। খাও দাও মজা মার। সেইণ্ট ফ্রান্সিসের সতী-মাহাত্ম্য আর দারিদ্র্য-গৌরব?

সে ত ত্রয়োদশ শতাব্দীর মঠ-নির্যাতিত নরনারীর চিত্তবিকার মাত্র! আর সাধু আন্তনিয়র ভগবৎ-সিদ্ধি বুড়া বুড়ীদের কাজে লাগিলেও লাগিতে পারে। আমরা সংসারী লোক—সহজ বুদ্ধির মানুষ। আমরা বুঝি 'হ্বিহ্বরে রিজলুতমেন্তে,—'সব ধর্ম্ম মাঝে ভোগধর্ম্ম সার ভুবনে'।" এই গেল রেণেসাঁসের এক দিক!

হ্বেনিসের নির্য্যাতন-প্রথা

দজে-প্রাসাদের ভিতর বিচারালয় এবং হাজত ও আছে। দেখিবা মাত্র রক্তমাংসের মানুষ শিহরিয়া উঠিবে। চিত্রশিল্প আর প্রাসাদের মর্ম্মর-কান্তির মোহে পড়িয়া হ্বেনিস-চিত্তের অমানুষিক নির্দ্দয়তা গুলা ভুলিলে চলিবে না। অত্যাচার, নির্য্যাতন, পাশবিকতার পরাকাষ্ঠা,—এই সবই হ্বেনিস-স্বরাজের গোড়ার কথা।

ইংরেজি কাব্যে "ব্রিজ্ অব্ সাইজ্" বা দীর্ঘশ্বাসের সেতু সুবিদিত। হ্বেনিসের শেঠ-বাবুরাই এইটা কায়েম করিয়াছিলেন। নাম "পন্তে দেই সস্‌পিরি।" আসামীদিগকে প্রাসাদ হইতে জেলখানায় পাঠাইবার এই পথ। মামুলি অপরাধীরা এক পথে এবং রাষ্ট্রনৈতিক অপরাধীরা আর এক পথে চালান হইত। সেতুটা ডাইনে বাঁয়ে দুই ভাগে বিভক্ত।

হাজতের জন্য প্রাসাদেরই নীচের তলা বা আন্তর্ভৌম কুঠরি-গুলা ব্যবহৃত হইত। কোনো কোনো দেওয়ালে লেখা আছে:—"ভগবান, যাহাদিগকে আমি বিশ্বাস করি তাহাদের হাত থেকে আমায় বাঁচাও।" আর একটা দীর্ঘশ্বাস নিম্ন লিখিত বচনে

খোদা রহিয়াছে :—"যাহাদিগকে আমি কোনো দিনই বিশ্বাস করি নাই তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা আমার পক্ষে সহজ।"

৫

বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র, মিথ্যা সাক্ষ্য, 'গাছে তুলে' মই কেড়ে নেওয়া,—ইত্যাদির নীতিশাস্ত্রই সে যুগের স্বধর্ম্ম।

কতকগুলা কুঠরি সীসায় তৈয়ারি। সীসার দেওয়াল, মেজে ও ছাদ শীতে যেমন কনকনে-ঠাণ্ডা, গ্রীষ্মে তেমন আগুন-গরম। এই সকল ঘরে কয়েদিদিগকে বিচারের আগে ও পরে কালাতিপাত করিতে হইত।

প্রদর্শকের নিকট অশেষ প্রকার নির্য্যাতন, খুনাখুনি ও নিষ্ঠুর যন্ত্রণা প্রদানের কাহিনী শুনা গেল। মনে পড়িল জার্ম্মাণির ত্রিন্‌ব্যর্গ সহরের দুর্গস্থিত "ফোল্টার-কাম্মার" বা নির্য্যাতন-ভবনের সাজা দিবার যন্ত্রগুলা।

সাজা দিবার কৌশলে প্রাচ্য বেশী নিষ্ঠুর কি পাশ্চাত্য বেশী নিষ্ঠুর, তাহার আলোচনা হওয়া দরকার। পশ্চিমা পণ্ডিতদের এক-তরফা রায় শুনিয়া প্রাচ্যের লোকেরা নিজেদের বাপ দাদাকে অকথ্য গালি গালাজ করিতে শিখিয়াছে। পশ্চিমা পণ্ডিতদের ভুল ও কুসংস্কার গুলা দেখাইয়া দিবার জন্য এশিয়ার গবেষকগণ প্রস্তুত হউন। এশিয়াকে কথায় কথায় নিন্দা করা বৈজ্ঞানিকতার লক্ষণ নয়।

রেণেসাঁস কাহাকে বলে ?

১

"রেণেসাঁস" শব্দটা হামেশা ব্যবহার করিতেছি। "রেণেসাঁস" কি চিজ ? শব্দটার অর্থ "নব জীবন," "নবীন অভ্যুদয়," "পুনর্জ্জন্ম" বা "পুনর্গঠন"। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর (১৪৫০-১৬০০) দেড় দুই শ বৎসর এই "পুনর্জ্জন্মের" যুগ।

কিন্তু "পুনর্জ্জন্ম" টা কিসের বা কার ? প্রাচীন রোমের। সাম্রাজ্যের আমলে রোমাণ জাতি সুকুমার শিল্পে যাহা কিছু করিয়াছিল এ যুগের ইতালিয়ানরা ঠিক সেই সব পুনরায় কায়েম করিতে সচেষ্ট হয়।

সেই রোমাণ আমল আর এই রেণেসাঁসের মাঝামাঝি কালকে সংক্ষেপে "মধ্য যুগ" বলা হয়। এই যুগের সুকুমার শিল্পের নানা রীতির উত্থান পতন ঘটিয়াছে। তাহার ভিতর সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য "গথিক" (১২৫০-১৩৫০)। ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীকে গথিকের যুগ বলা চলে।

"রোমাণ আমলে,"—হ্বার্জিল যখন কবি, লিহ্বি যখন ঐতি-হাসিক আর প্লিনি যখন বিজ্ঞানসেবক,—অর্থাৎ খৃষ্টজন্মের সম সমকালে এবং খৃষ্টের জীবদ্দশায় ও,—বাস্তুশিল্পী ছিল হ্বিত্রুহ্বিয়ুস। সেই শিল্পীর নিয়ম কানুনগুলা রোমাণ সাম্রাজ্যের ইমারতে ইমারতে বাঁধা হইয়া যায়। হ্বিত্রুহ্বিয়ুসের বাস্তু-লক্ষণ গুলাই রেণেসাঁসের যুগে নব-জীবন লাভ করে।

রেণেসাঁসের অট্টালিকাগুলা দেখিলে বস্তুতঃ সেই প্রাচীন

রোমের গড়নই চোখের সম্মুখে ভাসিতে থাকে। ওস্তাদরা নিজ নিজ মাথা খেলাইয়া অঙ্গবিস্তর পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন সত্য। কিন্তু সাম্রাজ্যের আমলের ঘর বাড়ীতে আর পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর ঘরবাড়ীতে রক্তের সম্বন্ধ সহজেই ধরা পড়ে।

২

কিন্তু চিত্রশিল্পে এ কথা বলা চলে কি? চলে না। বাস্তবিক পক্ষে রোমাণ সাম্রাজ্যের আমলে চিত্রলক্ষণ কিরূপ ছিল তাহা এক প্রকার আজও স্পষ্ট রূপে জানা যায় না। পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর পণ্ডিতেরা চিত্রবিদ্যার হ্বিক্রুহ্বিয়ুসকে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। তাহা হইলে এই যুগের চিত্রাঙ্কনকে কিসের "রেণে-সাঁস" বা পুনর্জন্ম বলিব?

আসল কথা এখানে "রেণেসাঁস" শব্দ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। বাস্তু-শিল্পের বেলায় যে অর্থে রেণেসাঁস কায়েম হয় চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে সেই অর্থে এই শব্দ কায়েম করা সম্ভব নয়।

মধ্য যুগের অর্থাৎ চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর আগেকার চিত্রশিল্পীরা একমাত্র দেবদেবীর মূর্ত্তি আঁকিত। আর এই মূর্ত্তিগুলার অঙ্কনে তাহারা খাঁটি রক্তমাংসের মানুষ দেখাইত না। একটা অ-প্রাকৃত, অ-স্বাভাবিক, অ-মানুষ গড়ন সৃষ্টি করিয়া তাহারা আধ্যাত্মিক, অতি-প্রাকৃত, অতি-মানব রসের ফোয়ারা ছুটাইত। অন্ততঃ এইরূপই ছিল তাহাদের শিল্প-সাধনার ভিতরকার কথা।

এই ধরণের দেবদেবী-তত্ত্ব, ভক্তি-রস, আধ্যাত্মযোগ ফুটাইবার

কায়দা ও তাহারা আবিষ্কার করিয়াছিল। প্রথমতঃ—পারিপ্রেক্ষিক নামক দৃষ্টিশক্তি-বিষয়ক অনুষ্ঠান তাহাদের কাজে ঠাঁই পাইত না। কাজেই মূর্ত্তিগুলা দেখিবামাত্র ঠিক আসল নরনারীর বহর নজরে পড়িত না।

দ্বিতীয়তঃ,—আনাটমি বা অস্থিবিদ্যার মাপজোক এই সকল মূর্ত্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অপরিচিত থাকিত। বরং অনেকটা স্বাভাবিক অনুপাতগুলা ভাঙিয়া একটা মন-গড়া অঙ্গ-গঠন কায়েম করার দিকেই শিল্পীদের লক্ষ্য থাকিত।

তৃতীয়তঃ,—শিল্পীরা প্রায় সর্ব্বত্র এবং সকল কাজেই নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া ছবি আঁকিতে বসিত। অর্থাৎ সকলেই প্রায় এক ছাঁচে একই ধরণ ধারণ বজায় রাখিয়া যথাসম্ভব একটা সাধারণ্যে সুপরিচিত কাঠাম খাড়া করিবার দিকে যত্ন লইত। সুতরাং, যে-কোনো শিল্পীর কাজই অন্যান্য যে-কোনো শিল্পীর কাজরূপে পরিগণিত হইত। ছবিগুলা প্রায়ই বিশেষত্ববর্জ্জিত, স্বাতন্ত্র্যহীন আদর্শ "মা", আদর্শ "সন্তান" বা আদর্শ ঋষি ইত্যাদি।

প্রকৃতি-নিষ্ঠার পুনর্জ্জন্ম

"রেনেসাঁস" ওয়ালারা বলিল :—"না, এইরূপ আর বেশী দিন চালানো যাইতে পারে না। প্রকৃত নিয়ম কানুন মানিয়া চলাই ঠিক। সাপই আঁকি আর ব্যাঙই আঁকি,—মা মেরীই আঁকি, বা সাধু মোহন্তই আঁকি,—সবই যথা সম্ভব স্বাভাবিক মূর্ত্তি হওয়া চাই।"

এইরূপে প্রকৃতির জন্মই বা "পুনর্জ্জন্মই" চিত্রশিল্পের রেণেসাঁস। সেই প্রকৃতির বিধান পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর শিল্পাবতার দাভিঞ্চির গ্রন্থে সূত্রাকারে প্রচারিত আছে। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত ইয়োরোপে এবং আমেরিকায় প্রকৃতির "চিত্রলক্ষণ"ই প্রধান ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

রাফায়েল ও মিকালাঞ্জেল রোমে, দাভিঞ্চি মিলানোয়, এবং তিৎসিয়ান ভেরণেজে, তিন্তরেত্ত ইত্যাদি শিল্পীরা ভেনেৎসিয়ায় এই নব বিধানের রূপদক্ষ। তাঁহারা দেওয়ালে এবং কাম্বিসে পারিপ্রেক্ষিকের "গভীরতা" আনিলেন। ঘর বাড়ী লোকজন বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখানো তাঁহাদের ওস্তাদি। পুরুষ নারীর মাপ জোকে স্বাভাবিক অনুপাত রক্ষা না করিয়া তাঁহারা ছবি আঁকেন না। অধিকন্তু রাফায়েলের রূপগুলা হইতে তিৎসিয়ানর রূপগুলা, আর ভেরণেজের রূপগুলা হইতে মিকালাঞ্জেলোর রূপগুলা তফাৎ করা অতি সহজ। প্রত্যেক শিল্পীই নিজ নিজ রূপদক্ষতার পেটেণ্ট জারি করিয়া গিয়াছেন।

রেণেসাঁসের শিল্পীরাও দেবদেবী আঁকিতে ছাড়েন নাই। কিন্তু তাঁহাদের তুলীতে "মা মেরী" প্রায় রোমের বা ভেনিসের মামুলী নারী মাত্র। কাজেই ভক্তিরস, অধ্যাত্মযোগ,—জ্যান্তর সাধনা—সে সব চিজ এখানে বিরল।

রেণেসাঁস মানুষ গড়িয়াছে,—দেবদেবীর আবহাওয়ায় মানবীয় হাবভাব, মানুষের চিত্ত আনিয়া ফেলিয়াছে। ক্রমশঃ দেবদেবী আঁকাটাই উঠিয়া গিয়াছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্পীরা আঁকিয়াছে মানুষের জীবন, সমাজ, ব্যক্তি, প্রকৃতি ইত্যাদি।

হেবরণেজের "হেবনিস-সমাজ" বিষয়ক ছবিগুলা রেণেসাঁসের ভরা জোয়ারেই চিত্রশিল্পের ভবিষ্যবাদ গড়িতেছিল।

হেবনিসের বিবাহ

হেবনেৎসিয়া ছিল আদ্রিয়াতিকের "রাণী"। রাণী মাত্র নয়, "স্বামী"। হেবনিস রাষ্ট্রের সঙ্গে আদ্রিয়াতিকের বিবাহও হইত। "দজে" গণ-মুখ্য সাজিতেন বর। বজরায় করিয়া ঘটার সহিত লিদ দ্বীপের নিকট ভাটাইয়া যাওয়া হইত। পুরোহিত থাকিত, ঢাকঢোল কাঁশি ঘণ্টা বাজিত, সাগরের ভিতর একটা আংটিও ছুঁড়িয়া ফেলা হইত।

যে বজরায় এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ঘটিত তাহার নাম "বুচিন্তর"। পুরাণা বজরাটা বজায় নাই। তাহার এক নকল দেখা গেল আর্সেনালের সংগ্রহালয়ে। এখানে মধ্য যুগের পান্সী, বজরা, বাণিজ্যতরী ইত্যাদি নৌ-শিল্পের বহু নিদর্শন বজায় আছে। দেখিলেই মালদহের প্রসিদ্ধ বাঁহিচের নৌকা ও তাহার সাজসজ্জা মনে পড়ে।

চতুর্থ অধ্যায়

মিলানোয় নবীন ইতালি

বসন্তে দক্ষিণ সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড

১

নীল আকাশে গা ধুইয়া সবুজ পাহাড়গুলা লুগানো হ্রদের স্বচ্ছ জলে ডিগ্‌বাজি খাইতেছে। ষ্টীমার হইতে যেদিকে তাকাই সেই দিকেই চাঁছা-ছোলা তক্‌তকে সুইস পল্লীর মনোরম দৃশ্য দেখিতেছি। গাছ গাছড়ার প্রভাব খুবই কম। বসন্তের মাঝামাঝি, গ্রীষ্ম আসিতেছে। কিন্তু দক্ষিণ সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের আল্‌স তরুসম্পদে দরিদ্র।

সুইস সহযাত্রীরা সপরিবারে পল্লীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চাখিতে বাহির হইয়াছে। দুই চার মিনিট পরে পরেই এক একটা গাঁয়ে ষ্টীমার ধরিতেছে। লোকজনের উঠা-নামা মন্দ নয়। সুইস নর-নারীরা তাহাদের দেশের মাটীকে যার পর নাই ভালবাসে। প্রত্যেক পল্লীর প্রত্যেক পাথরের টুকরা ইহাদের নিকট অতি-প্রিয়। এই কারণেই বোধ হয় আবার সুইসরা বিদেশের ধার খুবই কম ধারে।

বিদেশ ভ্রমণে পয়সা খরচ করিতে যাওয়া সুইসদের চিন্তায় অনেকটা অমার্জ্জনীয় বিবেচিত হয়। সুইটসার্ল্যাণ্ডের হ্রদ পাহাড় "তাল" উপবন ইত্যাদি ছাড়িয়া বাহিরে সৌন্দর্য্য ঢুঁড়িতে গেলে সুইস নর-নারীর এক প্রকার যেন জাত্‌ই মারা যায়। ফলতঃ

অন্যান্য ইয়োরোপীয়দের তুলনায় সুইসরা বোধ হয় কথঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণচেতা। অবশ্য কড়ায়-ক্রান্তিতে হিসাব করিয়া মন্তব্যটা ঝাড়িতেছি না।

২

ইতালীয়-সুইস পল্লীগুলা জার্ম্মাণসুইস-পল্লী হইতে বাহ্য সৌষ্ঠব হিসাবে বিভিন্ন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় দুয়ে আকাশ-পাতাল তফাৎ। একথা অনেকবার শুনিয়াছি। কিন্তু ষ্টীমার হইতে মোর্কোতে পল্লীর গড়ন অপূর্ব্ব দেখাইতেছে। একটা পাহাড়ের কোণা জলের সীমানা হইতে চূড়া পর্য্যন্ত ঘরবাড়ীতে গাঁথা। মাথার উপরে গির্জ্জা ও কেওরাতলা। দেখিবার জন্য দলে দলে লোক নামিয়া গেল।

পাহাড়ের গায়ে সারি সারি আঙুরের ক্ষেত। চারাগুলি শীতে মরিয়া রহিয়াছিল। বসন্তের ডাকে সবুজ পাতা গজাইতে সুরু করিয়াছে। মাচাঙ্গুলা ক্রমে ভরিয়া আসিতেছে।

পোর্তো চেরেজিও পল্লীতে ষ্টীমার আসিয়া ঠেকিল। এইখানে সুইটসার্ল্যাণ্ড ও ইতালির সীমানা। রেলওয়ে ষ্টেশন ইতালির জমিনের উপর। আজকাল পাসপোর্টের হাঙ্গামা এক প্রকার নাই। তবে দেখানো চাই। ষ্টীমারের ভিতরেই কাষ্টম অফিসের বাবুরা "নমো নমো" করিয়া মাল পাশ করিয়া দিয়াছে।

৩

টিকেট কিনিতে গিয়া দেখি মোসাফিরদের যে আগে হাত বাড়াইতে পারে সেই আগে টিকেট পায়। অথবা অনেক পশ্চাতে

দাঁড়াইয়াও একমাত্র গলার জোরেই কোনো কোনো যাত্রী টিকেট আদায় করিয়া লইতেছে।

পশ্চিমা মুল্লুকে এই এক নতুন দৃশ্য। সুইটসার্ল্যাণ্ডে, জার্ম্মানিতে, আমেরিকায় লোকেরা লাইন বাঁধিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। শৃঙ্খলা ভাঙিয়া অপরের ঘাড়ে চড়িয়া হাত বাড়াইয়া টিকেট আদায় করিবার রেওয়াজ কোথায়ও দেখি নাই। ভারতবর্ষে অবশ্য এই দৃশ্য সুপরিচিত। ইতালিতে পদার্পণ করিবামাত্র সেই ভারতপ্রসিদ্ধ হুড়াহুড়ির চিত্রই কথঞ্চিৎ দেখিতে পাইলাম।

রেলপথের দুই ধারে পাহাড়ী অঞ্চল। পার্ব্বত্য পল্লীগুলা অদূরে ইতালিয় সুইটসার্ল্যাণ্ডের জেরই চালাইতেছে। একজন সহযাত্রী বলিতেছেন :—"পল্লীগুলা ইতালিয়ানদের স্বাস্থ্য-জনপদ। আর মাসখানেকের ভিতর গ্রীষ্মের শফর সুরু হইলে এই সকল অঞ্চল সহুরে বাবুদের জীবনকেন্দ্রে পরিণত হইবে।"

আল্‌প্‌সের পদতল

কোনো কোনো ষ্টেসনের নিকট দু-একটা ফ্যাক্টরি দেখিতেছি। কোথাও কোথাও নবীন নগরের নবীন বাড়ীঘর মাথা তুলিতেছে। মরা পুরাণা বাসি মাল লইয়াই ইতালিয়ানরা সন্তুষ্ট নয় বুঝা যাইতেছে। ঠাঁইয়ে ঠাঁইয়ে পল্লীপোষাকে সাজিয়া পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা চলাফেরা করিতেছে।

একটা বড় গোছের সহর পথে পড়িল। নাম হ্বারেজে। কিছু কিছু শিল্প-কারখানার প্রভাব পাইতেছি। ইতালিয়ান

ইতালিতে বারকয়েক

সমাজে হ্বারেজে হ্রদ আর হ্বারেজে নগর বেশ প্রসিদ্ধ। গ্রীষ্ম-কেন্দ্ররূপেই উত্তর ইতালির লোকেরা এই অঞ্চলের তারিফ করিয়া থাকে। রেল হইতে হ্রদটা এবং পাহাড়ী ঘরবাড়ীগুলা ছবির মতনই দেখাইল। এই অঞ্চলের আল্প্‌স পাহাড়েই গারিবাল্‌দির "শিকারীর দল" উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য হাত পোক্ত করিত।

বিদ্যুতের জোরে গাড়ী চলিতেছে। স্বইটসাল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রিয়ার অনেক রেল পথেই আজকাল বিদ্যুৎ কায়েম হইয়া থাকে। ধীরে ধীরে দুনিয়ার সর্ব্বত্রই বিদ্যুতের যুগ আসিতেছে। সম্প্রতি চলিতেছে কয়লার বিরুদ্ধে বিদ্যুতের বিদ্রোহ।

হ্বারেজের অল্প পর হইতে জমিন একদম সমতল। পঞ্চনদ অথবা গঙ্গাযমুনাধৌত উত্তর ভারত যেরূপ, আল্প্‌সের পদতলে উত্তর ইতালিও সেইরূপ। প্রায় দুই ঘণ্টার রেলযাত্রায় মিলানে পৌঁছিলাম। আশেপাশে ফ্যাক্টরির রাজত্ব।

মিলানের জাঁক

ষ্টেশনটা খুব বড় বটে কিন্তু, যারপর নাই নোংরা। ঘরগুলা বহুদিনের পুরাণা। এক মিনিটও প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না। দেওয়াল ও মেঝে অপরিষ্কার।

বাহিরে আসিয়া দেখি বিপুল শহরের আয়োজন। সম্মুখেই গোলাকার বিরাট তরুবীথি। লাল অটোমোবিলের সারি এক দিকে, আর ট্রামগাড়ীর আড্ডা অপর দিকে।

মুটে, কেরাণী, টিকেটবাবু কেহই ফরাসীও বলে না, জার্ম্মাণও

বলে না। মাল-ঘরে মোট জমা রাখিয়া রাস্তায় হাজির হওয়া গেল। "করিয়েরে দেল্লা সেরা" নামক দৈনিক এক কপি খরিদ করিলাম। এক অক্ষরও বুঝিলাম না বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। ফরাসী বা জার্ম্মাণ শব্দের গা-ঘেঁশা শব্দ ইতালিয়ানে যে কয়টা হামেশা কায়েম হইয়া থাকে তাহার জোরে কোনো রচনা বুঝা সম্ভব নয়। বুঝিলাম, ইতালিয়ান ভাষা নতুন করিয়া না শিখিলে চলিবে না (মে, ১৯২৪)।

তরুবীথির দুই ধারে বড় বড় হোটেল। বাজার দর যাচাই করিবার জন্য দু'একটায় ঢুঁ মারিয়া দেখিলাম। বলাই বাহুল্য অত টাকার জোর আমার ট্যাঁকে নাই। তবে সুইট্সার্ল্যাণ্ডের বড় বড় হোটেলের তুলনায় এখানকার হোটেলগুলা কিছু শস্তা।

২

অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শড়ক। রাস্তাগুলা পাথরে বাঁধানো। দুই ধারের বাড়ীগুলাকে প্রাসাদ বলাই উচিত। নানা মহল্লায় ঘুরাফিরা করিতে করিতে ভাবিতেছি, মিলান প্রাসাদপুরী সন্দেহ নাই। রেলওয়ে ষ্টেশনের ভিতরটা এই সহরের কলঙ্কবিশেষ।

বাস্তুরীতি আগাগোড়া "রেণেসাঁস"। স্তম্ভের শ্রেণী, খিলানের সারি আর জানালার শৃঙ্খলা দেখিলেই পুলকিত হইতে হয়। কিছু কিছু প্যারিসের দৃশ্য মনে পড়ে।

বসত বাড়ীগুলা সাধারণতঃ দোতলা বা তেতালা। প্যারিস বার্লিন ইত্যাদি শহরে পাঁচ ছয় তলার রেওয়াজ। নিউইয়র্কে বিশ পঁচিশ পঁয়ত্রিশ তলওয়ালা বাড়ী গুণ্তিতে বেশী নয়। পাঁচ

ছয় তলা বাড়ীই সেখানে সার্ব্বজনিক। মিলানে অনেকটা ভারতীয় মাপকাঠিই দেখিতেছি।

বস্তুতঃ মিলানের রেণেসাঁস গড়নও ভারতে নতুন কিছু নয়। আমাদের দেশে আজকাল যে-সব দালানবাড়ী দেখা যায় তাহার অধিকাংশই "রেণেসাঁসের" মাসতুত ভাই। বর্ত্তমান ভারত বর্ত্তমান ইয়োরোপেরই আধ্যাত্মিক জের বা উপনিবেশ মাত্র।

পেন্‌সিওনেতে ঘরকন্না

এক "পেন্‌সিওনে"তে ডেরা লইয়াছি। বাড়ীওয়ালী ইতালিয়ান। ফরাসীতে কথা বলার অভ্যাস আছে। বাড়ীতে অতিথি পনর ষোল জন। কেহ মার্কিণ, কেহ জার্ম্মাণ, কেহ ইংরেজ, আর কয়েকজন ইতালিয়ান।

"অলিহ্ব্" ফলের তেল দিয়া ইতালিতে রান্না করা হয়। ইয়োরামেরিকার অন্যান্য দেশে এতদিন হয় মাখন না হয় চর্ব্বির রান্না উদরসাৎ করিয়াছি। এইবার ভারত-পরিচিত তেলের রান্নায় মুখ বদলাইতে সুরু করা গেল। অলিহ্ব্ আমাদের জলপাই জাতীয় ফল।

ফ্রান্সে, জার্ম্মাণিতে, আমেরিকায়,—বস্তুতঃ পাশ্চাত্য মুল্লুকের সকল দেশেই অলিহ্ব্ তেলের আদর আছে। "সালাড্" নামক শব্জী পাতা এই তেলে মাখাইয়া কাঁচা খাওয়া হইয়া থাকে। সালাড, বাঁধা কপির পাতার মতন দেখায়।

"রিজত্ত" নামক ভাত ইতালিয়ানদের এক সার্ব্বজনিক

খাদ্য। ঘি-হীন মাংস-হীন পোলাও যে বস্তু, রিজত্ত তাই। তবে মুর্গীর রসে সিদ্ধ। খাইতে লাগে মন্দ নয়।

মার্কিণ সহভোজিনী বলিতেছেন :—"আর কিছুদিন আগে মিলানে আসা উচিত ছিল। তাহা হইলে স্কালা থিয়েটারে 'নেরণে' পালার অভিনয় দেখিতে পাইতেন। এই অপেরায় আট শ নরনারীকে ভূমিকা লইতে হয়। সঙ্গীত-মুল্লুকে একটা যুগান্তর ঘটিয়া গিয়াছে। থিয়েটারে বসিবার জন্য লোকেরা অসম্ভব রকমের আড়াআড়ি করিয়াছে। সবসে চড়া টিকেটের দাম অবশ্য ছিল মাত্র ১৫০৲। কিন্তু অনেকে এক হাজার টাকা খরচ করিয়াও সীট্ সংগ্রহ করিয়াছিল।"

নতুনের জয় জয়কার

শহরের কোথায়ও পুরাণা ঘরবাড়ী দেখিতেছি না। ভাঙ্গা-চূরার চিহ্ন অথবা পোড়ো বাড়ী বলিলে যাহা কিছু বুঝায় মিলানে তাহা মিলে না। সর্ব্বত্রই ঐশ্বর্য্য, ধনদৌলত আর নবীন তেজ। নতুন নতুন সড়ক তৈয়ারি হইতেছে। বড় বড় অট্টালিকাও অনেক অনেক মাথা তুলিতেছে!

"দুয়ম পিয়াৎসা"র মতন চৌরাস্তা জগতে বিরল। "পিয়াৎসা" ফরাসী প্লাস, জার্ম্মাণ প্লাট্স্ আর ইংরেজি প্লেস্ ইত্যাদির প্রতিশব্দ। দুয়ম শব্দে জার্ম্মাণ ডোম বা ইংরেজী ক্যাথিড্রাল অর্থাৎ "বিপুল" গির্জ্জা বুঝিতে হইবে। মিলানের এই দুয়ম ইয়োরোপের এক তাজমহল।

পিয়াৎসার মধ্যস্থলে অশ্বপৃষ্ঠে হ্বিক্তর এমানুয়েল। এই

রাজার আমলেই ফ্রান্সের সাহায্যে ইতালিয়ানরা স্বদেশের স্বাধীনতা ও ঐক্য লাভ করে। পিতলের মূর্ত্তি জঁাদরেল বটে।

চৌরাস্তার উপরকার সৌধসমূহ জঁাকজমকপূর্ণ। সবই দোকান ঘর। পাশে দুইটা রাজপ্রাসাদ। এই সকল অট্টালিকায় রেনেসাঁসের ছড়াছড়ি। কিন্তু গির্জ্জাটা স্বয়ং "গথিক" রীতির বাস্তু।

বাঁদিকের এক অট্টালিকায় বর্ত্তমান-জগৎসুলভ বিপুল বাজার। ইয়াঙ্কিস্থানে এই ধরণের বাজারকে "ডিপার্টমেণ্ট ষ্টোর" বলে। মানুষের যা-কিছু কাজে লাগে সবই এই দোকানে পাওয়া যায়। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি প্যারিসের "লাফায়েৎ গালারী", বার্লিনের "হ্বর্টহাইম" ইত্যাদির সঙ্গে মিলানের "রিণাসেন্ত্" দোকান, বাজার বা হাট কিছু কিছু টক্কর দিতে সমর্থ।

এ-বিভাগ ও-বিভাগ ঘুরিয়া দরদস্তুর করা গেল। কিনিবার কোনো দরকার নাই। কাজেই দোকানের সর্ব্বোচ্চ তলের এক অংশে চা খাওয়ার আড্ডায় আসিয়া বসা গেল। বসিয়া বসিয়া মার্ব্বেল পাথরের গির্জ্জাটার উপরের অংশ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি।

রিণাসেন্ত্ কোম্পানী কন্সার্টের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। চা খাইতে খাইতে বিনা পয়সায় নং ১ শ্রেণীর সঙ্গীত-গুরুদের তৈয়ারী ভাল ভাল গৎ শুনা গেল।

এই পাড়ার এক দর্শনযোগ্য চিজ হ্বিক্তর এমানুয়েল গালারি। ইংরেজিতে "আর্কেড" বলিলে যে ধরণের শড়ক বুঝা যায় এই "গালারি" সেই বস্তু। অত্যুচ্চ খিলানে ঢাকা রাস্তা ক্রসের আকারে গড়া হইয়াছে। অষ্টভুজ গম্বুজ কারুকার্য্যপূর্ণ। রাস্তার

উপর "কাফে"-সমূহের টেবিল চেয়ার আর অগণিত নরনারী। রাত্রিকালেই গালারিটা জঁাকিয়া উঠে।

গায়িকা শ্রীমতী কপ্পলা

১

শ্রীমতী তেরেসা আঞ্জেলনি কপ্পলা একজন নামজাদা গায়িকা। তাঁহার দুই ছাত্রীর সঙ্গে আলাপ হইল। তাঁহাদের নিমন্ত্রণে কপ্পলার বাড়ীতে যাওয়া গেল। মিলানের বহু গায়ক গায়িকা কপ্পলার শাগ্‌রেতি করিয়াছে। অনেক প্রসিদ্ধ ইতালিয়ান সঙ্গীত-ব্যবসায়ীর গুরুরূপে কপ্পলার ইজ্জত আছে।

কপ্পলার নিকট আজকাল প্রতিদিনই কয়েকজন দেশী বিদেশী লোক নিয়মিতরূপে গান বাজনা শিখিতে আসে। কপ্পলার বাড়ী বাস্তবিক পক্ষে একটা বে-সরকারী সঙ্গীত-বিদ্যালয়।

ছাত্রীরা গলা সাধার পরীক্ষা দিলেন। কপ্পলা পিয়ানো বাজাইয়া গেলেন। তাহার পর একজনের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে অপরজন গাহিতে লাগিল। কপ্পলা অতি ধীরে ধীরে হাত নাড়িয়া বা আঙ্গুল চালাইয়া গৎ ও সুর শুধরাইয়া দিতে থাকিলেন। সামান্যমাত্র অঙ্গভঙ্গীতেই বুঝা গেল,—সঙ্গীত কলা তাঁহার রক্তের সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে।

২

কপ্পলার স্বামীও ছিলেন গায়ক। দুয়ে এক সঙ্গে মিলানের "স্কালা" অপেরায় ইঁহারা ভূমিকা লইয়াছেন। "সোপ্রাণো" বা উচ্চতম নারী-কণ্ঠের আওয়াজে শ্রীমতী কপ্পলা হ্বেনিস নগরে জীবন সুরু করেন। পরে স্পেনের বার্সেলোনায়, পোল্যাণ্ডের হ্বার্সাওয়ে, এবং রুশিয়ার পেট্রোগ্র্যাডে বিদেশী সঙ্গীত-প্রেমিকেরা তাঁহার গান শুনিবার সুযোগ পাইয়াছে। তাহা ছাড়া ইতালির ছোট বড় মাঝারি সকল শহরেই তাঁহার ডাক পড়িয়াছে।

অপেরায় গান করিতে হইলে একসঙ্গে দুই শিল্পে দখল থাকা চাই। প্রথমতঃ কণ্ঠসঙ্গীত, দ্বিতীয়তঃ অভিনয়-কলা। কেননা, একটা নাটক আগাগোড়া গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করাই অপেরা রচনার কায়দা। অপেরায় নট-নটীদের প্রত্যেক কথোপকথনই গান। অপেরা ঠিক আমাদের "যাত্রা" নয়। অভিনয়শিল্পে ওস্তাদ না হইলে কোনো গায়ক বা গায়িকাকে অপেরার ভূমিকা দেওয়া হয় না।

কপ্পলা ইতালির সর্ব্বপ্রসিদ্ধ অপেরাগুলায়ও প্রধানা নারীর ভূমিকা পাইতেন। হ্ব্যার্দি নামক সঙ্গীতগুরু বর্ত্তমান ইতালির অপেরা-শিল্পে অদ্বিতীয়। তাঁহাকে ইয়োরোপীয় সমজদারেরা, জার্ম্মাণ হ্বাগ্নারের জুড়িদারই বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। হ্ব্যার্দি-প্রণীত "আঈডা" আজকালকার এক জগদ্বিখ্যাত অপেরা বা গীত-নাটক। এই অপেরায় আঈডা সাজিবার সৌভাগ্যও কপ্পলার জুটিয়াছিল।

কোনো থিয়েটারে অভিনয় করিবার দিকে কপলার এখন আর প্রবৃত্তি নাই। বোধ হয় বয়সও পার হইয়া গিয়াছে।

ইতালির ব্যাঙ্ক ও বিনিময়-কেন্দ্র

১

মিলানের ব্যাঙ্ক-ভবনগুলা সৌষ্ঠবপূর্ণ গড়নের প্রতিমূর্ত্তি। পিয়াৎসা কর্ডুজিও'র উপর "ক্রেদিত ইতালিয়ান" নামক ব্যাঙ্কের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি বন্দোবস্ত বিরাট শ্রেণীর অন্তর্গত। হ্বিয়েনার "হ্বীনার ব্যাঙ্ক-ফারাইণ" অথবা বার্লিনের "ড্যয়চে বাঙ্ক" ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের বিপুলতা অবশ্য এখানে নাই। কিন্তু শৃঙ্খলা, নিয়ম-বদ্ধতা ইত্যাদির হিসাবে "ক্রেদিত"র আফিসে কোনো ত্রুটি পাওয়া যাইবে না। জুরিখের "শ্বোআইট্‌সার বাঙ্ক-ফারাইণ" ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান এই "ক্রেদিত"র চেয়ে বড় নয়।

"বাঙ্কা কমার্চিয়ালে"র বাড়ীটা বাহির হইতে দুএক মিনিট দাঁড়াইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। প্রসিদ্ধ বাস্তুশিল্পী বেলত্রামি এইটা গড়িবার কাজে মোতায়েন ছিলেন। বেলত্রামির গড়া বীমা-ভবনটা কর্ডুজিও চৌরাস্তার এক গৌরব।

ইতালির সরকারী বা কেন্দ্র-ব্যাঙ্কের নাম "বাঙ্কা দিতালিয়া"। তাহার শাখাও মিলানে আছে। বড় বড় রাস্তার ধারে প্রায় সর্ব্বত্রই বাঙ্কের বাড়ী দেখিতেছি। বলা বাহুল্য এইগুলার অনেকেরই প্রধান আফিস রোমে অবস্থিত।

২

মিলান লম্বার্দি প্রদেশের রাষ্ট্রকেন্দ্র,—কাজেই ইতালিয় মফঃস্বলের এক শহর মাত্র। কিন্তু এই মফঃস্বলেই এতগুলা ব্যাঙ্কের শাখা দেখিয়া উত্তর ইতালিতে টাকা চলাচলের পরিমাণ আন্দাজ করা যায়। বাস্তবিক পক্ষে মিলান মফঃস্বল হইলেও ইতালির ধন-কেন্দ্র।

কর্ডুজিঅ পিয়াৎসায় "বর্সা" (বুর্স্, বার্স, ব্যের্জে) ভবন অবস্থিত। আমদানি রপ্তানির দরদস্তুর আর দেশী বিদেশী টাকার দাম এই বর্সায় স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। লণ্ডন, নিউইয়র্ক, প্যারিস, বার্লিন এবং ভিয়েনা ইত্যাদি নগরে ইতালির বাজার দর যাচাই করিবার জন্য লোকেরা রোমের বর্সার সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালায় না। চালায় মিলানের বর্সার সঙ্গে। মিলানের দরই ইতালির দররূপে দুনিয়ায় পরিচিত। বিদেশের দৈনিক সংবাদপত্রে মিলানের বার্স বা ষ্টক এক্সচেঞ্জের উঠানামাই উল্লিখিত হইয়া থাকে।

মিলানকে ধনদৌলতের তরফ হইতে কোনো কোনো হিসাবে বিলাতী ম্যাঞ্চেষ্টার বা জার্ম্মাণ হাম্বুর্গের সঙ্গে তুলনা করা চলে। ভারতের কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ বাদ দিলে বোধ হয় গুজরাতের আহমদাবাদ ছাড়া আর কোনো শহর মিলানের সমকক্ষ নয়।

ফাশিষ্ট বনাম সোশ্যালিষ্ট

পোষ্ট আফিসে, রেলষ্টেশনে, ও অন্যান্য বাড়ীতে দেওয়ালে দেওয়ালে "ফাশিষ্ট"দের ইস্তাহার দেখিতেছি। এপ্রিল মাসে

(১৯২৪) পার্ল্যামেণ্টের সভ্য বাছাই উপলক্ষ্যে জনগণের নিকট ফাশিষ্টরা এই সকল মোসাবিদা পাঠাইয়াছিল।

মোসাবিদাটা দুইচারদশটা ফরাসী-ঘেঁশা শব্দের সাহায্যে কথঞ্চিৎ বুঝিয়া লইতেছি। ফাশিষ্টরা বলিতেছেন:—"১৯১৯-২০ সালে, মহালড়াই থামিবার পর ইতালিতে চূড়ান্ত অনিয়ম, শৃঙ্খলাহীনতা, অপব্যয় চলিতেছিল। দেশের ভিতর বিরাজ করিতেছিল অশান্তি ও উপদ্রব। আর পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ইতালির কোনো ইজ্জদ ছিল না। সেই সব দুর্গতি হইতে ইতালিকে রক্ষা করিয়াছে ফাশিষ্টদল এবং ফাশিষ্ট গবর্ণমেণ্ট। অতএব হে পুরবাসী, তোমরা সকলে ফাশিষ্টদের সপক্ষে ভোট দিও। সোশ্যালিষ্টরা পার্ল্যামেণ্টে কর্ত্তা হইলে দেশে রুশিয়ার দুরবস্থা আসিয়া জুটিবে।"

মিলানের জনগণ কিন্তু "ফাশি" (সমিতি)-পন্থী অর্থাৎ "সমিতিওয়ালা" ন্যাশন্যালিষ্টদের কথায় মজে নাই। এই সহরে মজুর দলের প্রভাব খুব বেশী। সোশ্যালিষ্ট, কমিউনিষ্ট বা ঐ ধরণের অন্যান্য নেতারা ন্যাশন্যালিষ্টদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। এখানকার রাস্তায় বিক্রি হয় বেশী "আহ্বান্তি" কাগজ। ইহা দৈনিক মজুরপন্থীদের মুখপত্র।

অধিকন্তু এখানকার "করিয়েরে দেল্লা সেরা" ফাশিষ্টদের যথেচ্ছাচার সমূলে উৎপাটন করিতে ব্রতবদ্ধ। ইতালির বাহিরে যে সকল ইতালিয়ান কাগজ প্রসিদ্ধ তাহার ভিতর "করিয়েরে" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই কাগজ ডেমোক্রাটিক্ লিবারল বা উদারপন্থী দলের পৃষ্ঠপোষক। বার্লিনের "টাগেব্লাট," ফ্রাঙ্কফুর্টের "ৎসাইটুঙ," ম্যাঞ্চেষ্টারের "গার্ডিয়েন" ইত্যাদি দৈনিক "করিয়েরে"র সমশ্রেণীভুক্ত।

ইতালিতে বারকয়েক

শিল্প-বাণিজ্যের আবহাওয়ায়

১

এক পরিবারে নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। বাড়ীর কর্ত্তা এক ব্যবসায়-সঙ্ঘের ডিরেক্টর। সঙ্ঘের অধীনে ইতালির নানা স্থানে আট দশটা ধাতুর কারখানা চলিতেছে। সকলগুলায় মজুর খাটে পাঁচ হাজার।

ইতালির বিভিন্ন প্রদেশে সর্ব্বসমেত ২৩টা পাটের কল আছে। বলা বাহুল্য পাট আসে বাংলা দেশ হইতে। ডিরেক্টর মহাশয় বলিতেছেন, "শুনিয়াছি এই পাট আমরা ভারতীয় সওদাগর-দের মারফৎ পাই না। পাই বিলাতী বেপারীদের মারফৎ।"

ভারতের সঙ্গে ইতালির আমদানি-রপ্তানি সোজাসুজি চলিতে পারে কি? ডিরেক্টর বলিতেছেন:—"ইতালির কল-ওয়ালারা ভারতীয় বেপারীদের কার্য্যক্ষমতা সম্বন্ধে সুমত পোষণ করে না। দু'এক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ হইতে সোজাসুজি ইতা-লিতে পাট আমদানি করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু ভারতী-য়েরা নমুনা মাফিক মাল জোগাইয়া উঠিতে পারে নাই।"

২

আমেরিকায়, ফ্রান্সে, জার্ম্মাণিতে সর্ব্বত্রই ভারতীয় বেপারীদের বিরুদ্ধে ঠিক্ এই নালিশই শুনা যায়। এই নালিশের ভিতর আগাগোড়া ইয়োরামেরিকানদের ভারতীয়-বিদ্বেষ দেখিতে চেষ্টা করিলে ভুল বোঝা হইবে। সাদা চামড়াওয়ালা লোকেরা এশিয়ান-

দের সঙ্গে সমানে সমানে ব্যবসাক্ষেত্রেও লেনদেন চালাইতে ইতস্ততঃ করে, এ কথা সত্য। কিন্তু অপর দিকে একথাও সত্য যে, আমরা অনেক সময়েই কথা ঠিক্ রাখিতে পারি না। আমাদের সঙ্গে কারবার করিতে আসিয়া অনেককেই নাকাল হইতে হয়। একথাটার ভাবার্থ আমাদের ব্যবসায়ী মহলে তলাইয়া মজাইয়া বুঝিয়া রাখা ভাল।

কি পাট, কি তুলা, কি চামড়া, কি তেলের বিচি, কি ধাতু,—সকল প্রকার কুদরতি মালের ভারতীয় বেপারীরা নিজ নিজ "কোটে" সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে অগ্রসর হউন। তাহা হইলে ইয়োরামেরিকার বাজারে ভারতীয় কৃষিজীবী ও ব্যবসায়ীদের প্রভাব আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে। তখন ইতালিয়ানরা ইংরেজের দোহাই না দিয়া ভারতীয় দালালদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংযুক্ত হইতে বাধ্য হইবে। ভরেতের বহির্ব্বাণিজ্যে ভারত-সন্তানের হিস্যা বাড়াইতে হইলে এই পথে চলিতেই হইবে।

৩

মিলানে প্যাটের কল নাই। কিন্তু লম্বার্দি প্রদেশে এবং হ্বেনেৎসিয়া প্রদেশে,—অর্থাৎ উত্তর ইতালির মধ্য ও পূর্ব্ব জেলা গুলায় সাতটা কলে পাটের কাজ চলে। কলগুলাকে বলে "জুতিফিচ্য"। এই গুলায় মোটের উপর প্রায় ১২০০ তাঁত খাটে।

কলওয়ালারা মিলানের ব্যাঙ্কের সঙ্গে কারবার চালাইতে অভ্যস্ত। জার্ম্মাণির মতন ইতালির ব্যাঙ্কগুলায়ও বেপারীরা আমদানি রপ্তানির কাজে অনেক সাহায্য পায়। ভারতে আমদানি

ইতালিতে বারকয়েক

রপ্তানির জন্য ভারতসন্তানের তাঁবে কোনো ব্যাঙ্ক নাই। এই কারণেও বহির্বাণিজ্যে ভারতবাসীকে বিদেশীরা বিশ্বাস করে না।

সহরের আশেপাশে ফ্যাক্টরির সংখ্যা অনেক। কিন্তু ধোঁআর আধিপত্য দেখিতেছি না। রাস্তাঘাটে এক টুকরা কাগজ বা কোনো প্রকার ময়লা চোখে পড়ে না। কিন্তু ধূলার দৌরাত্ম্য খুব বেশী। ঠিক্ যেন বিহারের কোনো সহরে ধূলা খাইতেছি।

শড়কের মূর্ত্তি-গৌরব

শড়ককে ইতালিয়ানে বলে "হ্বিয়া"। মহাকবি দান্তের নামে যে রাস্তাটা পরিচিত তাহা লণ্ডন প্যারিসের কোনো কোনো চরম ঐশ্বর্য্যপূর্ণ শড়কের কথাই মনে করাইয়া দেয়।

ভারতে কালিদাসের নামে, বরাহমিহিরের নামে অথবা বিদ্যা-পতির নামে কোনো সড়ক বা গলি আছে কি? অথবা পাণিণি চৌরাস্তা, আর্য্যভট্ট ময়দান, চরক কুঞ্জ ইত্যাদি ধরণের কোনো কিছু দেখা যায় কি?

মিলানের কোথাও দেখিতেছি পিয়াৎসা হ্বির্জিলিঅ। কখনো বা হাঁটিতেছি হ্বিয়া বকাচিঅয়। রাষ্ট্রবীর মাক্যাহ্বেল্লি, মাৎ-সিনি ও গারিবাল্দি, চিত্রশিল্পী রাফায়েল, কবিবর মানৎসনি, সঙ্গীতগুরু পালেস্ত্রিণা ইত্যাদির নামেও হয় "হ্বিয়া" না হয় "পিয়াৎসা" মিলানবাসীর নিকট গোটা ইতালির অতীত কীর্ত্তি সর্ব্বদা জাগরূক রাখিয়াছে।

শড়কে শড়কে যতগুলা প্রস্তর বা পিত্তল মূর্ত্তি দেখিতেছি প্যারিস ছাড়া আর কোনো সহরে এতগুলা এক সঙ্গে দেখি

নাই। বার্লিন, নিউইয়র্ক ইত্যাদি সহর মিলানের কাছে দাঁড়াইতে পারে না।

"স্কালা" থিয়েটারের সম্মুখে লেঅনার্দো দাহ্বিঞ্চি শিষ্যসহকারে দণ্ডায়মান। মর্ম্মরমূর্ত্তি। চিত্রকর, স্থপতি এবং বাস্তুশিল্পী এই তিন শ্রেণীর লোকই দাহ্বিঞ্চিকে বর্ত্তমান জগতের প্রবর্ত্তকরূপে পূজা করিয়া থাকে। দাহ্বিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর লোক।

কাহ্বুর, এমান্যুয়েল ও তৃতীয় নেপোলিয়ন

"হ্বিয়া দান্তে" দিয়া "কাস্তেল্ল"বা দুর্গের দিকে অগ্রসর হইলে এক পিয়াৎসায় দেখা যায় অশ্বপৃষ্ঠে গারিবাল্দি। সেনাপতি গারিবাল্দির সাঙ্গোপাঙ্গ যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মূর্ত্তিও শহরের এখানে ওখানে দেখিতেছি।

সার্ব্বজনিক বাগিচার সম্মুখে প্রবেশপথে রাষ্ট্রবীর কাহ্বুর খাড়া আছেন। ইতালির আর এক বীর রাজা হ্বিক্তর এমান্যুয়েল "দুয়ম পিয়াৎসা"র ঐশ্বর্য্য বাড়াইতেছে। এমান্যুয়েল ছিলেন পিয়েমন্তে প্রদেশের নবাব বা জমিদার।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লম্বার্দ্দি এবং হ্বেনেৎসিয়া দুই প্রদেশই ছিল অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের জেলা। রাষ্ট্রবীর কাহ্বুর এবং সেনাপতি গারিবাল্দি এই দুই কর্ম্মবীরের প্ররোচনায় পিয়েমন্তের জমিদার ঐক্যবদ্ধ ইতালি গড়িয়া তুলিতে উৎসাহী হন। কাহ্বুর ফরাসী নরপতি তৃতীয় নেপোলিয়নকে ভজাইয়া এমান্যুয়েলের স্বপক্ষে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়াছিলেন। সে ১৮৫৯-৬০ সালের ঘটনা।

ইতালিতে বারকয়েক

তখনকার দিনে ভাবুকবীর মাৎসিনি ছিলেন যুবক ইতালির যীশুখৃষ্ট।

মাৎসিনির কোনো মূর্ত্তি দেখিতেছি না। কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়নের নাম ইতালির স্বাধীনতার ইতিহাসে অমর। স্থপতি বার্ৎসাগি প্রণীত মূর্ত্তি এক সরকারী সৌধের অঙিনায় বিরাজ করিতেছে।

নানা পাড়ায় পায়চারি

"কাস্তেল্ল"টা পঞ্চদশ শতাব্দীর এক বিপুল সৌধ। সে যুগের নবাব বা জমিদার স্ফর্ৎসা মিলানের এবং লম্বার্দি প্রদেশের এক বিক্রমাদিত্য।

দুর্গটা বাহির হইতে জাঁকালো দেখায়। অধিকন্তু ঘোড়ার জুতার আকারে তরুবীথি ও সৌধশ্রেণী কাস্তেল্লর সম্মুখ ভাগকে গৌরবে ভরিয়া রাখিয়াছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর অট্টালিকা আজকাল নাই। বৎসর ত্রিশেক হইল কাস্তেল্ল মধ্যযুগের রীতিতেই পুনরায় নতুন করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে। বাস্তুশিল্পী বেলত্রামির হাতে ছিল পুনর্গঠনের ভার।

নানা পাড়ায় পায়চারি করা যাইতেছে। সর্ব্বত্রই দেখিতেছি রাস্তায় নরনারী অতি ফিটফাট্ পোষাক পরিয়া চলা ফেরা করিতেছে। আর্থিক জীবনে কোনো ইতালিয়ানের অভাব আছে মিলানে এরূপ বোধ হইবে না।

শহরটা আগাগোড়া নতুন বোধ হইতেছে। সবই ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের সৃষ্টি। অতীতের চাপ মিলানে বিরল। নবীন ইতালির

জীবন-কেন্দ্র মিলানের "ইটকাঠে" যেরূপ পাইতেছি ইতালির অন্ত কোনো শহরে সেরূপ পাইব কিনা সন্দেহ।

কেওরাতলা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এক বিশাল প্রান্তর হাজার হাজার সুরম্য স্মৃতিস্তম্ভে বা সমাধিমন্দিরে পরিপূর্ণ। বাস্তু ও স্থাপত্যের বাগান হিসাবে মিলানের "চিমিতের" জগতে অদ্বিতীয়। ভারতবাসী,—বিশেষতঃ হিন্দুরা,—গোরস্থানের মর্য্যাদা বুঝে না। কিন্তু যে সকল নরনারী কবরভূমির সঙ্গে আত্মিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি মাখাইয়া রাখিতে অভ্যস্ত তাহারা এই অপূর্ব্ব কেওরাতলার আবহাওয়ায় প্রাণ ঠাণ্ডা করিতে সমর্থ হইবে। সুকুমার শিল্পে ইতালিয়ানরা কত বড় জাত তাহা এই "চিমিতের"র মূর্ত্তি, সৌধ, স্তম্ভ, মন্দির ও থিলান রচনা দেখিলেই মালুম হইবে।

ভৌগোলিক পরিভাষা

১

মিলান্‌কে ইতালিয়ানরা জানে "মিলান" বলিয়া। ফরাসী নাম "মিলাঁ", জার্ম্মাণদের ভাষায় এই নগর "মাইলাণ্ড্"। ভারতবাসী ইংরেজের দেওয়া নাম ও উচ্চারণ মুখস্থ করিয়া আসিতেছে।

ইতালি দেশটারই বা খাঁটী স্বদেশী নাম কি? "ইতালিয়া।" ফরাসী নাম "ইতালী", জার্ম্মাণ নাম "ইটালিয়েন", ইংরেজি নাম অবশ্য "ইটালি"।

ফ্লোরেন্স্ ইতালির এক বিখ্যাত শহর। কিন্তু ইহার আসল ইতালিয়ান নাম আমরা কখনো শুনি নাই। "ফ্লোরেন্স" বলিলে

কোনো ইতালিয়ান বুঝে না। তাহাদের দেওয়া নাম "ফিরেন্‌ৎসে"। জার্ম্মাণ নাম "ফ্লোরেন্‌ৎস্", ফরাসী নাম "ফ্লোরাঁস্"।

সেইরূপ জেনোআর ইতালিয়ান নাম "জেনহবা"। জার্ম্মাণরা এই শহরকে জানে "গেন্নুয়া" বলিয়া। ফরাসী নাম "জেন্"।

২

সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে,—দেশের লোকেরা নিজ নিজ পল্লী শহরকে যে নামে ডাকে বিদেশীরা ঠিক সেই নামে জানে না। বিভিন্ন ভাষায় একই জনপদ ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হয়।

ভারতসন্তান ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইতালি, রুশিয়া ইত্যাদি দেশের পল্লী শহরগুলাকে কোন্ নামে জানিবে? ভারতীয় জ্ঞান-মণ্ডলে এই প্রশ্নটা আজ পর্য্যন্ত কোনো দিন উঠিয়াছে কিনা সন্দেহ। ইংরেজ ভূগোল-লেখকেরা যে নামগুলা প্রচার করিয়াছেন আমরা তাহার হুবহু নকল চালাইতেছি। ভারতীয় ভাষার "ধাতের" সঙ্গে মিলাইয়া বিদেশী নাম ও উচ্চারণকে স্বদেশী আকার দিবার চেষ্টা কেহ কখনো করিয়াছেন কি?

যাহা হউক, আজকালকার স্বরাজ আন্দোলনের যুগে ভৌগোলিক নাম সম্বন্ধে ইংরেজের গোলামি করা যুবক ভারতের পক্ষে আর সহনীয় নয়। এইদিকে সংস্কার সরু হওয়া আবশ্যক।

আমি যখন যেখানে গিয়াছি তখন সেখানকার খাঁটি স্বদেশী নাম ও উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছি। কিন্তু এই সকল স্বদেশী

নাম এবং উচ্চারণ ভারতীয় ভাষার সঙ্গে খাপ খাইবে কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখি নাই।

৩

এক্ষণে ভারতের নানা কেন্দ্রে "ভৌগোলিক পরিভাষা সমিতি" কায়েম করা আবশ্যক। ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান, রুশ, স্পেনিষ ইত্যাদি ভাষায় অভিজ্ঞ লোকেরা এই সমিতির উদ্‌যোক্তা হইবেন। যাঁহারা ইয়োরামেরিকার নানা দেশে পর্য্যটন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সহকারিতা আবশ্যক হইবে সন্দেহ নাই। অবশ্য এশিয়া, আফ্রিকা ইত্যাদি মহাদেশের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে এবং চীনা, জাপানী, ফার্সী, আরবী ইত্যাদি ভাষায় যাঁহাদের দখল আছে তাঁহাদের সাহায্যও চাই।

এই সকল শ্রেণীর লোকের সাহায্য লইয়া "ভাষাতত্ত্বজ্ঞ" পণ্ডিতেরা কাজে ব্রতী হইলে বিশ পঁচিশ বৎসরের ভিতর ভারতীয় ভূগোল-সাহিত্যের রূপ বদলাইয়া যাইবে বিশ্বাস করি। ইস্কুল কলেজে যাঁহারা ভূগোল শিখাইয়া থাকেন এবং ইস্কুল-পাঠ্য ভূগোল কেতাব রচনা করা যাঁহাদের ব্যবসা তাঁহারাও এই "ভৌগোলিক পরিভাষা সমিতির" কাজে উঠিয়া পড়িয়া না লাগিলে ভূগোল সাহিত্যে সংস্কার সহজ-সাধ্য হইবে না।

কবি কার্দুচি ও দান্নুন্‌ৎসিও

"পেন্‌সিয়োনে"র সহভোজীদের মধ্যে একজন উচ্চশিক্ষিত ইতালিয় যুবার সঙ্গে সাহিত্যালাপ হইল। যুবা বলিতেছেন:—

ইতালিতে বারকয়েক

"দান্নুন্‌ৎসিঅ বড় কবি বটে। কিন্তু রাষ্ট্রনীতিতে নাক গুঁজিতে গিয়া ইনি ইজ্জদ হারাইতেছেন। রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে কাব্যশিল্পের বনিবনাও হওয়া একপ্রকার অসম্ভব।"

যুবার মতে দান্নুন্‌ৎসিঅর গীতিকাব্য গুলা তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তাঁহার উপন্যাস এবং নাটকগুলাও সমসাময়িক ইতালিয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কিন্তু নাট্যকার হিসাবে দান্নুন্‌ৎ-সিঅর যশ বেশী দিন টিকিবে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার আসল ক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছে গান রচনায়।

লিরিকাল কবিত্বশক্তির আসরে দান্নুন্‌ৎসিঅর সমান কোনো লেখক নাকি আজকাল ইতালিতে নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে কার্হ্‌চি ছিলেন ইতালিয় গীতকাব্যের নং ১। কার্হ্‌চি মাৎসিনি-গারিবাল্‌-দির সময়কার কবি।

ইতালিয়ান স্বাধীনতা ও ঐক্য গঠনের যুগকে "রিসর্জ্জিমেন্ত" বলে। সেই যুগের ইতিহাস-কথা লইয়া কোনো কোনো কবি নাটক রচনা করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে তুমিয়াতি সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। তাঁহার এক নাটকে কাহ্বুরের ধড়িবাজি ও রাষ্ট্রনৈতিক ষড়যন্ত্রের তারিফ আছে। ছলে বলে কৌশলে কাহ্বুর ফ্রান্সকে পিয়েমন্তের পক্ষ লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। মাৎসিনি যে ইতালির দার্শনিক, গারিবাল্‌দি যে ইতালির কর্ম্মবীর, কাহ্বুর ছিলেন সেই ইতালির কৌটিল্য।

কিন্তু তুমিয়াতির "ইল তেস্‌সিতরে" সম্বন্ধে যুবা বলিতে-ছেন:—"নাটকটা ইতিহাসও বটে রাষ্ট্রনীতিও বটে! তবে রচনাটা নাট্যশিল্পের তরফ হইতে নগণ্য। স্বদেশী আন্দোলনের

একটা দলিল রচনা করিয়া তুমিয়াতি যুবক ইতালিকে মাতাইতে পারিয়াছেন এই পর্য্যন্ত।

গথিক দুয়ম (ক্যাথিড্রাল)

১

"দুয়ম"র পেছন দিককার দেওয়ালে রঙিন কাচের সাহায্যে যীশুলীলা বিবৃত করা হইয়াছে। চিত্রিত কাচের সুকুমার শিল্প ভারতে কখনো বিকাশ লাভ করে নাই। মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় গির্জ্জায় এই কাচ-শিল্প এক বিশেষত্ব।

এই ধরণের কাচশিল্প বর্ত্তমান ইয়োরোপের সৌধেও দেখিতে পাওয়া যায়। জার্ম্মাণির বড় বড় প্রাসাদতুল্য সার্ব্বজনিক ভবন-গুলার দেওয়ালে গির্জ্জাসুলভ অলঙ্কারের রেওয়াজ আছে। তবে গির্জ্জার কাচে দেখা যায় বাইবেলের গল্প। আর "রাটহাউস," পৌরভবন, আদালত, কোতোয়ালী ইত্যাদিতে "সাংসারিক" জীবনের চিত্রই কাচশিল্পে ঠাঁই পাইয়া থাকে।

মিলানের ক্যাথিড্রালটা যত বার দেখিতেছি ততবারই মনে হইতেছে ইহার ভিতর কি একটা যেন পাইতেছি না। প্যারিসের "নোতর দাম" "গথিক" বাস্তুর অতি সুপরিচিত নিদর্শন। তাহার সঙ্গে মিলানের দুয়মটা তুলনা করা স্বাভাবিক। এটা হয় ত প্যারিসের গির্জ্জার সমান পুরাণা নয়। ইহার নির্ম্মাণ সুরু হইয়াছিল চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। কিন্তু গড়ন হিসাবে মিলানের মন্দির প্যারিসের মন্দিরকে কাণা করিয়া দিবে। অথচ দুনিয়ায়

ইতালিতে বারকয়েক

আজ পর্য্যন্ত লোকেরা মিলানের দুয়মকে বড় বেশী জানে না।

বস্তুতঃ রাইণল্যাণ্ডে অবস্থিত ক্যেলনের (কোলোনের) "ডোম"ও গঠন-গরিমায় প্যারিসের "নোতর দাম" এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাহা ছাড়া অষ্ট্রীয়ার ভ্বিয়েনা নগরে যে "ষ্টেফান্‌স্‌ ডোম" দেখিয়াছি তাহার নিকটও প্যারিসের মন্দির দাঁড়াইতে পারে না।

এই তিনটাই মামুলি পাথরের গথিক বাস্তু। মিলানে আগা-গোড়া মর্ম্মর। শুনিতেছি এখানকার দুয়মর চূড়ায় চূড়ায় ২০০০টা মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এই সকল বিশেষত্ব সত্ত্বেও "দুয়ম" দেখিয়া পেট ভরিতেছে না কেন?

ক্যেলন্‌ আর ভ্বিয়েনার মন্দির দুইটা বাহির হইতে পাহাড়ের মতন দেখায়। আর এই দুইটারই চূড়া আকাশ ফুঁড়িয়া শূন্যে উঠিয়াছে। কিন্তু মিলানে না পাইতেছি সেই বিপুলতা আর না দেখিতেছি অভ্রভেদী শিখর বা শিখরশ্রেণী।

ধরা যাউক যেন কোনো মানুষের সৌন্দর্য্য রঙে, রূপে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সর্ব্বত্রই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহার নাকটা বোঁচা। তাহা হইলে মানুষের যে দুর্গতি ঘটে মিলানের এই মর্ম্মর মন্দিরে সেই অভাবই চোখে পড়িতেছে। ইহার ছাদ নেহাৎ নীচু বা বসা। এক কথায় ইহার শিখর বা চূড়া নাই। বাহিরের শিখর-গুলার জঙ্গলে প্রধান বাস্তুটা ঢাকা পড়িয়াছে।

২

প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে যে সকল লোক ধর্ম্মভেদ, আধ্যাত্মিক ভেদ, আদর্শভেদ প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহারা গথিক গির্জ্জায় একবার "মেস্সে" বা "মাস" পাঠের পদ্ধতিটা দেখিলে নিজেদের ভুল নিজেই ধরিতে পারিবেন। মোমবাতীর আলো, পূজারীদের শোভাযাত্রা, খৃষ্টদেবের "রক্তমাংসের" সঙ্গে "সামীপ্য" বা "সাযুজ্য," "সামগান" আর জানু পাতিয়া উপাসনা এই সব দেখিবামাত্র নিরক্ষর হিন্দুনারীও বুঝিবে যে বোধ হয় তাহার নিজ হৃদয়ের কথাই কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে প্রকাশিত হইতেছে।

ভারতবর্ষকে যাঁহারা "একঘরো" করিয়া রাখিতে প্রয়াসী তাঁহারা ভারতের হিতৈষী ত ননই, বিজ্ঞানের রাজ্যেও তাঁহারা ভ্রান্ত। ইয়োরোপীয় জীবনের সু-কু গুলা ভারতসন্তানেরা নিজ চোখে খুঁটিয়া খুঁটিয়া বাহির করিতে অগ্রসর হউন। তাহা হইলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের যোগাযোগগুলা গভীরভাবে ধরা পড়িবে। চিত্তবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যার আলোচনায় কেতাবের গোলামী ছাড়িয়া স্বাধীন অনুসন্ধানের দিকে নজর দিবার দিন আসিয়াছে।

লোহা, বিজলী ও রেশম

১

ইতালিতে কয়লার খনিও নাই, লোহার খনিও নাই। অথচ ইস্পাতের কারখানা ইতালিয়ানেরা গড়িয়া তুলিয়াছে। বিলাত

ও আমেরিকা এবং ফ্রান্স হইতে কুদরতি মাল আমদানি করা হয়। সর্ব্বপ্রসিদ্ধ ইস্পাতের কারখানার নাম "আন্‌সাল্‌দ"। এই কোম্পানীর বড় আফিস জেনোহ্বায়। কিন্তু মিলানেও এক আড্ডা দেখিলাম।

লড়াইয়ের সময় ইতালিয়ানেরা লোহালক্কড়ের কারবার ফুলাইয়া তুলিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। লড়াই থামিবার পর, কারখানাগুলা দমিয়া গিয়াছে। "আন্‌সাল্‌দ" মাথা খাড়া করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু লোক্‌সান দিতে হইয়াছে বিস্তর। এই লোকসানের হিড়িকেই বৎসর দু'এক হইল "বাঙ্কা ইতালিয়না দি স্কন্ত" ফেল মারিয়াছে।

কয়লার অভাবে তড়িতের ব্যবহার করা আজ কাল দুনিয়ার সর্ব্বত্রই দেখা দিয়াছে। উত্তর ইতালির জলের স্রোতকে কাজে লাগাইয়া তড়িৎ তৈয়ারী করার দিকে ইতালিয়ান শিল্পপতিদের ঝোঁক। তড়িতের সাহায্যে তাহাদের যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিবার কারখানা গড়িয়া তোলা হইতেছে। একজন জার্ম্মান এঞ্জিনিয়ার বলিতেছেন:—"লোহালক্কড়ের কারবারে ইতালিয়ানেরা কচি শিশু মাত্র।"

তথাপি "ফিয়াৎ" কোম্পানীর অটোমোবিল দুনিয়ার বাজারে ইতালির নাম প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছে। মিলানে ইতালির গাড়িব্যবসার ধুমধাম কথঞ্চিৎ পাইতেছি। আসল কেন্দ্র পিয়ে-মন্তের তরিণ সহর।

২

কিন্তু এই অঞ্চলের বড় কারবার বলিলে রেশমের কারখানা বুঝিতে হইবে। পেন্‌সিয়োনের কর্ত্রী বলিতেছেন ঃ—"মিলানোয় কম্‌সেকম ২০০ রেশমের কুঠি আছে।"

তুলা ও লিনেনের কাপড়চোপড় মিলানে তৈয়ারি হয় বিস্তর। অর্থাৎ লম্বার্দি জেলার মজুরেরা প্রধানতঃ তাঁতী ও জোলা। এই জন্যই মিলানকে ভারতীয় আহমদাবাদ বলা চলে।

শহরটা চৌপরদিনরাত অটোমোবিলের চলাফেরায় সন্ত্রস্ত দেখিতেছি। আমদানি-রপ্তানির কোলাহল,—অতন্তঃপক্ষে লোক-জনের গতিবিধি দেখিয়া আর্থিক জীবনের স্রোত আন্দাজ করা সম্ভব।

খানাঘরে লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম,—কৃষিজাত দ্রব্যের চালান হয় মিলান হইতে বিদেশে খুব বেশী। অলিহ্ব তেল, ডিম, মাখন, পনির ইত্যাদির ব্যবসায় উত্তর ইতালির পল্লীবাসীরা লক্ষ্মী লাভ করে।

ইতালিয়ান স্বাধীনতায় বিদেশীর সাহায্য

তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালিয়ান্ স্বাধীনতার ইতিহাসে (১৮৬০) অমর। স্বদেশের শত্রু নিপাত করিবার জন্য বিদেশের সাহায্য কেমন করিয়া আদায় করিতে হয় ইতালিয়ান "রিসর্জিমেন্ত" তাহার অন্যতম সুদৃষ্টান্ত। বর্ত্তমান ইতালির ইতিহাসে তৃতীয় নেপোলিয়নের ঠাঁই খুব বড়।

ইতালিতে বারকয়েক

প্রথম নেপোলিয়নের কীর্তিও মিলানোয় দেখিতেছি কয়েক স্থানে। কাস্তেল্লর বাগিচার সীমানায় এক বিশাল খিলান বিরাজ করিতেছে। দেখিবামাত্র মনে পড়িল প্যারিসের "আর্ক দ' ত্রিয়োঁফ্" (বিজয়-খিলান)। মিলানের এই খিলান নেপোলিয়নের বিজয়কাহিনীই বিবৃত করিতেছে। বাস্তুশিল্পী ছিলেন কাঞোলা (১৮০৭)।

নেপোলিয়নের হুকুমে কাঞোলা আর একটা খিলান তৈয়ারি করিয়াছিলেন (১৮০২)। তাহাতে মারেঙ্গোর লড়াই খোদিত আছে। কাঞোলা নেপোলিয়নের আর এক ফরমায়েস পাইয়াছিলেন। তাহার ফলে দেখিতেছি ডিম্বাকৃতি বিপুল আম্ফি-থিয়েটার। ইহাতে লোক বসিতে পারে ৩০,০০০।

প্রথম নেপোলিয়ন উত্তর ইতালিকে অষ্ট্রীয়ার তাঁব হইতে "স্বাধীন" করিয়া দেন। অর্থাৎ উত্তর ইতালি অষ্ট্রিয়ার গোলামি ছাড়িয়া ফ্রান্সের গোলামি করিতে বাধ্য হয়। সেই সূত্রে মিলানকে প্যারিসের সঙ্গে গাঁথিয়া রাখিবার জন্য নেপোলিয়ন এক বিরাট সড়ক কায়েম করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৮১৫ সালের ঘটনায় নেপোলিয়নের সাধ ধুলিসাৎ হয়। কিন্তু মিলানের বাস্তুগুলাই ইতালিয়ান হৃদয়ে ফরাসী বীরের নাম জাগাইয়া রাখিয়াছে।

ইতালিয়ান ভাষা

ইতালিয়ান ভাষায় এখনো হাতেখড়ি সুরু করি নাই। কিন্তু দু'একটা খবরের কাগজ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছি। ফরাসী-ঘেঁশা শব্দের সাহায্যে কথাগুলা একটু আধটু বুঝিয়া লইতেছি।

ইতালিতে বারকয়েক

ইতালিয়ানের আওয়াজ কানে মিঠা শুনায় না। ফরাসীরা যখন কথা বলে তখন দুই দণ্ড দাঁড়াইয়া শুনিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ইতালিয়ান কথোপকথনে কাণ তৃপ্ত হয় না।

অথচ ইতালিয় গানগুলার ভিতর যে সকল শব্দ শুনা যায় সেই সব মিঠাই লাগিয়াছে। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে থাকিবার সময়ে ঘরে বসিয়াই ইতালিয় নরনারীর গান শুনিতে পাইতাম। কাষ্টাঞোলার পল্লীবাসীরা দলে দলে গান গাহিয়া হোটেলের পাশ কাটিয়া যাইত। সুর এবং শব্দ দুইই উপভোগ করিবার বস্তু মনে হইত।

তাহা ছাড়া ব্যবসাদার গায়কেরা হোটেলে আসিয়া ইতালিয়ান ভাষায় গান গাহিয়া গিয়াছে। সে সবও ফরাসী গানের মতনই শ্রুতিমধুর মনে হইয়াছে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের কথা, লোকের মুখে যে সব আটপৌরে শব্দ শুনিতেছি সে সব অনেকটা বিরক্তি-জনক বলিলেও মিথ্যা কওয়া হইবেনা। ইতালিয় কথোপকথন ঠিক্ যেন বিড়ালের লড়াই বোধ হইতেছে।

এইরূপই ত মিলানের হাটবাজারে প্রথম অভিজ্ঞতা। দেখা যাউক, বেশী দিন এদেশে থাকিলে অথবা ইতালিয় ভাষায় প্রবেশ করিলে আওয়াজ গুলা কেমন ঠেকে।

মুসলিনির বেলজিয়াম-প্রীতি

ঘরে ঘরে আজ নিশান উড়িতেছে। কাল জামা পরিয়া কাল টুপি মাথায় দিয়া ফাশিষ্টরা রাস্তায় চলাফেরা করিতেছে। ব্যাপার কি? মুসলিনি আজ মিলানে (১৮ই মে ১৯২৪)।

ইতালিতে বারকয়েক

বেলজিয়ামের তুই মন্ত্রী আসিয়াছেন মুসলিনির সঙ্গে মোলাকাৎ করিতে। ফ্রান্সে ন্যাশন্যালিষ্ট দলের পরাজয় হইয়াছে। পোঁ-আকারে আর ফরাসী-রাষ্ট্রের কর্ণধার থাকিবেন না। সোশ্যালিষ্ট এবং মজুরপন্থী দলের লোকেরা ফ্রান্সে কর্ত্তামি করিবার সুযোগ পাইল। এই অবস্থায় জার্ম্মাণি সম্বন্ধে ফ্রান্সের রাজনীতি কিরূপ আকার ধারণ করিবে সেই সম্বন্ধে ইয়োরোপের সর্ব্বত্র কাণাঘুষা চলিতেছে। বেলজিয়াম আর ইতালি তুয়ে মিলিয়া একটা শল্লা করিয়া চুকিল।

মুসলিনি বেলজিয়ামকে বলিয়াছিলেন :—"কুছ পরোআ নাই। ইতালি আছে তোমার পশ্চাতে। যাহাতে জার্ম্মাণির স্বপক্ষে ফরাসী সোশ্যালিষ্টরা বেশী বাড়াবাড়ি না করে তাহার জন্য ইতালির উপর নির্ভর করিতে পার। ইতালি সকল বিষয়ে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামের স্বার্থ বাঁচাইয়া চলিতে চেষ্টা করিবে। জার্ম্মাণির নিকট হইতে যাহাতে লড়াইয়ের ক্ষতিপূর্ত্তির টাকা আদায় হয় তাহার ব্যবস্থা করা ইতালিয়ান সরকারের প্রথম কর্ত্তব্য থাকিবে।"

স্কালা থিয়েটারে "নেরণে" অপেরা

কাস্তেল্লর নিকটবর্ত্তী এক "কাফে"তে বসিয়া আড্ডা মারা যাইতেছে। কাষ্টানিয়েন বা চেষ্টনাট গাছগুলা গ্রীষ্মে জাঁকিয়া উঠিয়াছে। গাছতলায় বসিয়া চা পান চলিতেছে। অদূরের পিয়াৎসায় অশ্বপৃষ্ঠে গারিবাল্‌দি।

স্কালা থিয়েটারের এক বেহালাবাদক প্রধান সঙ্গী। আমি

জিজ্ঞাসা করিলাম :—“বৎসর কয়েকের ভিতর এই থিয়েটারটা ইয়োরামেরিকায় এত নামজাদা হইয়া উঠিল কি করিয়া?” বেহালাবাদক ফরাসীতে জবাব দিলেন :—“তাহার একমাত্র কারণ এই যে, ইহার বর্ত্তমান পরিচালক শ্রীযুক্ত তস্কানিনি আজকালকার সঙ্গীতজগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওস্তাদ। অপেরা-ভবনটা বিশেষ বড় নয়। মাত্র তিন হাজার লোক বসিতে পারে। বাহির হইতেও স্কালা সৌধ জঁাকজমকপূর্ণ দেখায় না। তথাপি একমাত্র তস্কানিনির সঙ্গীত-পরিচালনার গুণে মিলানের এই অপেরা ইয়োরামেরিকায় প্রথম স্থান অধিকার করিতেছে।”

তস্কানিনি নিজে নাটক রচনাও করেন নাই অথবা সুর, গৎ বা রাগরাগিণীও লেখেন নাই। সঙ্গীতের “দিরিজেন্ত্” বা “কণ্ডাক্টর” মাত্রকে একসঙ্গে বহু বাদ্যযন্ত্রের ওস্তাদ হইতে হয়। তাহা ছাড়া গায়ক গায়িকাদের সামঞ্জস্য বিধান করা এবং বাদক-দিগকে শৃঙ্খলীকৃত করাও অপেরার কণ্ডাক্টরের কাজ। অধিকন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চে “রেজিস্তর” ও ষ্টেজ ম্যানেজারের যে দায়িত্ব অপেরা-কণ্ডাক্টরেরও সেই দায়িত্ব।

এক কথায়, লড়াইয়ের মাঠে সেনাপতির যে ঠাঁই বর্ত্তমান জগতের সঙ্গীত-পরিচালকদের সেই ঠাঁই। অর্থাৎ হিণ্ডেনবুর্গ, লুডেনডোর্ফ হওয়া যেমন মুখের কথা নয়, তস্কানিনি হওয়াও সেইরূপ মুখের কথা নয়।

বর্ত্তমান ভারত হিণ্ডেনবুর্গ-লুডেনডোর্ফের মর্ম্ম বুঝে না। আর সঙ্গীতশিল্পের সেনাপতিগিরি কি চিজ্, তাহা ত ভারতবাসীর মাথায় বসিতে এখনো অনেক দেরি।

(২)

"নেরণে" সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল। আমরা ইংরেজের মুখে যে রোমাণ রাজাকে নেরো বা নিরো বলিতে শিখিয়াছি সেই রাজাকে ইতালিয়ানরা জানে নেরণে বলিয়া। নিরোর কথা উঠিলেই দুইটা তথ্য মনে আসে। প্রথমতঃ এই রাজা খৃষ্টানদিগকে নির্য্যাতিত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, রোমে যখন আগুন লাগিয়া ঘরবাড়ী ধনদৌলত পুড়িয়া ছাই হইতেছিল তখন নিরো বাজনা বাজাইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন।

এহেন রাজার কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে রোমাণ জাতির বংশধর ইতালিয়ানরা সঙ্গীত-নাটক রচনা করিয়া কি সুখ পাইতেছে? আজ সেই গান শুনিবার জন্য ইতালিয়ান সমাজে এত হুড়াহুড়ি কেন?

বেহালাবাদক বলিলেন:—"ইতিহাসের নেরণে আর বর্ত্তমান সঙ্গীত-নাটকের নেরণে এক ব্যক্তি নয়। নাট্যকার বোআত. এক অপূর্ব্ব চরিত্র খাড়া করিয়াছেন। কর্ম্মবীর, দৃঢ়স্বভাব, শক্তিযোগী ইতিহাসস্রষ্টারূপে নেরণে এই নাটকের প্রথম পুরুষ। কবিবরের ভাবুকতাই যুবক ইতালিকে স্কালার রঙ্গমঞ্চে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিতেছে।"

বোআতর মৃত্যু হইয়াছে। তস্কানিনি বোআতর বন্ধু। নাটকটাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে প্রচার করিবার জন্য তস্কানিনি বহুকাল খাটিয়াছেন।

বলা যাইতেছে যে মুসলিনি যুবক ইতালিকে যে শক্তিমন্ত্রে

দীক্ষিত করিতেছেন সেই শক্তিমন্ত্রেরই উপাসক ছিলেন বোআত। আর, তস্কানিনিও বর্ত্তমান ফাশিষ্টযুগের ভরা জোয়ারে সঙ্গীত-শিল্পের সাহয্যে এক শক্তিধরকে ইতালিয়ান সমাজে দাঁড় করাইয়া দিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার্ম্মাণ সঙ্গীতগুরু হ্বাগ্নার নিবেলুঙ বীরদের গাথাগুলা অপেরায় ঢালিয়া জার্ম্মাণ সমাজে এই ধরণের শক্তিই ছড়াইয়াছিলেন।

৩

স্কালা থিয়েটারে "অর্কেষ্ট্রা"য় একশ' জন ওস্তাদ বাজনা বাজাইয়া থাকেন। তাহার ভিতর বেহালাবাদক ষোলজন। তস্কানিনি স্বয়ং "চেলো" যন্ত্রের ওস্তাদ। কিন্তু সঙ্গীতভবনে তাঁহার প্রধান কাজ সকল শ্রেণীর বাদককে "চালানো"। ইনি নিজে কোনো যন্ত্র বাজাইবার ভার লন না। ইনি "অর্কেষ্ট্রা" বা সঙ্গীতমঞ্চের মধ্য স্থানে দাঁড়াইয়া একশ জনকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন কখন কিরূপে কোন্ যন্ত্রটায় ঘা দিতে হইবে। এই নির্দ্দেশ করিবার জন্য তিনি এক যন্ত্র ব্যবহার করেন। সেটাকে সঙ্গীত-দণ্ড বলিতে পারি। এ এক কাঠি বিশেষ। হাত নাড়া ইঁহার প্রধান বা একমাত্র ভাষা।

"নেরণে" পালার জন্য আট শ' নরনারী রঙ্গমঞ্চে খাড়া হয়। প্রাচীন রোমের গোটা সমাজ একসঙ্গে চোখের সম্মুখে দেখা দেয়। ঝী চাকর, নকীব বরকন্দাজ পাহারাওয়ালা, পুরোহিত, কুস্তীগির "গ্লাদিয়াতর", পালোয়ান, যোদ্ধা, সেনেটার, আমীর ওমরাও ইত্যাদি সবই হাজির হয়।

দীক্ষিত করিতেছেন সেই শক্তিমন্ত্রেরই উপাসক ছিলেন বোআন্ত। আর, তস্কানিনিও বর্ত্তমান ফাশিষ্টযুগের ভরা জোয়ারে সঙ্গীত-শিল্পের সাহয্যে এক শক্তিধরকে ইতালিয়ান সমাজে দাঁড় করাইয়া দিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার্ম্মাণ সঙ্গীতগুরু হ্বাগ্নার নিবেলুঙ বীরদের গাথাগুলা অপেরায় ঢালিয়া জার্ম্মাণ সমাজে এই ধরণের শক্তিই ছড়াইয়াছিলেন।

৩

স্কালা থিয়েটারে "অর্কেষ্ট্রা"য় একশ' জন ওস্তাদ বাজনা বাজাইয়া থাকেন। তাহার ভিতর বেহালাবাদক ষোলজন। তস্কানিনি স্বয়ং "চেলো" যন্ত্রের ওস্তাদ। কিন্তু সঙ্গীতভবনে তাঁহার প্রধান কাজ সকল শ্রেণীর বাদককে "চালানো"। ইনি নিজে কোনো যন্ত্র বাজাইবার ভার লন না। ইনি "অর্কেষ্ট্রা" বা সঙ্গীতমঞ্চের মধ্য স্থানে দাঁড়াইয়া একশ জনকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন কখন কিরূপে কোন্ যন্ত্রটায় ঘা দিতে হইবে। এই নির্দ্দেশ করিবার জন্য তিনি এক যন্ত্র ব্যবহার করেন। সেটাকে সঙ্গীত-দণ্ড বলিতে পারি। এ এক কাঠি বিশেষ। হাত নাড়া ইহার প্রধান বা একমাত্র ভাষা।

"নেরণে" পালার জন্য আট শ' নরনারী রঙ্গমঞ্চে খাড়া হয়। প্রাচীন রোমের গোটা সমাজ একসঙ্গে চোখের সম্মুখে দেখা দেয়। ঝী চাকর, নকীব বরকন্দাজ পাহারাওয়ালা, পুরোহিত, কুস্তীগির "গ্লাদিয়াতর", পালোয়ান, যোদ্ধা, সেনেটার, আমীর ওমরাও ইত্যাদি সবই হাজির হয়।

তাহা ছাড়া সে যুগের রোমাণ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ নানা জাতীয় লোককে—ফরাসী, জার্ম্মাণ, গ্রীক, আর্মিনিয়ান, আফ্রিকান, এশিয়ান—বিভিন্ন পোষাকে দেখা যায়।

কণ্ঠ-সঙ্গীত

১

এই সকলের ভিতর সময়ে সময়ে অনেকের সমবেত একতান গীত (কোরাস) চলিয়া থাকে। তাহা ছাড়া ব্যক্তিগত একলা গানের সুযোগও আছে। অপেরায় সবই গান। কোনো তুই জনে কথাবার্ত্তা চালাইবার সময়ও গানই ব্যবহৃত হয়। কাজেই আটশ' জন লোকের গলার উপর কর্ত্তামি করা তস্কানিনির এক মস্ত সমস্যা।

যান্ত্রিকেরা যেমন তস্কানিনির দণ্ড অনুসারে নিজ নিজ যন্ত্র-সঙ্গীত নিয়ন্ত্রিত করিতে বাধ্য গলাওয়ালারাও সেইরূপ তস্কানিনির হুকুম অনুসারে নিজ নিজ কণ্ঠ শাসন করিতে বাধ্য থাকে। কোনো ব্যক্তি বেহালায় বা বাঁশীতে নিজ কেরদানি জাহির করিবার চেষ্টা করিলে গোটা অর্কেষ্ট্রায় একটা অসঙ্গতি জন্মিতে পারে। আবার সেইরূপ কোনো গায়ক যদি নিজ খেয়াল-মাফিক নিজ কণ্ঠের ওস্তাদি প্রকটিত করিতে ঝুঁকেন তাহা হইলেও সঙ্গীতভবনে রসভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা।

অধিকন্তু যাঁহারা 'সোলো' বা একলা গাহিবার ভূমিকা পান তাঁহাদিগকেও গোটা পালার সুরের খাদচড়াইকে সম্মান করিয়া

নিজ কৃতিত্ব দেখাইতে হইবে। প্রত্যেক বাদক ও গায়ককে নিজ নিজ ওস্তাদি প্রকাশের সুযোগ দেওয়া চাই অথচ সমগ্র সঙ্গীত বস্তুটার সামঞ্জস্য এবং ঐক্য রক্ষা পায়,—এই দুইকূল বাঁচাইয়া 'দণ্ড' চালাইবার শিল্পে তস্কানিনি আজ জগতে অদ্বিতীয়।

২

মানুষের গলা অনেক প্রকার। এক এক গলার এক এক দাম বা স্বাদ। ভিন্ন ভিন্ন "রসের" কণ্ঠধ্বনি প্রত্যেক অপেরায়ই থাকা চাই। অপেরা-পরিচালকের পক্ষে গায়কেরা এবং গায়িকারা কে কোন্ ভূমিকা লইল এই কথাটা বড় জিনিষ নয়। আসল কথা, কোন্ ভূমিকার জন্য কিরূপ গলা, কোন্ শ্রেণীর কণ্ঠধ্বনি কায়েম করা হইল।

গায়ক গায়িকারা কণ্ঠধ্বনি অনুসারে অপেরায় এবং সমাজেও পরিচিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ গলা তৈয়ারি করা ইয়োরামেরিকায় এক বিপুল সুকুমার শিল্প। ভারতীয় ওস্তাদজিরাও গলা সাধার কিস্মৎ বেশ জানেন।

ফুটবলের মাঠে যে ব্যক্তি "গোল" সামলাইতে ওস্তাদ তাহাকে দেশের লোক "গোল-কীপার" বলিয়াই জানে। আবার যে "হাফ্-ব্যাক সেণ্টার" ঠাঁইয়ে পাকা খেলোয়াড় তাহার নাম ঐ ঠাঁইয়ের সঙ্গে গাঁথা থাকে। কণ্ঠধ্বনির মুল্লুকেও কেহ "বাস্" কেহ "টেনর", কেহ "বারিটোন" কেহ "কন্ট্রাল্‌টো", কেহ "সোপ্রাণো" ইত্যাদি।

গলার আওয়াজের স্বাভাবিক উচ্চতা হিসাবে এই সব নামকরণ হইয়া থাকে। মিঠা, কড়া, ভাঙ্গা, চাঁছা ইত্যাদি তফাৎ করা

হইতেছে না। নারী-কণ্ঠ ছাড়া সোপ্রাণো আওয়াজ বাহির হইতেই পারে না। বাস্‌ধ্বনি একমাত্র পুরুষের গলায় সম্ভব। এই গেল গলার জাতি-ভেদ।

৩

পুরুষেরা সাধারণতঃ "টেনর" বা "বারিটোন"। বাঙ্গালী লালচাঁদ বড়ালকে বোধ হয় "বারিটোন" বলা চলে। ইয়োরোপের নামজাদা "টেনর" ছিলেন ইতালিয়ান কারুস। তাঁহার জায়গায় আজকাল পার্ত্তিলে জাঁকিয়া উঠিতেছেন। স্কালা ভবনের "নেরণে" পালায় ইনি নেরণে সাজিয়া থাকেন। প্যারিসের অপেরায় মার্সেল জুর্ণে প্রসিদ্ধ "বারিটোন।"

আমেরিকার নিউইয়র্কে মেট্রোপলিটান অপেরা জগতের সর্ব্ব-বৃহৎ সঙ্গীত-ভবন। ইয়োরোপের সকল দেশের গায়ক গায়িকারাই এই অপেরায় গাহিয়া থাকেন। ইয়াঙ্কি মুল্লুকে টাকার অভাব নাই। আট দশ বিশগুণ বেশী বেতনে জগতের সেরা ওস্তাদদিগকে এখানে বাঁধিয়া রাখা হয়। কারুস ডলারের টানেই মার্কিণ হইয়াছিলেন,—গাহিতেন অবশ্য ইতালিয়ানে। আজ কাল নিউইয়র্কের প্রসিদ্ধ "সোপ্রাণো" হইতেছেন শ্রীমতী রোজা রাইজা। স্কালার "নেরণে" পালায় রোজা গাহিতেছেন। ইনি পোল্যাণ্ডের লোক।

পাহ্বিয়ার বিশ্ব বিদ্যালয়

মিলানের টেক্‌নিক্যাল কলেজের এক ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি এঞ্জিনিয়ারিং পড়িতেছেন। শুনিলাম এই সহরে

কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নাই। এত বড় শহর, এত ধনী লোকের বাস, অথচ কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নাই! শুনিলাম— মিলানের নিকটবর্ত্তী পাভিয়া নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু পাভিয়ার নাম কেহ কখনো শুনিয়াছে কি?

এখানেই নবীন প্রবীণের প্রভেদ বুঝিতে হইবে। মধ্যযুগের ইতালিয়ান সমাজে পাভিয়া, ফেরারা ইত্যাদি নগর সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। কাজেই সে সব ঠাঁইয়ে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। কিন্তু মিলানো নতুন শহর—বর্ত্তমান জগতে মাথা তুলিতে সুরু করিয়াছে। এখনো একটা বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

জার্ম্মাণিতেও দেখা যায়,—আজকালকার হিসাবে যে সকল নগর নেহাৎ ছোট বা অপ্রসিদ্ধ সেই সকল কেন্দ্রেই বড় বড় নামজাদা বিশ্ববিদ্যালয় চলিতেছে। আর্লাঙ্গেন, মার্বুর্গ, হ্বুর্ৎসবুর্গ, হাইডেলব্যর্গ, ফ্রাইবুর্গ ইত্যাদি সহরের কথা মনে রাখিলে ইতালির পাভিয়া, ফেরারা, পাদোভা, বোলোনিয়া ইত্যাদি কেন্দ্রের জ্ঞান-মণ্ডল সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হইবে।

মিলানোর মন্দির-গৌরব

১

প্রাচীন কীর্ত্তি মিলানে অবশ্য আছে। ছয়মটা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ইতালিয়ান আধ্যাত্মিকতার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। তখনকার দিনে মন্দিরগুলাই ছিল এক সঙ্গে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের নিকেতন। কি এশিয়া কি ইয়োরোপ দুই ভূখণ্ডের

মানবজীবনই সে কালে পুরোহিত সন্ন্যাসীদের তাঁবে পরিচালিত হইত।

সাহিত্য, চিত্রশিল্প, স্থাপত্য, বাস্তু, সঙ্গীত ইত্যাদি মানবজীবনের সকল অভিব্যক্তিই মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিত। এই সকলের পুষ্টির জন্য রাজরাজড়া কিষাণ মজুর নিজ নিজ সাধ্যমত অর্থ ব্যয় করিয়াও জীবন ধন্য করিত।

মিলানে নবীন ধনদৌলতের জাঁকিজমক দেখিতেছি অনেক। কিন্তু রাস্তার মোড়ে গলি ঘোঁচে মন্দির দেখিতেছি কতগুলা তাহার সংখ্যা করা কঠিন। নয়া পুরাণা গির্জ্জা নাকি গুণতিতে প্রায় শ দেড়েক! ইস্কুল পাঠশালার সংখ্যাও এত বেশী নয়। থিয়েটার নাচঘর সঙ্গীতভবন সিনেমা ইত্যাদি ত মাত্র বিশটা। মঠ মন্দির কায়েম করা যদি ধর্ম্মজীবনের প্রমাণ বা লক্ষ্য হয় তাহা হইলে ভারতের কোনো শহর মিলানকে হারাইতে পারিবে কি?

২

দুচারটা মন্দিরের ভিতর আনাগোনা করা গেল। অধিকাংশই পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর রচনা। ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটা গথিক মন্দির সেইণ্ট মার্কের নামে পরিচিত। আজকাল যে বাড়িটা দেখা যায় সেটা অবশ্য নতুন তৈয়ারি করা। পুরাণার চিহ্ন কিছু কিছু বর্ত্তমান আছে।

সর্ব্বপ্রাচীন মন্দির চতুর্থ শতাব্দার গড়া। সেইণ্ট আম্ব্রিজিয় পুরাণো অখৃষ্টান দেবালয় ভাঙিয়া তাহার ঠাঁইয়ে এক গির্জ্জা কায়েম

করেন। বিখ্যাত সেইণ্ট অগষ্টিন এই গির্জ্জায় খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।

লম্বার্দির রাজারা এবং "জার্ম্মাণ" সম্রাটেরা আম্ব্রজিয়র গির্জ্জায় রাজপদে অভিষিক্ত হইত। এই মন্দিরটার ভিতর-বাহির কয়েক-বার দেখিবার জিনিষ।

এই যুগের আর একটা "কিয়েজা" বা মন্দির সেইণ্ট লোরেণ্টের নামে পরিচিত।

৩

'কিয়েজা দেল্লে গ্রাৎসিয়ে' নামে যে মন্দিরটা বিবৃত হয় সেইটা দেখিবার জন্য টুরিষ্টদের ভিড় খুব বেশী। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাস্তু নির্ম্মাণ সুরু হইয়াছিল। পুরোহিতেরা মন্দিরের সংলগ্ন যে ঘরে বসিয়া খাওয়া দাওয়া করিতেন তাহার এক দেওয়ালে খোদ লেঅনার্দ দাহ্বিঞ্চির (১৪৫২-১৫১৯) হাতের কাজ দেখা যায়।

"যীশুখৃষ্টের শেষ নৈশভোজন" দাহ্বিঞ্চির চিত্রিত বিষয়। রঙগুলা খানিকটা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনো মূর্ত্তি এবং অঙ্গভঙ্গী সমূহ বেশ বুঝা যায়। খৃষ্ট বলিতেছেন:— "তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে শত্রুর হাতে সঁপিয়া দিয়াছ।" এই কথা শুনিবামাত্র সহভোজী বারজন প্রিয় শিষ্যের মুখে চোখে নানা ভাব উদিত হইয়াছিল। বামদিকের তৃতীয় ব্যক্তি বিশেষ কোনো অঙ্গ চাঞ্চল্য দেখাইতেছে না। ত্রিশ রজতখণ্ডের লোভে এই ব্যক্তি গোয়েন্দাগিরি করিয়াছিল। নাম ইহার জুদাস।

খৃষ্টানদের পক্ষে এই কাহিনীর মতন বিষাদাত্মক কথা আর নাই। রোমাণ ক্যাথলিক গির্জ্জায় যে "মাস্" পাঠ করা হয় তাহার সঙ্গে এই নৈশভোজনের নিবিড় সম্বন্ধ। এই সময়েই খৃষ্ট বলিয়াছিলেন :—"তোমাদিগকে এই যে রুটি ও মদ বাঁটিয়া দিতেছি ইহা আমারই মাংস ও রক্ত।" তদবধি যীশুর রক্তমাংস প্রত্যেক "মাস্" পাঠের পর বাঁটিয়া দেওয়া হয়।

৪

"গ্রাৎসিয়ে" গির্জ্জার এক প্রকোষ্ঠের দুই দেওয়ালে কাঠের উপর চিত্রাঙ্কণ দেখিলাম। বাইবেলের পুরাণা এবং নয়া "টেষ্টামেণ্টে'র গল্পগুলা এই সকল চিত্রের ভিতর বাঁচিয়া রহিয়াছে।

ছবিগুলা মঠের পুরোহিতদের আঁকা। এই ধরণের পুরোহিতের আঁকা ছবি প্রত্যেক গির্জ্জার প্রত্যেক দেওয়ালেই দেখিতেছি। অধিকন্তু কাচের ফ্রেমে বাঁধানো আলগা তৈলচিত্রের সংখ্যাও প্রায় প্রত্যেক "কিয়েজা"য়ই গণ্ডাগণ্ডা।

খাঁটি পুরোহিত বা সন্ন্যাসী ছাড়াও সে যুগে অনেকে দেওয়ালে "ফ্রেস্কো" লেপিত অথবা তৈলচিত্রের শিল্পে জীবন উৎসর্গ করিত। কিন্তু এই সকল গৃহস্থ বা সংসারী চিত্রশিল্পীরাও বাইবেলের গল্প এবং যীশুজীবনী ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে হাত দিত না।

প্রকোষ্ঠের দেওয়ালে যে ছবি দেখা গেল সেগুলা অতি সরল রঙিন কাজ। দুই চারটা রেখার টানেই যেন চিত্র সমূহ আঁকা হইয়াছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাংসল পরিপূর্ণতা ফুটিয়া উঠে নাই। "রাজপুত" ও "পাহাড়ী" চিত্রশিল্প নামে মধ্যযুগের যে সকল ভারতীয়

চিত্র আজকাল প্রচারিত হইতেছে সেইগুলার সঙ্গে এখানে অনেক সাদৃশ্য সহজ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে।

দাহ্বিঞ্চির "শেষ নৈশ ভোজন" তত সহজ সরল নয়। ইহাতে "পারিপ্রেক্ষিক', পূরা মাত্রায় বিদ্যমান। অধিকন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গড়নে রঙের সাহায্যে রূপ ফুটাইয়া তুলিবার কায়দা দেখিতে পাওয়া যায়। দাহ্বিঞ্চির শিল্পধারাই চার শ' বৎসর ধরিয়া পাশ্চাত্য জগতে চলিতেছে। এই ধারার শিল্পরীতি ভারতে কখনো বিকাশ লাভ করে নাই।

নবীন শিল্পের যুগাবতার দাহ্বিঞ্চি

১

দাহ্বিঞ্চির আগেকার যুগে এশিয়ায় আর ইয়োরোপে শিল্প-প্রভেদ একপ্রকার নাই। দাহ্বিঞ্চিকে মধ্যযুগ এবং বর্ত্তমান জগতের মাঝখানে ফেলা চলে। যে সকল চিত্রশিল্পী নবযুগের সূত্রপাত করিয়াছিলেন দাহ্বিঞ্চি তাঁহাদের অন্যতম। ভারতে এবং এশিয়ার অন্যত্র মধ্যযুগের পর কোনো একটা নতুন শিল্পরীতি গড়িয়া উঠে নাই বলিলেই চলে।

ইয়োরোপে এবং আমেরিকায় চিত্রশিল্প বলিলে সাধারণতঃ লোকেরা দাহ্বিঞ্চির পরবর্ত্তী যুগের কাজই বুঝিয়া থাকে। দাহ্বিঞ্চির পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ তাহাদের হিসাবে "মান্ধাতার আমল।" ইতালির প্রাচীনতম মন্দিরে তাহার দৃষ্টান্ত দুচার দশটা খুঁটিয়া খুঁটিয়া বাহির করিতে হয়। সোজাসোজি সেগুলাকে বলা হয় "প্রিমিটিভ্" আদিম বা প্রাথমিক।

ইতালিতে বারকয়েক

বিংশ শতাব্দীর যুবক ভারত প্রত্নতত্ত্বে অনুরাগী হইয়া ভারতীয় চিত্রশিল্পের কতকগুলা পুরাণা নিদর্শন আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন। শিল্পরীতির মাপকাঠিতে এই সবকে পাশ্চাত্য "প্রিমিটিভ্" বা আদিম শিল্পকর্ম্মের কোঠায় ফেলিতে হইবে। দাহিঙ্কি যে শিল্প কায়দার প্রতিনিধি তাহার প্রবর্ত্তন করা ভারতাত্মার ক্ষমতায় কুলায় নাই।

২

মধ্যযুগে এবং কথঞ্চিৎ পরবর্ত্তী কালেও খৃষ্টানরা ছবি আঁকিত মন্দির সাজাইবার জন্য; ধর্ম্মের কাহিনী প্রচার করাই ছিল চিত্রশিল্পীদের একমাত্র উদ্দেশ্য। গির্জ্জার সুকুমার শিল্প ষোল আনা ভক্তিযোগের প্রতিমূর্ত্তি। ভক্তিযোগের মাত্রা এশিয়ার হিন্দু-বৌদ্ধশিল্পে খৃষ্টানদের আধ্যাত্মিকতা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। এ কথাটা স্বীকার না করা নেহাৎ "গা-জুরি" বা একগুঁয়েমি মাত্র।

আজকালকার দিনে অবশ্য উচ্চশিক্ষিত খৃষ্টানরা সেই গির্জ্জা-শিল্পকে আর ভক্তিযোগ বা আধ্যাত্মিকতার খোরাক বিবেচনা করে না। তাহাদের চিন্তায় এই সব জিনিষ মিউজিয়ামে, যাদুঘরে, প্রদর্শনীতে জাহির করিবার মাল। বৈঠকখানায়, শোআর ঘরে, রান্নাঘরে, ছবিগুলা শিল্পের নিদর্শন মাত্র রূপে ঠাঁই পায়।

খাঁটি ক্যাথলিক নরনারীরা কিন্তু আজও মধ্যযুগের সেই ভক্তি-ভাব এবং আধ্যাত্মিকতা রক্ষা করিয়াই চলে। তাহারা একমাত্র সুকুমার শিল্প হিসাবে বাইবেল-চিত্রাবলী বা যীশু জীবনের অঙ্কন-সমূহ নিরীক্ষণ করিতে অভ্যস্ত নয়। তাহাদের চিন্তায় মন্দির সমূহ

হইতে পবিত্র মূর্ত্তিগুলি সরাইয়া আনিয়া মিউজিয়ামে সংগ্রহ করিয়া রাখা পাপকর্ম্ম বিশেষ। এই ধরণের ভক্তিযোগ প্রটেষ্টাণ্ট মহলেও,—বিশেষ করিয়া নারী-সমাজে—হামেশা দেখা যায়।

৬

যাহা হউক,—ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয়ানরা এখানে ওখানে গির্জ্জার আবহাওয়াকে একটু আধটু সাংসারিক চোখে দেখিতে সুরু করিয়াছিল। উনবিংশ বিংশ শতাব্দীতে সেই সাংসারিক চোখের দিগ্বিজয় চলিতেছে। যার ট্যাঁকে টাকা আছে সেই গির্জ্জাগুলা হইতে প্রসিদ্ধ চিত্রগুলি কিনিয়া নিজ নিজ দেশে লইয়া যাইতেছে। আর সেই সকল দেশে মিউজিয়াম গড়িয়া উঠিতেছে।

মূল চিত্রগুলা অনেকক্ষেত্রে দেওয়ালে গাঁথা। সেই সব সরাইবার জো নাই। কাজেই নামজাদা চিত্রকর বাহাল করিয়া সেই সমুদয়ের নকল প্রস্তুত করানোও বর্ত্তমান মিউজিয়াম ব্যবসায়ীদের এক বড় বাতিক। বস্তুতঃ এই ধরণের বাতিক না চাগিলে আর এই বাতিকের পেছনে টাকার তোড়া না থাকিলে লণ্ডন, নিউইয়র্ক, প্যারিস, বার্লিন, হ্বিয়েনা ইত্যাদি নগরের মিউজিয়ামে মিউজিয়ামে গির্জ্জাশিল্প দেখিতে পাওয়া যাইত না।

মিউজিয়ামে মিউজিয়ামে

ইতালির মন্দিরগুলা তীর্থক্ষেত্র। সাধু মোহন্ত সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীর ঠাঁই হিসাবে ইতালি খৃষ্টানদের পবিত্র দেশ। সঙ্গে সঙ্গে

ইতালিতে বারকয়েক

এই মুল্লুক স্থকুমার শিল্পের প্রত্যেক ভক্তের পক্ষেই অবশ্য দ্রষ্টব্য পূণ্যভূমি।

ইতালির বুকের উপর এই সব মন্দির রহিয়াছে বলিয়া ইতালিতে কোনো মিউজিয়াম থাকার দরকার নাই, ইতালিয়ানরা এরূপ ভাবে না। মিলানে স্থকুমার শিল্পের মিউজিয়াম দেখিতেছি এক গণ্ডা।

"কাস্তেল্প" তুর্গটা বর্ত্তমানে মিউজিয়াম ছাড়া আর কিছু নয়। স্কালা থিয়েটারের অনতিদূরে পেৎসলি প্রাসাদ। এই ভবনেও লুঈনি, বত্তিচেল্লি ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শিল্পীদের কাজ সংগৃহীত আছে। লুঈনির আঁকা ছবি বড় ডাকঘরের নিকটবর্ত্তী "পিনাকোতেক" ভবনে রক্ষিত হইতেছে। দাহ্বিঞ্চি ইত্যাদিও বাদ পড়ে নাই।

"ব্রেরা" সংগ্রহালয়টাকে ছোটখাটো লুহ্বর বলা চলে। প্রথমেই চোখে পড়ে আঙিনার মধ্যস্থলে পিতলের বিপুল নেপোলিয়ন-মূর্ত্তি। স্থপতি কানোহ্বার কাজ।

ঘরগুলার ভিতর ষোড়শ শতাব্দীর বহু শিল্পবীরকে দেখিতে পাইলাম। কোথাও কোথাও চিত্রকর কোনো কোনো দেশী বিদেশী ধনীদের ফরমায়েস অনুসারে ছবি নকল করিতেছেন।

রাফায়েলের আঁকা "কুমারীর বিবাহ" দাহ্বিঞ্চির "শেষ নৈশভোজন"-এর মতনই ইয়োরামেরিকায় অতি প্রিয় বস্তু। এক শিল্পী নকল করিতেছেন আর দর্শকমণ্ডলী তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাফায়েলও দাহ্বিঞ্চির মতনই নবযুগের প্রবর্ত্তক। রাফায়েলের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে পারিপ্রেক্ষিকবিহীন সহজ সরল রেখা-প্রাণ চিত্রশিল্প খৃষ্টান সমাজের আবহাওয়ায় স্থপ্রচলিত ছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

আল্পসের আদিজে উপত্যকায়

ভেরোণার উত্তরে

১

ভেরোণায় রেলে চাপা গেল। তৃতীয় শ্রেণীর আরোহী। একজন সহযাত্রীর বোঁচকায় মার্ব্বেল পাথরের নমুনা দেখিলাম। এই ব্যক্তি এখানকার এক দোকানের দালাল।

শেক্সপীয়ারের কল্যাণে ভেরোণা ভারতবাসীর নিকট অপরিচিত নয়। জুলিয়েৎ এবং রোমেও'র কবর নাকি এই সহরে এখনো দেখা যায়। ইতালিয়ানদের নিকট ভেরোণা দান্তের স্মৃতিমণ্ডিত। মহাকবি যখন এদেশে ওদেশে ভবঘুরে-গিরি করিতে বাধ্য হন তখন কিছুকালের জন্য ভেরোণার জমিদার-গৃহে তাঁহার ঘরবাড়ী জুটিয়াছিল।

আল্পস্ পাহাড়ের দক্ষিণ অঞ্চল দেখা যাইতেছে। পর্ব্বতের রূপগুলা ঠিক যেন অনেকটা কেল্লার দেওয়াল বিশেষ। পাহাড়ের ডগায় ডগায় কতগুলা দুর্গ দেখিলাম বলা কঠিন। এই জনপদ ছিল ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত ইতালির উত্তর সীমানার অন্তর্গত।

কোনো কোনো পর্ব্বতচূড়ায় দুর্গের বদলে দেখিতেছি সাধু

মোহন্তদের মঠ। "ভিক্ষুণী"দের মঠও দুএকটা দেখা গেল। মোটের উপর পর্ব্বতগাত্র তরুহীন।

অলিভ্ গাছ যেখানে সেখানে। আঙুরের ক্ষেতও চোখের সনাতন সাথী। চাষ আবাদের ভুঁইয়ে হাল টানিতেছে একটা বলদে,—কিন্তু সেবক তাহার দুই চাষী।

সুড়ঙ্গ ফুঁড়িয়া বাহির হইতে হইতেই দেখি এক ঝরণা সদৃশ দরিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে নামিতেছে। গাড়ীতে চলিতেছি আমরা উজাইয়া। ইতালিয়ানেরা এই দরিয়াকে বলে আদিজে। অষ্ট্রিয়ান (জার্ম্মাণ) নাম এচ্।

২

এচ্ "তাল" বা "হ্বাল্ আদিজে" অপরূপ দেখাইতেছে। সহযাত্রীরা একজনের ঘাড়ে আর একজন চড়িয়া রোমাঞ্চকর রূপ-বৈচিত্র্য দেখিতে দেখিতে "বাঃ" "বাঃ" করিতেছে। এচ্ নেহাৎ সরু গলির ভিতর দিয়া লাফাইতে লাফাইতে ছুটিতেছে।

আলা নামক একটা ছোট পল্লী ছিল আগেকার অষ্ট্রিয়ান-ইতালিয়ান সীমানা। আজকাল এখানে পাশপোর্টের বা মাল-পরীক্ষার হাঙ্গামা নাই। সীমানা এখন বহু উত্তরে। কিন্তু আলার পর হইতে পল্লীগৃহের নূতনত্ব কিছু কিছু বুঝা যাইতে লাগিল। কিষাণ জীবন অষ্ট্রিয়ার আওতায় হয়ত বা কিছু স্বাচ্ছন্দ্যময় ছিল মনে হইতেছে। অবশ্য আলার উত্তর দক্ষিণ সকল অঞ্চলের লোকই জাতিতে—অর্থাৎ ভাষায় ইতালিয়ান।

একটা বড় গোছের সহর পথে পড়িল। নাম রহ্বেরেত্ত।

ইতালিতে বারকয়েক

লোকজনের উঠা নামা বেশ দস্তুর মতন। গোটা ত্রেন্তিনো (দক্ষিণ টিরোল) প্রদেশে রহ্বেরেত্ত শিল্পকেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এক ইতালিয়ান মোসাফের বলিতেছেন,—"যে সব লোক উঠা-নামা করিল তাহাদের অধিকাংশই রেশমের কারবার করে। এখানকার চামড়ার কারখানায়ও কেহ কেহ মাল অর্ডার দিতে নামিয়া গেল। রহ্বেরেত্তর তামাকের কারবারেও অনেক লোক প্রতিপালিত হয়।"

রহ্বেরেত্তর কেল্লাটা আজকাল সমর-মিউজিয়াম। মধ্য যুগের ইতালিয়ান জীবন এই সহরের অলিতে গলিতে আজও বিরাজ করিতেছে। দেশী বিদেশী লোকের যাওয়া আসা আছে মন্দ নয়। ত্রেন্তিনো প্রদেশের "চেম্বার অব কমার্স" বা ব্যবসায়-সঙ্ঘের বড় আফিস এই খানেই অবস্থিত।

মহা লড়াইয়ে ইতালি বনাম অষ্ট্রিয়া

ঘণ্টা দুএকের ভিতর হেবরোণা হইতে ত্রেন্তয় পৌঁছান গেল। আদিজে উপত্যকাই চলিতেছে। ত্রেন্তর অষ্ট্রিয়ান (জার্ম্মাণ) নাম ট্রিয়েণ্ট্। ইংরেজের লেখা ভুগোল-কেতাবে ভারতবাসী এই সহরকে ট্রেণ্ট্ বলিয়া জানে।

উত্তর টিরোলের পক্ষে ইন্‌স্‌ব্রুক যা, দক্ষিণ টিরোল বা ত্রেন্তিনোর পক্ষে ত্রেন্ত সেইরূপ। অষ্ট্রিয়ার আমলে এই সহর ছিল—ইতালিয়ান আল্পসের রাষ্ট্র-কেন্দ্র। অষ্ট্রিয়ান কেল্লা ত্রেন্তর আশে পাশে সকল পাহাড়েই দুএকটা দেখা যায়। বস্তুতঃ আলার পর হইতে এ পর্য্যন্ত প্রত্যেক গিরিশৃঙ্গই কেল্লায় বাঁধানো। কোনো কোনো

কেল্লার মাথাটা কিছু কিছু দেখা যায়। কোনো কোনো কেল্লা পাহাড়েরই যেন একটা অংশ মাত্ররূপে গড়া।

এতগুলা কেল্লা থাকা সত্ত্বেও অষ্ট্রিয়া ত্রেন্তিনোকে ইতালির হাতে সঁপিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। ১৯১৪-১৮ সালের মহা-লড়াইটা বিচিত্র। জার্ম্মাণি এবং অষ্ট্রিয়া "সম্মুখ সমরে" পরাজিত হয় নাই। বিপক্ষীয়েরা এই দুই শক্তিকে "ধনে প্রাণে" মারিয়াছিল। আর্থিক দুর্গতি না ঘটিলে জার্ম্মাণি আর অষ্ট্রিয়া কাবু হইত কিনা সন্দেহ!

দক্ষিণ টিরোলের কথা ধরা যাউক। ইতালি কেনো মতেই অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়িতে রাজি হয় নাই। ইতালিয়ানেরা জানিত যে পল্টনের সাহায্যে ত্রেন্তিনো দখল করা ক্ষমতার অতীত। কিন্তু ইংরেজেরা তাহাদের হাতে পায়ে ধরিয়া নানা লোভ দেখাইয়া ইতালিকে লড়াইয়ে নামাইয়াছিল। এক বৎসর "গুপ্ত পরামর্শে"র পর ইতালি অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করে।

১৯১৫ হইতে ১৯১৮ পর্য্যন্ত চার বৎসর কাল ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়াও ইতালিয়ান পল্টন ত্রেন্তিনোর পাহাড়ে দন্তস্ফুট করিতে পারে নাই। বরং অষ্ট্রিয়ান সেনাই পাহাড়ী কেল্লাগুলা হইতে নামিয়া উত্তর ইতালি উত্তম পুত্তম করিয়া ছাড়িয়াছিল। অষ্ট্রিয়ান তোপের দৌড় পাদোহবা, হেবনেৎসিয়া পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকিত। তথাপি গোটা ত্রেন্তিনো আজ ইতালির হাতে। আর ত্রেন্ত সহর উত্তর ইতালির বড় খুঁটায় পরিণত। শত্রু পক্ষকে লড়াইয়ে হারাইতে না পারিয়াও শত্রুর মুল্লুকগুলা দখল করা অসম্ভব নয়! জার্ম্মানরা আর অষ্ট্রিয়ানেরা যদি নিজ নিজ সেনাদলকে আরও কিছুকাল "খাইতে

পরিতে” দিয়া মজবুত রাখিতে পারিত তাহা হইলে হ্বার্কাইয়ের সন্ধি অন্ত আকারে দেখা দিত।

ত্রেন্ত সহর

১

ত্রেন্তয় আদিজে অনেকটা শোআ নদী। সাদা ধব্‌ধবে জল। খড়িমাটি-প্রধান পাহাড়ী উপত্যকার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

“তাল”টা এই অঞ্চলে বেশ সুবিস্তৃত। দুইধারের পাহাড়ের পা গুলা পরস্পর প্রায় মাইল দেড় দুএক ফারাক হইবে। পর্ব্বতের গা গুলা নেহাৎ খাড়া উঠিয়াছে। আবেষ্টনটা অতি বিচিত্র। ত্রেন্ত যেন একটা পাহাড়ী ডেক্‌চির তলদেশ মাত্র।

গরম বটে। আর তেমনি ধূলা। পাহাড়ের ন্যাড়া মাথাগুলো ধূ ধূ করিতেছে। বড় গোছের গাছ কোথাও এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। অগ্নিকুণ্ডে বসবাস করা কাহাকে বলে তাহা এই আল্পস্ পাহাড়ের এচ্ তালে আসিয়া বেশ বুঝিতেছি। ভারতীয় গ্রীষ্ম পাশ করা না থাকিলে ইতালিয়ান আল্পসে ফেল মারিতেই হইবে। মে মাসের অভিজ্ঞতাই এই। জুলাই আগষ্ট মাসে দক্ষিণ আল্পসের লোকেরাও “আই ঢাঁই” করিতে নাকি অভ্যস্ত। সহরটা মাত্র ছয় শ ফিট উঁচু।

ষ্টেশনের সম্মুখস্থ ময়দানে বিরাট দান্তেমূর্ত্তি পিত্তলের নির্ম্মিত। মনুমেণ্টটা তেতালা। এক এক তলায় “দিহ্বিনা কোমেদিয়া” বা “ভগবদ্ গাথা”র কোনো কোনো অংশ স্থাপত্যে মূর্ত্তি পাইয়াছে।

বেআত্রিচে তরুণীর আকারে সর্ব্বোচ্চ তলে দাঁড়াইয়া আছে। ছাদের উপর দণ্ডায়মান কবিবরের বিপুল মূর্ত্তি।

ময়দানের একদিকে সঙ্গীতগুরু হ্ব্যার্দির আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেছি। অপরদিকে কবিবর কাহ্‌র্চির আবক্ষ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। উনবিংশ শতাব্দীর ইতালিয়ান সমাজে এই দুইজন অমরতা লাভ করিয়াছেন। মাৎসিনি-গারিবাল্‌দির যুগে হ্ব্যার্দি-কাহ্‌র্চির সুকুমার শিল্পই যুবক ইতালিকে তাতাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছিল।

২

সড়কগুলা খটখটে;—পাথরের টুকরায় বাঁধানো। বাড়ীঘর-গুলা দোতালা তেতালা। গলি ঘোঁচের দৃশ্য মন্দ নয়। অপরিষ্কার বলার জো নাই। কোনো কোনো বাড়ীর সম্মুখস্থ দেওয়াল চিত্রিত। রাস্তার লোকেরা হাঁটিতে হাঁটিতে ফ্রেস্কো-শিল্পের কাজ দেখিতে পায়। পর্য্যটকের চোখে এ এক নতুন ঢঙ্‌।

"ব্যাঙ্কা কাতলিকা" বা "ক্যাথলিক সমাজের ব্যাঙ্ক"টা জাঁকজমকপূর্ণ বোধ হইতেছে। দেশী বিদেশী সকল প্রকার টাকার কারবার এখানে চলে। একজন কর্ম্মচারী বলিলেন:—"গোটা ত্রেন্তিনো প্রদেশে এই ব্যাঙ্কের শাখা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইবেন।"

অন্যান্য ব্যাঙ্কের সংখ্যা বেশ উঁচু। "বাঙ্কা দিতালিয়া" ইতালির সরকারী ব্যাঙ্ক। তাহার শাখা ষ্টেশনের ময়দানেই অবস্থিত। "বাঙ্কা কম্মার্চিয়ালে," "ক্রেদিত ইতালিয়ান" ইত্যাদি বড় বড় ব্যাঙ্কের শাখাও দেখিতেছি। ত্রেন্তকে ছোট খাটো সহর বলিতে ইচ্ছা হয় না। ব্যবসা বাণিজ্যের চলাচল সতেজ,—সন্দেহ নাই।

খৃষ্টান সাধুসন্ন্যাসী ও ধর্ম্মকর্ম্ম

১

সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে গা ঘেঁসিতে হয় উঠতে বসিতে। তাঁহারা কেহ "ফ্রাঞ্চিস্কান"-পন্থী, কেহ বা "দোমিনিকান"-পন্থী ইত্যাদি। শুনিতেছি,—সংযম পালন বিষয়ে "কাপুচিন"-পন্থীরা সব্‌সে কড়া নিয়ম পালন করিয়া থাকেন। টাকা পয়সা স্পর্শ করা পর্য্যন্ত তাঁহাদের চিন্তায় পাপ। চট বা কম্বলের একটা আলখাল্লা ছাড়া অন্য কোনো পোষাকে গা ঢাকা নিয়মবিরুদ্ধ। অধিকন্তু ভিক্ষা করিয়া "রোজ আনা রোজ খাওয়া" তাঁহাদের দস্তুর। ভারতীয় পারি-ভাষিকে,—"কভি ঘী ঘনা, কভি মুঠভর চানা, কভি সোভি মানা।"

বিদেশী পর্য্যটকেরা ভারতে আসিলে হিন্দু সাধু সন্ন্যাসীদের দল বা সম্প্রদায়ের প্রভেদগুলা সহজে পাকড়াও করিতে পারিবে কি? ত্রেন্তয় ভারতসন্তানের পক্ষেও সেইরূপই কঠিন সমস্যা উপস্থিত। তিলকটা লম্বা উঠিয়াছে কি শোআ দাগা হইয়াছে, অথবা মাথা ন্যাড়া কি সকেশ, টিকির পরিমাণ কতখানি,—ইত্যাদি তথ্য না জানিলে 'পন্থে' 'পন্থে' তফাৎ করা অসম্ভব। সেই ধরণের বৈচিত্র্যই খৃষ্টান সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রায়ও লক্ষ্য করিতে হইবে।

সাধুগিরির "সু-কু" যে খৃষ্টান হিন্দু সকল মুল্লুকেই এক বস্তু এ কথাটা দুনিয়ায় এখনো সুপ্রচারিত নয়। সুপ্রচারিত নয় বলিয়া প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে একটা তথাকথিত আত্মিক পার্থক্য বাজারে রটিতেছে। উভয় পক্ষীয় লোকেরা কুসংস্কারের আওতা হইতে

বিদায় লইয়া নিরেট সত্যের আলোচনায় অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে যে,—"তাতল সৈকতে বারি-বিন্দুসম সুত মিত রমণী সমাজে" ইত্যাদি মন্তরটা হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতন খৃষ্টান বৈরাগীদেরও গোড়ার কথা।

২

ডাইনে বাঁয়ে দেখিতেছি মন্দির। ত্রেন্তকে খৃষ্টানদের মথুরা বা কাশী বলিতে ইচ্ছা করে। সাবেককালের প্রাসাদতুল্য ইমারত দুচারটা এগলিতে ওগলিতে নজরে পড়িতেছে। সুন্দর রেণেসাঁসের গড়নগুলা অতি মোলায়েম।

সড়কগুলার নাম ছিল আগে জার্ম্মাণ। আজকাল সর্ব্বত্র ইতালিয়ান নাম কায়েম হইয়াছে। ভিক্তর এমানুয়েল, মাৎসিনি, রাফায়েল, গারিবাল্দি ইত্যাদির নামে রাস্তা অথবা "পিয়াৎসা" দেখিতেছি।

"আল্‌বের্গো"র (হোটেলের) জানালা হইতে অদূরে দেখিতেছি "কাস্তেল্ল"র পাহাড় সদৃশ গড়নের চাপ। এইটার নাম "সৎপরামর্শের দুর্গ।" ধর্ম্মযাজকদের কেল্লারূপে ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল। পরে অষ্ট্রিয়ান আমলে এখানে পণ্টনের ছাওনি বসে।

মার্কো মন্দিরটা হোটেলের গলির ওপারে। অতি পুরাণো ইমারত। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি দুই তিন নারী ভিন্ন ভিন্ন বেদীর সাফাই কাজে নিযুক্ত আছে। তাহাদের কেহ বা বিধবা কেহ বা অনূঢ়া, কেহ বা ঘরের গিন্নী সধবা। শুনিতেছি মন্দির পরিষ্কার করার কাজটা তাহারা আজীবন কর্ত্তব্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে।

ঝাড়া, ধোআ, বাতীদান, ফুলদান, চাদর, পরদা, ইত্যাদির হিকৃমত করা, প্রতিদিন বেদির উপর ফুলের তোড়া দেওয়া,—এই সব কাজ মন্দির সেবার অন্তর্গত।

পিয়েত্র মন্দিরে, ফ্রাঞ্চেস্ক মন্দিরে, মারিয়া মাজ্জ্যরে মন্দিরে সর্ব্বত্রেই এইরূপ দুচারজন সেবিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ত্রেন্ত সহরে গির্জ্জা-"দাসী" গৃহস্থ-মহিলাদের সংখ্যা অনেক। কেননা প্রায় গির্জ্জায়ই আট দশটা করিয়া বেদি থাকে। আর এক একটা বেদির ভার লয় এক একজন নারী। গির্জ্জাদাসীদের ভিতর অনেকেই "ভদ্র-ঘরের" এবং পয়সাওয়ালা লোকের মা বোন। ক্যাথলিক খৃষ্টানদের ভক্তিযোগ বা কর্ম্মযোগ হিন্দুদের চেয়ে কম কি?

ইতালিয়ান স্বদেশসেবক বাত্তিস্তি

"সৎপরামর্শে"র কাস্তেল্লটা আধ-ভাঙ্গা অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। মেরামত চলিতেছে। কোনো কোনো কামরার দেওয়ালে ও ছাদে ছবি লেপা ছিল। খানিকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোনো কোনো ফ্রেস্কোয় সাবেক কালের শিল্পরস এখনো চাখা সম্ভব।

কেল্লাটাকে মিউজিয়ামে পরিণত করা হইতেছে। চেজারে (সীজার) বাত্তিস্তির আত্মা হইবে এই সংগ্রহালয়ের প্রাণস্বরূপ। এই ব্যক্তি ত্রেন্তয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অষ্ট্রিয়ান আমলে তিনি খবরের কাগজ চালাইয়া ত্রেন্তিনোর ইতালিয়ান নরনারীকে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে খেপাইতেন। ইতালির সঙ্গে ত্রেন্তিনোর সংযোগ

সাধন ছিল বাতিস্তির "স্বজাতি"-সেবার মুলমন্ত্র। ইয়োরামেরিকার রাষ্ট্রীয় পরিভাষায় বাতিস্তিকে বলা হইত "ইরেদেন্তিস্ত্।"

ইতালি অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করিবামাত্র বাতিস্তি ত্রেন্ত হইতে পলাইয়া ইতালির সেনাবিভাগে যোগ দিয়াছিলেন। এক লড়াইয়ে বাতিস্তি অষ্ট্রিয়ান পল্টনের বন্দী হন। অষ্ট্রিয়ান সেনাধ্যক্ষ বাতিস্তিকে স্বদেশ-দ্রোহী হিসাবে গুলি করিয়া মারিবার হুকুম দেন। তখন হইতে বাতিস্তি ইতালিয়ান জাতির দেবতা-স্বরূপ। বাতিস্তির বীরত্ব চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য ইতালিয়ান গবর্ণমেণ্ট অনেক কিছু করিতেছে।

বাতিস্তির নামে সমর-মিউজিয়াম, বাতিস্তির নামে সড়ক বা চৌরাস্তা ইত্যাদি অনুষ্ঠান ত্রেন্তিনোর প্রায় প্রত্যেক পল্লী ও সহরে দেখা যায়। বাতিস্তির সঙ্গে সঙ্গে আরও দুএকজন "স্বদেশ-দ্রোহী" "স্বজাতি"-সেবক এইরূপে ত্রেন্তিনোয় অমর হইতেছেন।

পথে ঘাটে

বাঁক ঘাড়ে করিয়া ইতালিয়ান নারীরা কল হইতে জল বহিয়া লইয়া যাইতেছে। কাঠের চটি জুতা পায়ে অথবা খালি পায়ে ছেলেপুলেদিগকে সড়কে প্রায়ই দেখিতে পাই। মেয়েদেরও অনেকে জুতামোজাহীন।

দোকানে দোকানে তামার বাসনকোসন বিস্তর। এই অঞ্চলে রান্নাবাড়ি চলে তামার জিনিস পত্রে। আলুমিনিউম বা কলাই করা ঘটি বাটির রেওয়াজ রান্না ঘরে কিছু কম। জার্ম্মাণদের তুলনায় এইরূপই বোধ হইতেছে। "আলবের্গো মার্কো"র অল্প

দূরেই একটা ছোট্ট গলি। আগে নাম ছিল হিবয়া তেদেস্ক বা জার্ম্মাণ সড়ক। এখনকার নাম হিবয়া স্থফ্রাজ্য। গলিটার উপর দুএকটা রেণেসাঁসের অলঙ্কারওয়ালা বাড়ী সুন্দর দেখাইতেছে। মোড়ের উপর সুচিত্রিত দেওয়ালবিশিষ্ট ইমারতটা চিত্তাকর্ষক।

গলির উপর এক কুলপী বরফওয়ালা চাকাওয়ালা বাক্সের ভিতর হইতে কুলপী বেচিতেছে। পাড়ার ছেলেমেয়েরা এক একটা পয়সা হাতে করিয়া খালি পায়ে দৌড়াইতে দৌড়াইতে মোড়ে আসিয়া হাজির। "জেলাতি", "জেলাতি" (কুলপী) আওয়াজে গলি গুলজার।

সেকালের পুরাণা সহর-দেওয়াল কোথাও কোথাও এখনো খাড়া আছে। সরকারী ইমারতগুলা বেশ পরিপাটি। চৌরাস্তায় একটা "ফন্তানা" বা জলের ফোআরা কয়েক মিনিট ধরিয়া দেখিবার বস্তু বটে।

মন্দিরের ভিতর বাহির

ফ্রাঞ্চেস্ক গির্জ্জার মর্ম্মর দেওয়ালে প্রচুর ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হইতেছে। নীল ও লালবর্ণের চিত্রাঙ্কণগুলা ফেলিয়া দিবার জিনিষ নয়।

"কাতেদ্রালে" নামক গির্জ্জা ত্রেস্তর "ডোম" বা মহামন্দির। একাদশ শতাব্দীতে গড়ন সুরু হয়। পাঁচশ' বৎসর ধরিয়া নির্ম্মাণ-কার্য্য চলিয়াছিল। নানা রীতির ছাপ গঠনের ভিতর দেখিতে পাই। বাহির হইতে এক এক দিককার স্তম্ভের সারিগুলা চোখের পক্ষে যারপর নাই আরামদায়ক বোধ হইতেছে।

ভিতরে দেখিতেছি দুই ধারে দুই সিঁড়ির ধাপ। খিলানের শ্রেণী দুইটা এই মন্দিরের বিশেষত্ব। প্রধান বেদির বাঁ দিককার দেওয়ালে কতকগুলা ফ্রেস্কো দেখা গেল। দেখিলেই মনে হইবে "প্রিমিটিভ্" বা আদিম ধরণের,—অনেকটা জ্যত্ত-পন্থী চিত্র-শিল্পের রূপ ও রঙের সমাবেশ। ভারতে আমরা এই ধরণের কাজকে সাধারণতঃ "রাজপুত" নামে চিনিয়া থাকি।

"মারিয়া মাজ্জ্যরে" গির্জ্জায় বসিয়াছিল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ত্রেন্তর "কাউন্সিল।" সে ষোড়শ শতাব্দীর কথা (১৫৪৫)। জার্ম্মাণ লুথার, সুইস ৎসুইংলি, ফরাসী ক্যালহ্বাঁ ইত্যাদি ধর্ম্ম-"সংস্কারক"দের ধাক্কা খাইতে খাইতে অচলায়তন ক্যাথলিক সমাজ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। "সনাতনী"রাও বাধ্য হইয়া নবযুগের অনুরূপ কিছু কিছু ঝাড়া-বাছা কায়েম করে।

নয়ার আক্রমণ হইতে পুরাণাকে বাঁচাইবার জন্য গোঁড়া ক্যাথলিকদের পাঁড়-পুরোহিতেরা এই মন্দিরে এক "বিশ্ব-সভা" ডাকিয়াছিলেন। মজলিসের বাক-বিতণ্ডার ফলে সনাতন খৃষ্ট-ধর্ম্মের ঠাট বজায় রাখিয়া ছোটো খাটো ভাঙা-গড়ার ব্যবস্থা করা হয়। বিপ্লবী "সংস্কারক"দের প্রভাব তাহার পর হইতে অল্পে অল্পে কমিতে থাকে। সনাতনীদের এই বিশ্বসভার ধুরন্ধর ছিলেন জেস্যুট সম্প্রদায়ের তুখোর ধর্ম্মগুরুগণ।

প্রধান বেদির বাঁ দিককার দেওয়ালে একটা ফ্রেস্কো দেখিতেছি। সনাতন ধর্ম্মের সংরক্ষকদের মজলিস তাহাতে আঁকা রহিয়াছে। মারিয়া মাজ্জ্যরের এই "বিশ্বসভা"র জন্যই ত্রেন্তর নাম দুনিয়ায় সুপরিচিত। প্রাচীন ভারতেও বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যুগে যুগে "বিশ্বসভা"

ডাকিয়া ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। ভারতের ন্যায় ইয়োরোপেও ধর্ম্মের নামে একাধিক সম্মেলন বসিয়াছে।

নোন উপত্যকার দৃশ্য গৌরব

১

"সিনিয়র" (অর্থাৎ শ্রীযুক্ত) দেকার্লির সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি "বাঙ্কা ইন্দুস্ত্রিয়ালে" নামক শিল্প-প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কের অন্যতম পরিচালক। ব্যাঙ্কটা বিশেষ বড় নয়।

ব্যাঙ্কের অধীনে একটা তেলের খনির কাজ চলিতেছে। দে কার্লি বাবু নিজ অটোমোবিলে করিয়া খনি দেখাইতে লইয়া গেলেন। পনর বিশ মাইল যাইতে লাগিল প্রায় তিন পোআ ঘণ্টা। প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনাতীত সুন্দর। কাঠের পুলে আদিজে পার হইয়া ত্রেন্তর পশ্চিম দিকে চলিয়াছি।

দে কার্লি বলিলেন :—"এই যে যোজন যোজন বিস্তৃত আঙুরের ক্ষেত দেখিতেছেন চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই অঞ্চলে চাষ বাস অসম্ভব ছিল। আদিজের জল দুই কুল ছাপাইয়া উঠিয়া এক দিককার পাহাড়ের পা হইতে অপর দিককার পাহাড়ের পা পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকিত। অষ্ট্রিয়ান গবর্ণমেণ্ট অজস্র টাকা খরচ করিয়া জমিন ভরাট করাইয়াছে। আজ এই উপত্যকা ফলের ক্ষেতে আর আঙুরের শস্যে সবুজ।" সেপ্টেম্বর, অক্টোবর মাসে এই সবুজই আবার "পাকা শস্যে"র সোনায় নাকি ঝঁাকিয়া উঠিবে।

আঙুর গাছ লতাইয়া উঠে। প্রধান ডাঁটাটা খানিক দূর

পর্য্যন্ত শক্ত এবং নিরেট হয়। কিন্তু কোনো মতেই খাড়া উঠিতে পারেনা। শঁসা, কুমড়া, লাউ ইত্যাদির মতন আঙুরের জন্য মাচাঞ চাই। মাটিতে গড়াইতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আঙুরের প্রধান খাদ্যই রোদ। কাজেই চাই হাওয়া, ফাঁকা জায়গা এবং সূর্য্যের আলো।

সুইটসাল্যাণ্ডের টেসিন প্রদেশে আঙুরের ক্ষেত দেখিয়াছি পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে সাজানো। ভাবিতাম বুঝি পর্ব্বত গাত্র ছাড়া আঙুর জন্মেই না। ত্রেন্তর নিকটবর্ত্তী আদিজে উপত্যকা আগাগোড়া সমতল। মনে হইতেছে যেন বা ধানের ক্ষেতের বা পাটের ক্ষেতের আইলের উপর দিয়াই যাইতেছি। মাচাঞগুলা মানুষের বুক বা গলা পর্য্যন্ত উঁচু। আঙুরের পাতা দেখিতে অনেকটা পানের পাতার মত।

কচি কচি আঙুরের গোছা মাচাঞের ভিতর ঝুলিতেছে। দে কার্লি বলিলেন :—"এবার যেমন গরম পড়িয়াছে তাহাতে বিশ্বাস হয় আঙুরের ফসল হইতে ত্রেন্তিনর ধনাগম হইবে বেশ। গরম কম পড়িলে আঙুর সরস ও সতেজভাবে বাড়ে না।" আমাদের "আম পাকা" গরম ইতালিয়ানদের "আঙুর-বাড়া" গরমেরই মাসতুত ভাই।

২

এইবার সুরু হইল লোন উপত্যকা। সে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের খনি। আর সমতল মুল্লুক নয়। দরিয়া বা ঝরণা গর্জ্জিতেছে,—অটোমোবিলের সড়ক নেহাৎ সঙ্কীর্ণ। দুই ধারে,—চার ধারে,—দশ ধারেই, কিম্ভূত কিমাকার পর্ব্বতের রূপ।

ইতালিতে বারকয়েক

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড়ের চাপ লইয়া দশ বিশ জন পালোয়ান যেন নুড়ি লুফালুফি করিতেছে। এই উদ্দাম প্রকৃতির বিপ্লব এক-মাত্র বিপ্লবী হৃদয়েরই খোরাক। এই সকল দৃশ্য না দেখিলে জীবন নয়া তেজে মাতিতে পারে না।

বাঁ দিককার পাহাড়গুলার মাথায় চড়িয়া অদূরে কতকগুলা ন্যাড়া গিরিবর তাহাদের নিজ নিজ ঐশ্বর্য্য দেখাইতেছে। চিত্রশিল্পী মহলে সুবিদিত "ত্রেন্তা" শৈলমালাই সেই সব। একজন জার্ম্মাণ বন্ধু সপত্নীক ঐ পাহাড়গুলা আঁকিবার জন্যই কয়েকদিন হইল নিকটবর্ত্তী "মোল্‌হেবেনো" হ্রদের কিনারায় আড্ডা গাড়িতে গিয়াছেন। ত্রেন্তা বিখ্যাত মাদোনা দি কাম্পিলিয়ো পাহাড়ের দক্ষিণ জের। "দলমিতি" নামে শৈলশ্রেণী প্রসিদ্ধ।

পাহাড়া গৌরবগুলা চিত্রে ধরিয়া রাখিতে অভ্যাস করা শিল্পীদের পক্ষে রূপ-সমাবেশের এবং গড়ন-সামঞ্জস্তের মুল্লুকে "রিসার্চ্চ" বা মৌলিক গবেষণা বিশেষ। আর দর্শকদের পক্ষে এই সমুদয় চিত্র ফটোগ্রাফকে ফটোগ্রাফ আবার সুকুমার শিল্পকে সুকুমার শিল্প। পাহাড়ের স্তূপগুলা আঁকিবার দিকে যে সকল চিত্রকরদের ঝোঁক তাহারা প্রকারান্তরে অনেকটা বাস্তুশিল্পী বা ভাস্করদের রূপদক্ষতাই অধিকার করিয়া বসে।

মাছের তেলের খনি

শেষ পর্য্যন্ত মোল্লারো পল্লীতে পৌছান গেল। প্রায় পনর শ ফিট উঁচু। এইখানেই কারখানা। পাহাড়ী খনিটা ইহারই

লাগাও। আরও কয়েক শ' ফিট পায়দল উঠিয়া এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে খনি পর্য্যবেক্ষণ করিতে অগ্রসর হইলাম।

তেলের খনিতে তরল পদার্থ কিছু দেখিলাম না। দেখিলাম মাত্র পাথরের চাপ। এই পাথর কাটিয়া গুড়া করিয়া জ্বালাইলে তরল তেল বাহির হয়। খনির ভিতর তেলের পাথর কালো শ্লেটের আকারে শুইয়া আছে।

এঞ্জিনিয়ার বলিতেছেন :—"পাথরের শ্লেটগুলা বাস্তবিক পক্ষে মাছের জমাট চাপ। এই দেখুন কোনো কোনো টুকরায় এখনো এক আধটা মাছের আঁশ রহিয়াছে। যে-কোন দুই টুকরা ঘসিলেই আঁশটে গন্ধ শুকিতে পাইবেন। পাহাড়টা ছিল সমুদ্রের নীচে।"

গন্ধক আর আমোনিয়া এই দুই বস্তুই এখানকার পাথরের মূল উপাদান। তেল তৈয়ারী হইলে নাম হয় "ইতিয়ল।" জার্ম্মাণরা উত্তর টিরোলোর পাহাড়ে যে তেল তৈয়ারি করে তাহার নাম "ইথ্-তিয়োল" বা মাছের তেল। "আর্শিভ্ অ্যাতার্ন্যাশন্যাল দ' ফার্মাকো-দিনামী এ দ' তেরাপী" নামক প্যারিসের ফরাসী ভেষজ-পত্রিকায় দুইজন ইতালিয়ান রাসায়নিকের লেখা প্রবন্ধ ছাপা হইয়াছে। তাহাতে মোল্লারোর পাহাড়ী তেলের "দ্রব্যগুণ" আলোচিত আছে।

এই তেল চুআঁইয়া বাহির করিবার পর ফ্যাক্টরীতে নানা প্রকার ওষুধ তৈয়ারি করা হইয়া থাকে। চামড়ার রোগে ওষুধ গুলা খুব কাজে লাগে। গণ্ডা গণ্ডা ওষুধের তালিকা দেখিলাম। মানুষের ব্যারামে ত এইসব ব্যবহার করা যায়ই। অধিকন্তু ঘোড়া, গরু, ভেড়া, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি জানোয়ারের ব্যাধিতেও "ইতিয়ল" কায়েম হইতে পারে।

ইতালিতে বারকয়েক

এঞ্জিনিয়ার বলিতেছেন :—"এতদিন আমরা কেবল ওষুধ তৈয়ারি করিতেছিলাম। সম্প্রতি কারখানাটা বাড়াইবার দিকে প্রয়াস চলিতেছে। তাহা হইলে অটোমোবিল, রেল, এঞ্জিন, ফ্যাক্টরি ইত্যাদি চালাইবার জন্য মামুলি তেল তৈয়ারি করিতেও পারিব। কেরোসিন তেলের সঙ্গে টক্কর দেওয়া "ইতিয়ল"র পক্ষে কঠিন নয়।"

কোম্পানীর নাম "মিনিয়েরা সান রমেদিয়"। এঞ্জিনিয়ার বাবু হ্বিয়েনায় শিক্ষাপ্রাপ্ত রসায়ন-ডক্টর। পূর্ব্বে জার্ম্মাণির নানা রসায়নিক কারখানায় কাজ করিয়াছেন। নাম এত্তরে লান্‌ৎসিঙ্গার। কারবার ছোট, খনিতে আর কারখানায় লোক খাটে গোটা পঞ্চাশেক।

ইতালিয়ান গদ্য সাহিত্য

বৃষ্টল হোটেলে চা পানের নিমন্ত্রণ ছিল। ত্রেন্তর একজন স্কুলমাষ্টার অন্যতম অতিথি। ইনি ল্যাটিন, গ্রীক ইত্যাদি ভাষা শিখাইয়া থাকেন। প্রাচীন এবং আধুনিক ইতালিয়ান সাহিত্যও ইঁহার আলোচ্য বিষয়।

শিক্ষক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম :—"সেকেলে গদ্য সাহিত্যের কোন্ গ্রন্থ আজও ইতালিয়ান সমাজে বাঁচিয়া রহিয়াছে ?" জবাব পাইলাম :—"বকাচ্য (১৩১৩-৭৫) প্রণীত দেকামেরণে' অর্থাৎ 'দশইয়ারি কথা'।"

বকাচ্য আর চতুর্দ্দশপদী কবিতার প্রবর্ত্তক পেত্রার্কা (১৩০৯-৭৪) সমসাময়িক,—চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক। অর্থাৎ

দান্তে (১২৬৫-১৩২১) এবং রেণেসাঁসের আরিয়স্ত (১৫৩০) ও তাস্‌স (১৫৮০) এই দুই খুঁটার মাঝামাঝি বকাচ্চোর ঠাঁই। "দেকামেরণে" গ্রন্থে ভারতীয় "দশকুমার চরিত" কেতাবের খানিকটা জুড়িদার ঢুঁড়িতে গেলে অন্যায় করা হইবে না।

ইতালিয়ান শিক্ষকটি বলিলেন,—"দেকামেরণে পড়িবার জন্য স্কুলের ছেলেমেয়েরা যারপরনাই লালায়িত। কিন্তু ইহার সংমার্জ্জিত সংস্করণ ছাড়া অন্য কোনো সংস্করণ তরুণ তরুণীদের হাতে দিবার বিধান নাই।"

কথায় কথায় বুঝা গেল,—"উনবিংশ শতাব্দীর গদ্য সাহিত্যে "মান্‌ৎসনি" ইতালির হুবিক্তর হুগো। মান্‌ৎসনিকে "রোমান্টিকতা"র প্রতিমূর্ত্তিও বলা হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

লেহ্বিকোয় আধা গ্রীষ্ম

জলমাহাত্ম্যে ম্যালেরিয়া লোপ

১

'রেতে মশা দিনে মাছি' এই নিয়ে লেহ্বিকোয় আছি। মে-জুন মাস। গরমে অস্থির হইতে হইতেছে। অথবা গুমোট, মেঘ আর ঝড় বৃষ্টি। কিন্তু এই লেহ্বিকোতেই ম্যালেরিয়ার "অব্যর্থ মহৌষধ" আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহারই ধাক্কায় এই অঞ্চলে হাজির হওয়া গেল,—যদিও অবশ্য জ্বরের সঙ্গে যোলাকাৎ নাই বহুদিন।

ত্রেন্ত হইতে রেলে লাগিয়াছে মাত্র ঘণ্টা দেড়েক। পাহাড়ী "তালে" গাড়ী ক্রমেই উঁচাইয়া উঠিয়াছে। স্থগানা-"তাল" ইতালিয়ান আল্পসের স্থরম্য জনপদ। জলের ঝরণায় কোনো কোনো অঞ্চল মুখরিত। কাল্‌দোনাৎসো হ্রদের জলরাশি নিশ্চল শুইয়া আছে। পাশেই লেহ্বিকো হ্রদ। এই গুলাকে হ্রদ না বলিয়া সরোবর বলিলেই ঠিক হয়। অথবা "সাগরদীঘি" রূপেই কাল্‌দোনাৎসোও লেহ্বিকো পরিচিত থাকা উচিত।

ঘণ্টা তিনেকের ভিতর লেহ্বিকো হইতে হেবনিসে পৌঁছানো যায়। রেল পথটা আগা গোড়া স্থগানাতালের ভিতর দিয়া নির্ম্মিত। দুই ধারে উঁচু পাহাড়।

২

আন্তলিনি সাহেব বলিতেছেন :—"লেহ্বিকোর জল একবার পেটে পড়লে আর ম্যালেরিয়ার বাপের সাধ্য নাই যে কোনো মানুষকে আক্রমণ করে।" আমি বলিলাম :—"লেহ্বিকোর-জল ত দেখিতেছি না কোথাও ? হ্রদটা ত পুকুর মাত্র। দেখিয়া ভাবিতেছি ম্যালেরিয়া যার নাই সেও লেহ্বিকো হইতে ম্যালেরিয়া লইয়া যাইবে।"

আন্তলিনি হাসিয়া বলিলেন, "আরে পাগল! লেহ্বিকোর 'জল' একটা পারিভাষিক শব্দ। তা বোতলে পাওয়া যায়, সে হ্রদের জল নয়, ঐ দেখুন হ্বেত্রিয়োলো পাহাড়ের ঘাড় হাজার পাচেক ফিট উঁচু। ঐ পাহাড়ের দুই ঝোরায় দুই বিভিন্ন স্বাদের জল বাহির হয়। একটাকে বলে 'নরম' আর একটাকে বলে 'কড়া' জল। মাত্রা বিশেষে এই দুই জল ব্যবহার করিতে হয়,—চামচ গুণিয়া—ডাক্তারের মাপ অনুসারে। খাওয়া দাওয়ার সময় জলের সঙ্গে দুধ, আঙুরের রস বা চার সঙ্গে মিশাইয়া এই জল খাইবার নিয়ম। এই জল ধাতুজ বা ধাতুমিশ্রিত,—লোহায় ও আর্সেনিকে ভরপূর।"

লেহ্বিকো মিউনিসিপ্যালিটির ধাতুজ জলের বিভাগ তদারক করা আন্তলিনির কাজ। "লেহ্বিকো-জলের" সম্বন্ধে নানা কাগজ পত্র তাঁহার অফিসে পাওয়া গেল।

৩

লেহ্বিকো আগে ছিল অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। কাজেই হ্বিয়েনার বড় বড় ডাক্তারেরা এখানকার ধাতুজ জলের রাসায়নিক

পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। জার্মাণ, সুইস এবং অন্যান্য ডাক্তারদের গবেষণাও আছে। বার্লিন হইতে প্রকাশিত "ৎসাইট্‌শ্‌ফ্‌ট ফ্যির বাল্‌নেওলোগী, ক্লিমাটোলোগী উণ্ড্‌ কুরর্ট্‌-হিগিয়েন" অর্থাৎ "স্নানতত্ত্ব, জলবায়ু ও স্বাস্থ্য-নিবাস" বিষয়ক পত্রিকার এক প্রবন্ধ দেখিলাম। রসায়ন ও চিকিৎসা দুই তরফ হইতেই সুবিস্তৃত আলোচনা আছে।

আন্তলিনিকে বলিলাম :—"দেখিতেছি, গরু হারাইলেও বোধ হয় ঢুঁড়িয়া পাওয়া যায়,—এই জলের মাহাত্ম্য এত!" জবাব পাইলাম :—"এক প্রকার তাই, তবে একটা বিশেষত্ব আছে। অন্যান্য দেশে যে সব লৌহপ্রধান ধাতুজ জল পাওয়া যায় তাহাতে লোহার সঙ্গে গন্ধকের এবং এই দুইয়ের সঙ্গে আর্সেনিকের প্রাকৃতিক সংযোগ নাই। চেকোস্লোভাকিয়ার কার্লস্‌বাড, ফ্রান্সের হ্বিশি, জার্মাণির কিস্‌সিঙ্গেন ইত্যাদি অঞ্চল স্নানকেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধ। কিন্তু লেহ্বিকোর ঝোরায় ধাতুগুলার মিশ্রণে যে অনুপাত পাওয়া যায়, সেই অনুপাত আর কোথায়ও নাই। আর্সেনিকের সঙ্গে লোহার যোগাযোগ মণি-কাঞ্চন সংযোগ বিশেষ। লেহ্বিকো এই হিসাবে দুনিয়ার "একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

"নরম" জলে আর্সেনিক ও লোহার পরিমাণ কম। প্রায় আটগুণ বেশী মাল থাকে "কড়া" জলে। তাহা ছাড়া প্রত্যেক জলেই তামা, দস্তা আলুমিনুম এবং অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে কম বেশী গন্ধকের সংশ্রব আছে।

৪

এক জার্ম্মাণ নারী বলিতেছেন :—"খাটিতে খাটিতে আমি আধমরা হইয়া পড়িয়াছিলাম। লেভিকোর জলে পনর দিন স্নান করিবার পর চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছি। আর গোটা পাঁচেক স্নান লইয়াই দেশে ফিরিব।"

লেভিকোর জল খাওয়াও চলে, আবার এই জলেই নাওয়াও চলে। চৌবাচ্চায় কতখানি জল ঢালিতে হইবে, তাহার সঙ্গে কতখানি ঠাণ্ডা ও গরম জল মিশাইতে হইবে,—সে সব মাপা জোখা থাকা চাই, ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া নাওয়ার বা খাওয়ার বিধান নাই।

লেভিকো মিউনিসিপ্যালিটি ঝোরা হইতে নলে করিয়া জল আনাইয়া "বাঞি" বা স্নানাগার তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছে। এক একবার নায়িতে লাগে প্রায় দেড় টাকা। তোআলে ইত্যাদি সবই পাওয়া যায়; লোহার দরুণ জল এত ঘোলা বা লাল যে তোআলে কখনই সাদা থাকে না।

বড় বড় দুইটা হোটেলে স্নানাগারগুলা অবস্থিত। "গ্রাণ্ড হোটেলে"র ব্যবস্থা দেখিয়া আসা গেল। এখানে সুইডিশ জিম্‌নাষ্টিক্‌সের সরঞ্জামও আছে। হাত, পা, গিঁট, আঙ্গুল, কোমর, পিঠ ইত্যাদি প্রত্যেক অঙ্গের নড়ন চড়নের জন্য নানা প্রকার যন্ত্রপাতি দেখা গেল।

একজন মার্কিণ পরিবারের সঙ্গে আলাপ হইল। ইহারা বলিতেছেন :—"চামড়ার রোগে যাহারা ভোগে তাহাদের পক্ষে

লেহ্বিকোর জল অব্যর্থ। আট দশবার ডুব দিলেই ব্যারাম সারিয়া যায়। অন্ততঃ এরূপ ত আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।" এই হোটেলেরই পাশে এক গৃহস্থ বাড়ীতে অতিথি হইয়াছি।

পাহাড়া পল্লীর সভ্যতা

১

মাজ্যরে ও লুগানো হ্রদের কিনারায় বাড়ীতে বাড়ীতে বেঁটে তাল, খেজুর ও কলা গাছ দেখিয়া আসিয়াছি। এই গেল সুইস্-ইতালিয়ান আল্প্সের দৃশ্য। সুইটসার্ল্যাণ্ডের নরনারী পয়সা খরচ করিয়া বাগান তৈয়ারী করিতে অভ্যস্ত। সুদূর দক্ষিণ দেশ হইতে গাছ গাছড়া আনাইয়া ঘর বাগিচা সাজাইবার রেওয়াজ আছে।

আসল ইতালিয়ান আল্প্সে সেই ঐশ্বর্য্যের পরিচয় নাই। লেহ্বিকো নেহাৎ দরিদ্র পল্লী। বড় বড় সরকারী হোটেল দুইটা বাদে আর সবই আটপৌরে জীবন ধারণের উপযোগী হোটেল, কাফে ও রেষ্টর‍্যাণ্ট। একটা মাত্র বড় রাস্তা, পাকা বাঁধানো। এই রাস্তার দুই ধারেই যা কিছু টুরিষ্টদের বসবাসের যোগ্য বাড়ীঘর। অন্যান্য সব পল্লীবাসীদের কুঁড়ে। পল্লীর নরনারী সকলেই কৃষক। মজুর নামক শ্রমজীবী এই অঞ্চলে নাই, কারণ ফ্যাক্টারি কোথাও দেখিতেছি না।

লুগানোয় শুঁকিয়া আসিয়াছি বসন্তের গন্ধ—বেগুণী রঙের গ্লিৎসিনেন ফুলের খুস্‌বই। আর তাহার ভিতর মৌমাছির ভন্ ভন্

শুনিতে শুনিতে পাহাড়ের কোলে কোলে পায়চারি করা গিয়াছে। লেহ্বিকোয় এখন গ্রীষ্মের ফুল ফুটিয়াছে। গ্নিংসিনেনের ঠাঁইয়ে পাইতেছি বাড়ীবাগানের ব্যাড়ায় ব্যাড়ায় জুঁই-জাতীয় ফুলের রূপ ও গন্ধ।

ঘরের দুই জানালা ফুঁড়িয়া একটা বিশাল লিণ্ডেন তরুর শুভ্র ফুলগুলা গন্ধ বিলাইয়া যাইতেছে। যেন ঠিক বকুল তলায় বাস করিতেছি। মৌমাছির গান গাছের পাতার তালে তালে অহরহ চলিতেছে। বাড়ীর বাগানে গোলাপও ফুটিয়াছে রং বেরঙের।

২

দুই ধারে পাহাড় শ্রেণী। ডগাগুলা পাঁচ ছয় হাজার ফিট উচু। কিন্তু এমন মারাত্মক উঁচু দেখাইতেছে না, কারণ লেহ্বিকোর ময়দানই প্রায় হাজার দেড়েক ফিট। ময়দান গুলা কোথাও মাইল খানেক, কোথাও আধ মাইল চওড়া হইবে। জমিন সবই চষা। পল্লীগৃহ সকল পাহাড়ের পায়ে পয়ে, ক্ষেত সমূহের কিনারায়।

আল্‌প্‌স পাহাড়ের দৃশ্য প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ। অষ্ট্রিয়ায়, ব্যাহ্বেরিয়ায়, সুইটজার্ল্যাণ্ডেও দেখিয়াছি একদম অগম্য, বস-বাসের অযোগ্য পার্ব্বত্য মুল্লুক বিরল। 'তাল'গুলা বেশ বিস্তৃত না হইক, সেখানে দস্তুর মাফিক চাষ আবাদ চলিতে পারে। আর নেহাৎ দুর্গম পাহাড়ের মাথা না ডিঙ্গাইয়া ইতালি হইতে অষ্ট্রিয়ায়, অষ্ট্রিয়া হইতে সুইটজার্ল্যাণ্ডে এবং এইরূপে একদেশে হইতে অন্য দেশে

চলাফেরা করা সম্ভব। এই কারণেই আল্‌স্‌ মুল্লুকে প্রাচীন কাল হইতেই মানুষের বস্তি গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে। এই ধরণের প্রাকৃতিক সুবিধার অভাবেই বোধ হয় হিমালয়ের 'তালে' 'তালে' বড় রকমের উৎকর্ষ বা সভ্যতা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই।

৩

একটা ছোট গোছের পাহাড়, ভেঁড়ার বাচ্চার মতন, বুড়া পাহাড় গুলার কোলের নিকট শুইয়া রহিয়াছে। সেইটার ঘাড় মটকাইয়া আসা গেল। এক জার্ম্মাণ নারী, এক ব্যাভেরিয়ান নারী এবং কয়েকজন স্থানীয় লোক পাহাড়-পরিক্রমায় সহযাত্রী।

এক ধারে লেহ্বিকো,—অপর ধারে পড়িল কাল্‌দোনাৎসো হ্রদ। টেসিনের সুইস আল্‌স্‌ গাছগাছড়ায় দরিদ্র দেখিয়াছি। ত্রেন্তিন প্রদেশের পাহাড়গুলাও সেইরূপ। বিপুল তরুবরের বনশোভা জার্ম্মাণির জেলায় জেলায় যেমন উপভোগ করা গিয়াছে সেরূপ উপভোগের সুযোগ দক্ষিণ আল্‌সের ইতালিয়ান ও সুইস্‌ জেলায় জুটে না। জার্ম্মাণিতে মাইলের পর মাইল ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটিয়া ছায়া-শীতল বনে বনে বেড়ানো সম্ভব। বাঘ ভল্লুকের ভয় নাই, সাপ ব্যাঙের দৌরাত্ম্য নাই। নরম ঘাসের উপর হাঁটিতে পারা এক প্রকার মখমলের বিলাস-যোগ।

লেহ্বিকোয়, লুগানোর বনরাজির সবুজ সম্পদ নাই। পাথরের রাস্তায় হাঁটিতে হয়। রোদে মাথা জ্বলিতে থাকে। পাহাড় গুলা অনেক স্থলেই একদম ন্যাড়া নয় বটে, কিন্তু প্রায়ই খাড়া উঠিয়াছে। আরামের সহিত গাছের নীচে হাঁটিয়া বেড়ানো সম্ভব নয়। অধিকন্তু

গাছ তলায় বিপুল বনের গভীরতা অথবা অসীম সাগর ধ্বনির মতন শো শো শব্দ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে না। বন ত বন, জার্ম্মাণির বন!

চাষ ও চাষী

১

একটা মাত্র বড় সড়ক বটে, কিন্তু অটোমোবিলের ঘন ঘন যাতায়াতে অস্থির হইতে হয়। ত্রেন্ত হইতে হ্বেনিসের পথে কত গাড়ীই যে রোজ যাওয়া আসা করে, তাহার ঠিক নাই। আর ধূলায় ধুলায় "ধুল পরিমাণ"!

যাহা হউক চাষীদের সঙ্গে আত্মীয়তা করিয়া লইয়াছি। দুধ মাখন ঘরে বসিয়াই পাই। মাঝে মাঝে ডিমও আসে। কখনো কখনো বাগানে যাইয়া গাছ হইতে চেরী পাড়িয়া খাই। অবশ্য একদম বিনা পয়সায় "ভ্রাতৃভাব" চালানো হয় না। চেরী গুলা লাল টুকটুকে। দেখিতে কুলের মতন। বীচি ফেলিয়া দিতে হয়। কিন্তু মিষ্টি ও সরস। সিঁড়ি বহিয়া গাছে উঠা দস্তুর।

বাগানে বাগানে চাষীরা তুঁত গাছের পাতা গুলা একটা একটা করিয়া ছিঁড়িয়া লইতেছে। রেশম-কীটের খাদ্য এই সব পাতা। গ্রীষ্মে ন্যাড়া গাছ কিম্ভূত কিমাকার সন্দেহ নাই। বড়ই আশ্চর্য্যের কথা,—এ সকল দেশে তুঁত ফল গুলা কেহই খায় না। কিন্তু কুচকুচে পাকা বড় বড় ফলগুলা দেখিয়া লোভ সম্বরণ করা কঠিন। যেখানেই যাই, বিনা বাক্য ব্যয়ে গাছ হাতাইতে সুরু করিয়া দিই।

ইতালিতে বারকয়েক

লুগানোয় দেখিয়া আসিয়াছি বসন্তের ছোঁয়ায় আঙুর গাছের লতায় লতায় পাতা গজাইতে সুরু করিয়াছে। লেহ্বিকোয় আজকাল আঙুর-ক্ষেত কচি প্রশস্ত পাতার শোভায় সমুজ্জ্বল। সবুজ পাতা গুলাকে ভারতবাসীরা পানের পাতা বলিয়া সন্দেহ করিবে। ফল এখনো জন্মে নাই, সে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের কথা।

কোনো কোনো পাহাড়ের পা হইতে কোমর পর্য্যন্ত মাইল মাইল আঙুরের সবুজ ক্ষেত দেখিতেছি। কোনো কোনো গৃহস্থ ঘরের বারান্দা আঙুরের লতায় ঢাকা হইয়া যাইতেছে। কাফে এবং রেষ্টরাণ্টের কোনো কোনো অংশে আঙুরের গাছগুলা সবুজে ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহার নীচে বসিয়া খাওয়া দাওয়া গল্প গুজব চলিতেছে।

পাহাড়ে পাহাড়ে ষ্ট্রবেরী টুঁড়িয়া খাইতেছি। চাষীদের ছেলে পুলেরাও থলে হাতে করিয়া ষ্ট্রবেরীর খোঁজে বাহির হইয়াছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া ষ্ট্রবেরী খুঁজিয়া খাওয়া বড়ই আরাম দায়ক।

ষ্ট্রবেরী ভারতে পাওয়া যায়,—কিন্তু বোধ হয় সুপরিচিত নয়। পাকিলে লাল টুকটুক করে,—অনেকটা খোসা সহ লিচু ফলের মতন দেখতে। কিন্তু "খোসা শুদ্ধ তোমা খাই তবু কত রস পাই", ষ্ট্রবেরী হে, কি গুণ তোমার! বীচি নাই মিষ্টি মিষ্টি টকটক স্বাদ। আর গন্ধে? "তোমার উপমা তুমিই", হে ষ্ট্রবেরী। মুখে ফেলিয়া দিলেই মাখনের মত মিলিয়া যায়। গাছগুলা নেহাৎ ছোট, ঝোপের মতন।

ইতালিতে বারকয়েক

২

একজন "বাবু"-জাতীয় প্রবীন ইতালিয়ান ভদ্রলোক বলিতেছেন,—"লেহ্বিকোর চাষীদিগকে নেহাৎ গো-বেচারা বিবেচনা করিবেন না। ইহারা বড় পাজী। ইহাদের সঙ্গে ভদ্রলোকেরা কোনো মতেই একত্র কাজ চালাইতে অসমর্থ।"

শুনিলাম,—নগর শাসন-সমিতির বাছাইয়ে চাষীরা বিশ জন প্রতিনিধির ভিতর চোদ্দজনকে পাঠাইয়াছিল নিজ সমাজ হইতে। চারজন আসে সোশ্যালিষ্টপন্থী, মাত্র দুই জন ছিল বাবু-শ্রেণীর লোক। লেহ্বিকোর চৌহদ্দিতে নর নারীর সংখ্যা হাজার খানেক।

চাষীদের বাড়াবাড়ি দেখিয়া বাবুরা "সমিতি"টা তুলিয়া দিয়াছে। এখন শাসন চলিতেছে বিনা সমিতিতে। পৌর-সভার ঠাঁইয়ে ইতালিয়ান সরকার রোম হইতে একজন সেনাপতি পাঠাইয়াছেন। এই ব্যক্তি মধ্যস্থ হইয়া বাবুতে চাষীতে এখন সমঝোতা কায়েম করিবার চেষ্টায় আছেন। ভদ্রলোকটি বলিতেছেন—"চাষীদিগকে আঁটিয়া উঠা বড়ই কঠিন। ভদ্র লোকদের ইজ্জদ রক্ষা দায়।

ত্রেন্তিন প্রদেশের চাষীরা "ফাশিষ্ট" একদম নয়। ইহাদিগকে জব্দ করিবার জন্য ফাশিষ্টরা মোতায়েন আছে! মাঝে মাঝে সড়ক, গলিঘোঁচে ফাশিষ্টদের মিছিল দেখিতেছি। কাল জামা পরিয়া যুবারা আর ছোকরারা গম্ভীর বদনে চলাফেরা করে। বাঁ হাত সম্মুখে বাড়াইয়া সেলাম করার রেওয়াজটা ইহারা প্রাচীন রোমান আমল হইতে আমদানি করিয়াছে।

শুনা যাইতেছে চাষীরা ক্রমে ক্রমে "গণতন্ত্রের"র পক্ষপাতী

হইয়া উঠিতেছে। রাজা উজির ইত্যাদির গুণকীর্ত্তন ইহাদের মহলে বড় একটা শুনা যায় না। কিন্তু লেহ্বিকোর যে কোন বাড়ীঘরেই দেখিতেছি ইতালিয়ান রাজের তসবির ঝুলানো আছে।

অষ্ট্রিয়ার প্রভাব

১

একটা বিচিত্র কাহিনী শুনা গেল। এক ব্যক্তি বলিলেন,—'ত্রেন্তিনর নরনারী আজও অষ্ট্রিয়ান-ভক্ত। হাব সুবুর্গ বংশীয় কাইজারের নাম ডাক এখনো এই প্রদেশের কিষাণ সমাজে খুব বেশী।" জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এই প্রদেশের প্রায় পনর আনা লোকই না রক্তে ও ভাষায় ইতালিয়ান? ইহারা অষ্ট্রীয়ার দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইয়া ইতালির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ত সুখেই আছে বিশ্বাস করিতেছি। অথচ এখনো ইহারা পুরাণো বিজেতা অষ্ট্রিয়ানদের গুণগান করিতেছে কেন?"

লাল মেজাজে ইতালিয়ান স্বদেশসেবক বলিলেন—"একমাত্র, লেহ্বিকো, ত্রেন্ত, আর্কে ইত্যাদি নগর-সমন্বিত ইতালিয়ান আল্পসের অবস্থাই কি এইরূপ? এই সব অঞ্চল ত মাত্র বিগত লড়াইয়ে ইতালি রাষ্ট্রের সামিল হইয়াছে। এই সকল দেশের ইতালিয়ানেরা এত শীঘ্র অষ্ট্রিয়ার মায়া কাটাইয়া উঠিবে কি করিয়া? উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লম্বার্দি এবং হ্বেনেৎসিয়া প্রদেশ দুইটা অষ্ট্রীয়ান সাম্রাজ্য হইতে ছাড়া হইয়া ইতালির সঙ্গে যুক্ত হয়। এই দুই অঞ্চলের ইতালিয়ানেরাও বহুকাল পর্য্যন্ত ইতালির বিরোধী এবং অষ্ট্রিয়ার প্রেমিক ছিল। মিলানো, হ্বেরোণা, পাদোহ্বা, হ্বেনেৎসিয়া ইত্যাদি নগরের নর-

নারীকে খাঁটি ইতালিয়ান স্বদেশসেবকে পরিণত করিতে বিশ পঁচিশ বৎসর লাগিয়াছে। ইতালিয়ান আল্পসের ইতালিয়ানদিগকে আসল ইতালিয়ানে পরিণত করিতেও আমাদিগকে অনেক বেগ পাইতে হইবে।”

জিজ্ঞাসা করিলাম :—“ইতালিয়ান ভাষাভাষী ইতালিয়ান রক্তের লোকেরা হাড়ে হাড়ে অষ্ট্রিয়ান-ভক্ত হইল কি করিয়া ?”

প্রথম কারন,—“অষ্ট্রিয়ান ইস্কুলমাষ্টাররা উঠ্‌তে বস্‌তে চাষী-দিগকে শিখাইত যে ইতালিতে না আছে শিক্ষাদীক্ষা, না আছে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা, আর না আছে আইনের শৃঙ্খলা ও সামাজিক শান্তি। ইতালি-রাষ্ট্রের কুৎসা রটানো ছিল অষ্ট্রিয়ান ইস্কুলমাষ্টারদের নিত্য-কর্ম্মপদ্ধতি। ইতালিয়ান ভাষাতেই বালক বালিকারা লেখাপড়া শিখিত বটে। কিন্তু ইহারা শিখিত মাত্র এই যে, ইতালিয়ানেরা ডাকাইতি করিয়া জীবন ধারণ করে, ইতালিয়ান সমাজে চুরি বাটপাড়ি চলিতেছে অহরহ। ইতালিয়ান সরকার ও দেশকে সকল উপায়ে অসভ্য ও বর্ব্বর প্রমাণিত করা ছিল অষ্ট্রিয়ানদের এক কাজ। কাজেই মায়ের রক্তের সঙ্গে ত্রেন্তিনর চাষীরা অষ্ট্রিয়ান সভ্যতার গৌরব, হাব্‌স্‌বুর্গ আইনের মাহাত্ম্য এবং সঙ্গে সঙ্গে ইতালিয়ানদের মূর্খতা ও কুসংস্কার-প্রবণতা, ইতালিয়ান সমাজের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব ইত্যাদি তত্ত্ব স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে।”

এই সঙ্গে ক্যাথলিক পুরোহিতদের কথাও উঠিল। ইতালির রাজাও ক্যাথলিক, আবার অষ্ট্রিয়ার বাদশাও ছিল ক্যাথলিক। কিন্তু ক্যাথলিক খৃষ্টান জগতের মোহন্ত, রোমের পোপ সাবেক

কাল হইতেই অষ্ট্রিয়ান বাদশার ঐহিক ক্ষমতা জবরদস্ত বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। অষ্ট্রিয়ান কাইজারের স্বাক্ষর অনেক পোপসংক্রান্ত কাজকর্ম্মে আবশ্যক হইত। কাজেই রোমের পোপ ইতালির রাজাকে নকড়া-ছকড়া সমঝিতেন। অধিকন্তু ইতালিয়ান শাসনপদ্ধতি অনুসারে পোপ এক প্রকার ইতালির বন্দী বিশেষ। পোপকে যাহারা বে-ইজ্জদ করে অথবা ঠুঁটা করিয়া রাখে তাহারা ক্যাথলিক হইলেও ধর্ম্মভীরু "ভক্ত" জনসাধারণের চিন্তায় ধর্ম্মের শত্রু।

ইতালিয়ান স্বদেশসেবক বলিতেছেন :—"ত্রেন্তিনের নরনারীরা ক্যাথলিক, ধর্ম্মভীরু এবং পোপ-ভক্ত। সেই ধর্ম্মের বাধা আর সেই ধর্ম্মগুরুর দুস্‌মন যখন ইতালি দেশ, ইতালিয়ান সরকার আর ইতালি-রাজ—তখন ইতালিকে ত্রেন্তিন সুনজরে দেখিতে পারে কি? অপরদিকে পুরোহিতরা পোপের পেটেল ও গুপ্তচর। ইহারা ধর্ম্মের নামে চোপর দিন রাত প্রচার করিয়াছে যে অষ্ট্রিয়ার বাদশা পোপের বন্ধু ও সহায়ক,—ক্যাথলিক ধর্ম্মের মস্ত বড় মুরুব্বিই অষ্ট্রিয়ান গবর্ণমেণ্ট। কাজেই ত্রেন্তিনের ইতালিয়ানরা বড় সহজে ইতালি-ভক্ত হইয়া উঠিতে পারে না।"

২

"স্বাধীনতা"র অর্থ রকমারি। পরাধীন নরনারীকে স্বাধীনতার স্বাদ বুঝানো অতি কঠিন। বিদেশী বিজাতীয় বিজেতা জাতিকে বিজিত জাতির লোকেরা সকল সময়েই "পর", "দেশের শত্রু" বা স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক বিবেচনা করে না। রক্তের টান, ভাষার

টান, ধর্ম্মের টান,—কোনো টানের জোর সম্বন্ধেই গোলাম-জাতীয় স্বদেশ-সেবকেরা পূরাপূরি নিঃসন্দেহ নয়। অনেক কাঠখড় খরচ করিতে পারিলে তবে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে জনগণের ভিতর স্বাধীনতার আন্দোলন পাকাইয়া তোলা সম্ভব।

স্বাধীনতার স্বপক্ষে রায় দেওয়া মানুষ মাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ এরূপ বিবেচনা করা মহা ভুল। বরং পরাধীনতার স্বপক্ষেই গোলামিতে অভ্যস্ত নরনারীরা মত দিবে এইরূপ বুঝিয়া রাখা চিত্তবিজ্ঞান-সেবীদের দস্তুর হওয়া উচিত।

বিজেতা জাতিরা এই কথাটা খুব ভাল রকমই জানে। এই জন্যই ইহারা বুক ঠুকিয়া প্রচার করে :—"কুছ পরোয়া নাই। চাষী, মজুর, এবং অন্যান্য অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত নরনারীর ভিতর 'প্লেবিসিট' বা সার্ব্বজনিন ভোট লওয়া হউক, দেখা যাইবে,—ইহারা তথাকথিত দেশ-নায়ক বা স্বদেশ-সেবকদের কথায় সায় দিবে না। ইহারা আমাদের আমলকেই খাঁটি স্বদেশী আমল বিবেচনা করে; আমরা এই দেশ হইতে চলিয়া যাইতে চাহিলেও ইহারা আমাদিগকে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চাহিবে।"

ত্রেন্তিনর "প্লেবিসিট" লইবার কারণ উপস্থিত হয় নাই। কারণ অষ্ট্রিয়া লড়াইয়ে হারিয়া যাইবার ফলে এই প্রদেশটা আগাগোড়া ইতালির অন্তর্গত হইয়াছে। কিন্তু ত্রেন্তিনর ইতালিয়ানরা অষ্ট্রিয়ানদিগকে "আপনার লোক" বিবেচনা করিতেছে,—ইতালিয়ান স্বদেশ-সেবকরা ইহাদের চিন্তায় পর!

ইতালিতে বারকয়েক

ঘরকন্না ও খাওয়া-পরা

১

সপ্তাহে দুইবার করিয়া রাত্রিকালে "রেজিনা"য় ও "গ্রাণ্ড হোটেলে" সরকারী সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়। পাড়ার লোকজন, চাষী অচাষী, দেশী বিদেশী স্বাস্থ্যান্বেষী সকলেই হাজির হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলে বসিয়া "জলপানে"র অর্ডার দেওয়া দস্তুর। যাহাদের পয়সা নাই তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া শুনে।

ঘরে বসিয়াই "রেজিনা"র ময়দানের ব্যাণ্ড শুনিতেছি। হ্বাগ্নারও আছেন, রসিনি, পুচিনি ইত্যাদি ইতালিয়ান ওস্তাদদের সুরও বাজিতেছে।

বাড়ীওয়ালী এক মুন্‌সোফের পত্নী। স্বামী মারা গিয়াছেন কয়েক বৎসর হইল। রক্তে ইহারা জার্ম্মাণ (অষ্ট্রিয়ান)। দুই ছেলে "মানুষ" হইয়াছে। একজন ফার্ম্মেসির ওষুধ পত্র তৈয়ারী করিবার বিদ্যায় "দত্তরে" বা ডক্‌টর। আর একজন ব্যবসায়-কলেজে পাশ করিয়াছে। শীঘ্রই ইহাকে পল্টনে খাটিবার জন্য যাইতে হইবে, হ্বেরোণায় ইহার ডাক পড়িয়াছে। ইতালিতে "কন্‌স্ক্রিপ্‌শন" অর্থাৎ বাধ্যতামূলক সামরিক জীবনের বিধান প্রচলিত।

ইহাদের এক বোন রোমে ভাস্কর্য্য শিখিতেছে। মূর্ত্তি গড়ার কাজে ইহার হাতের ওস্তাদি উল্লেখযোগ্য। রোমে থাকা-খাওয়ার খরচ কিছু কিছু নিজে রোজগার করিয়া তোলাই তাঁহার অভ্যাস।

ভাইবোনেরা এক সঙ্গে গান বাজনা চালাইয়া থাকেন। নানা যন্ত্রেই হাত দেখিতেছি, পিয়ানো ত আছেই, ম্যাণ্ডোলিন, গিতার বেহালা ইত্যাদিও চলিতেছে। ৎসিথ্যার বাজাইতে পারেন না।

নিকটেই এক "আলবের্গয়" খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা গিয়াছে। কট্টর-স্বদেশী ইতালিয়ানরা "হোটেল" শব্দ ব্যবহার করে না। বিশেষতঃ ছোটখাট হোটেল রেষ্টরাণ্টকে খাঁটি স্বদেশী নামে চালানোই রীতি।

কুমড়ার ছেঁচ্‌কি খাওয়া গেল, বিলকুল ভারতীয় পোড়া পোড়া সোঁদা গন্ধে মাত্‌ আর কি! "আর্টি-চোক" এক প্রকার শব্জী। ভারতীয় জনসাধারণের মহলে বোধ হয় এ বীজ পরিচিত নয়, সিদ্ধ করিয়া খাইতে হয়, কদমের মতন গোলাকার ও ছোট বল বিশেষ। একটা একটা করিয়া পাতা বা পাপড়ি তুলিয়া তাহার গোড়াটা মাখনে বা তেলে ভিজাইয়া খাওয়া দস্তর। ইয়োরামেরিকার সকল দেশেই আর্টি-চোক এক সখের জিনিষ।

গ্রীষ্মকালের আর এক বিলাস "আস্পারাগাস"। লম্বা লম্বা ডাঁটা, গোড়াটা বাদ দিয়া আগাটা খাইতে হয়। আর্টি-চোকের মতনই সিদ্ধ করা চাই। অলিভ তেল বা মাখন মাখিয়া উদরস্থ করিতে লাগে বেশ; একটু আধটু নূনের ছিটা "অধিকন্তু ন দোষায়।"

২

গ্রাণ্ড হোটেলে জার্ম্মাণ মহিলাদের ভিড় দেখিতেছি। ড্যিসেল-ডোর্ফের এক নারী বলিতেছেন :—"বৎসরে একবার করিয়া দেড় দুই মাস লেহ্বিকোয় কাটাইয়া গেলে সারা বৎসর সুখে থাকা যায়,

জলটা খাইয়া বরদাস্ত করা আমার পক্ষে কঠিন। এই জন্য একমাত্র স্নান-'কুর' বা স্নান-চিকিৎসাই লইতেছি।"

বার্লিনে এক মহিলা টেনিসে ওস্তাদ, একদিন মাঠে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিলাম। মিষ্টি মুখের ব্যবস্থাও ছিল। মহিলা আজ এ পাহাড়ে কাল ও পাহাড়ে অটোমবিল-শফর করিতেছেন। প্রত্যেক শফরের খরচ প্রায় দেড়শ টাকা। লেহ্বিকোর এক মুচি জুতা তৈয়ারী করিতে নাকি পাকা। মহিলা বলিতেছেন :— "জার্ম্মাণিতে আজকাল ত্রিশ টাকার কমে এক এক জোড়া জুতা পাওয়া যায় না। আমি এখানে পনর বিশ টাকা হারে দশ জোড়া তৈয়ারী করাইয়া লইয়াছি।"

লুগোনো ও মাজ্জ্যরে হ্রদের সুনীল জলরাশি চোখের আনন্দ। লেহ্বিকোর পুকুর সদৃশ হ্রদটা নেহাৎ সঙ্কীর্ণ, চার ধারকার পাহাড়ের গায়ে ছোট খাটো যে সব পাইন গাছ খাড়া আছে তাহার ছায়ায় জল একদম সবুজ দেখাইতেছে। সবুজ হ্রদ দেখিয়া অবশ্য পেট ভরে না।

গরম পড়িয়াছে দস্তুর মতন; জুনের শেষ, তবুও সাগরে সাঁতার কাটার নেশা দেখিতেছি না কাহারও! ঘাটে বাইচের নৌকায় দুচার জন জলকেলি করিতেছেন মাত্র।

স্থানীয় এক ব্যক্তি বলিলেন :—জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে লেহ্বিকোয় আসল ঋতু; তখন ইংরেজ, জার্ম্মাণ, রুশ ইত্যাদি বিদেশীদের ধূম। ইতালিয়ান নরনারীও ঐ সময় আসিতে সুরু করে। এদেশে গ্রীষ্মের ছুটি জুলাই আগষ্ট এই দুই মাসের অনুষ্ঠান।

ইতালিতে বারকয়েক

পল্লী-চিত্র

স্নগানা-তালের প্রাকৃতিক আবেষ্টন অতি চমৎকার। চাঁদের আলোয় পাহাড়ের ন্যাড়া মাথাগুলা জঁাকিয়া উঠে। ময়দানের মাঝখানে দাঁড়াইলে সবুজ শস্যক্ষেত্রের উপর অপূর্ব্ব কান্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রেন্তা দরিয়ার বা ঝোরার মৃদু ঝরঝর্ কানের তৃপ্তি সাধন করে। পল্লী কিষাণদের মেটে-খোলার চালায় প্রকৃতি ঘুমের রাজ্য আমদানী করিয়া থাকে।

বিকালে রাখাল বালকেরা ঘাস পাতা হাতে করিয়া ছাগল তাড়াইতে তাড়াইতে ঘরে ফিরিতেছে। শুকনা ঘাসে বোঝাই গরুর গাড়ী হাঁকাইতে হাঁকাইতে চাষীরা পিঠ গুঁজিয়া মন্থর গতিতে চলিতেছে। বাঁকবাহী মেয়েরা জলের কলে জল তুলিতে আসিয়া "স্যালাড" শাক ধুইতে ধুইতে জটলা করিতেছে।

এক ছটাক জমিও অচষা পড়িয়া নাই। দুপুর বেলা আলুর ক্ষেতে মেয়ে পুরুষে তুতিয়ার জল ছিটাইয়া পাতাগুলাকে ব্যাধি হইতে বাঁচাইতেছে। অথবা ছেলেপুলেরা গাছের গোড়া খুঁড়িয়া মাটি নরম করিয়া রাখিতেছে। আল্‌ফাল্‌ফা ঘাসের জমিন গুলা বেশ জঁাকিয়া উঠিয়াছে। পাশেই হয় ভুট্টা না হয় যব বা আর কোনো শস্যের শীষ। পাহাড়ের গায়ে অথবা মাঠের ক্ষেতে আঙুর-চাষীরা তুতিয়ার জল ঘাড়ে করিয়া পিচ্‌কারীর সাহায্যে ছিটাইতে ছিটাইতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছে। কোথাও শীতের জন্য ঘাস শুকানো হইতেছে।

গরুগুলা দেখিতেছি সবই গাঁট্টা গোঁট্টা। আল্‌ফাল্‌ফা খাইতে

পায় বলিয়া উহারা দুধ দেয় বেশী। কিন্তু জার্ম্মাণ গাভীদের তুলনায় এই সব জানোয়ার অনেকটা দ্বিতীয় শ্রেণীর বোধ হইতেছে।

চাষীদের বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলে কোন্‌টা গোয়াল ঘর আর কোন্‌টা যে বসবাসের ঘর তাহা ঢুঁড়িয়া বাহির করা দরকার হইয়া পড়ে। গোবর, জঞ্জাল, চাষ আবাদের যন্ত্র-পাতি, ঘাস পাতা সবই উঠানে মজুত। তাহারই এপাশে ওপাশে অন্ধকারময় আবহাওয়ায় লোকজনের ঘর। অথবা নীচের তলায় গোয়াল আর উপর তলায় নরনারীর বাথান। ফুলের সখ, ফুল গাছের সখ সকলেরই আছে।

পল্লীতে প্রধান দৃশ্য নারীর কোলে ও পেটে ছেলে। আর তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে ডজন খানেক পুত্রকন্যা। মা ষষ্ঠীর কৃপা ইতালিয়ান সমাজে প্রচুর।

কোনো কোনো চেরী গাছে ফল ফলিয়াছে,—খাঁটি কালো জামের মতন। পাতাগুলাও প্রায় জাম পাতারই মতন। সাধারণতঃ কিন্তু চেরী লালে লাল। এক গৃহস্থের ঘরে সাদা চেরীও খাইলাম।

রেশমকীটের লালন পালন দেখা গেল। তুঁতের পাতা খাইয়া পোকাগুলা কুম্ভকর্ণের মতন ঘুমাইয়া রহিয়াছে। কয়েকদিন পরেই নাকি জাগিবে। জাগিবার পরই রেশম সৃষ্টির পালা। সেই পালাও দেখা গেল।

পল্লীপথের মোড়ে মোড়ে হয় যীশুমূর্ত্তি কাঠে ঝুলিতেছে, না হয় ছোট পাথরের কামরায় মা মেরী, সাধু আন্তনিয়ো অথবা অন্য

কোনো সাধু-সাধ্বীর চিত্র। সন্ধ্যাকালে নরনারীরা প্রদীপ জ্বালিতে আসে। ফুল পরাইবার রেওয়াজও আছে।

পাখী পোষার সখ বড় একটা দেখিতেছি না। কাষ্টানিয়েন (এক প্রকার বাদাম) ও লিণ্ডেন গাছে ফিঞ্চ পাখীর ডাক শুনিতেছি মাত্র। চাষীরা ছিপে মাছ ধরিতেও বড় বেশী পছন্দ করে বলিয়া মনে হয় না। লেহ্বিকো হ্রদের মাছ খাইয়া "জাতও গেল পেটও ভরল না।" কেননা কিছুকাল "নিরামিষ" চালান যাইতেছে।

টুরিস্টদের ধরণ-ধারণ

১

"আল্‌বের্গ"র সহভোজীদের মধ্যে বোলোনিয়ার এক ইতালিয়ান মহিলা সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম—কবি দান্নুন্‌ৎসিঅ সম্প্রতি এক কাগজে সংবাদ দিয়াছেন যে তিনি এখন হইতে আর 'বাজে কাজে' সময় নষ্ট করিবেন না। আবার সাহিত্য-সাধনায় ফিরিয়া আসিবেন।

দান্নুন্‌ৎসিঅর বাণী এই:—পূর্ব্বে আমি যেমনটি ছিলাম তেমনটী আবার হইব,—অর্থাৎ অদ্বিতীয় শিল্পী। মহিলার টিপ্পনী:—"ইহার নাম গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। যেন দান্নুন্‌ৎসিঅকে ইতালিয়ানেরা কোনো দিন কোনো এক মহাদিগ্‌গজ বিবেচনা করিত!"

হ্বেনিসের এক ইতালিয়ান মহিলা বলিতেছেন:—"হ্বেনিসের

সরকারী বাগানে বিপুল শিল্পপ্রদর্শনী বসিয়াছে। ফরাসী, স্পেনিষ, ওলন্দাজ, ইংরেজ, মার্কিন, হাঙ্গারিয়ান, রুশ, জার্ম্মাণ এবং এমন কি জাপানী চিত্রকরদের কাজও মেলায় দেখিতে পাইলাম। এই ধরণের আন্তর্জ্জাতিক মেলা ভেনিসে প্রতি বৎসরই অনুষ্ঠিত হয়।"

এক ব্যাহ্বেরিয়ান নারী বলিলেন:—"আমিও দেখিয়া আসিয়াছি। কিন্তু প্রধানতঃ অতি-মাত্রায় আধুনিক-পন্থী শিল্পের বাজারই সেখানে বসিয়াছে দেখিলাম। জার্ম্মাণেরা বোধ হয় লড়াইয়ের পর এই প্রথম ইতালিতে মাল পাঠাইয়াছে। অধিকন্তু জার্ম্মানির এক মিউনিক ছাড়া অন্য কোনো অঞ্চলের শিল্প এই মেলায় আসে নাই।"

এক মহিলা মিউনিকের প্রসিদ্ধ চিত্রকর হ্বিলি টীডয়েনের পত্নী। নিজেও ছবি আঁকিয়া থাকেন। টীড্য়েন আজকালকার জার্ম্মাণ বাজারে জানোয়ার আঁকার শিল্পে যশস্বী। তাঁহার আঁকা ছবি দেশ বিদেশে,—উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকায়ও বিক্রী হইয়া থাকে। প্রকৃতি-নিষ্ঠা টীড্য়েনের কাজের বিশেষত্ব। "চিড়িয়াখানা" সাজাইবার জন্য তাঁহার ছবিগুলা কাজে লাগে। যথাসম্ভব নিখুঁত-ভাবে ভেড়া, গরু, ঘোড়া, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি আঁকিবার দিকে টীড্য়েনের ঝোঁক। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের পশুপক্ষীর রূপরঙের বৈচিত্র্য রক্ষা করিবার জন্য আজ ইনি হল্যাণ্ডে, কাল পোল্যাণ্ডে, পরশু আর কোথাও ডেরা গাড়িয়া থাকেন।

ইতালিতে বারকয়েক

২

পাশের "আল্‌বের্গ"য় ডিয়েক্‌র্স নামক একজন প্রায় "পঁচাত্তর বৎসর বয়সের যুবা" জার্ম্মাণ সপত্নীক বসবাস করিতেছেন। জার্ম্মাণ সরকার উঁহাকে পূর্ব্বে বড় বড় রাজনৈতিক কাজে দেশ বিদেশে মোতায়েন রাখিত। মিশর, তুরস্ক, আলজিরিয়া, মরক্কো ইত্যাদি দেশের মুসলমান সমাজের অলিগলি ডিয়েক্‌র্সের "নখদর্পণে" বিরাজ করিতেছে। স্পেন দেশে মুসলমান প্রভাব এবং স্পেনের অন্যান্য কথা আলোচনা করিয়া ইনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আরবি, ফার্সী ছাড়া গণ্ডা দেড়েক ভাষায় ডিয়েক্‌র্সের দখল অসীম।

ডিয়েক্‌র্সের পত্নীর বয়স হইবে প্রায় ষাট বৎসর। স্বামীর সমানই এই মহিলার খাটিবার ক্ষমতা। কয়েকটি বাক্স খুলিয়া ইনি বলিতে লাগিলেন:—"এই দেখুন লেহ্বিকোয় আমার কাজ। আমরা প্রতিদিনই এপাহাড়ে ওপাহাড়ে ও পল্লীতে পল্লীতে ঘুরাফেরা করিয়া কাটাইয়াছি। তাহার সাক্ষী এই সব।"

দেখিলাম কাঠের পাতলা তক্তার উপর অথবা ক্যাম্বিশের উপর অতি উৎকৃষ্ট প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকা রহিয়াছে। পাহাড় গুলা একটার ঘাড়ে আর একটা চড়িয়া উঁকি মারিতেছে। লিণ্ডেনের লিণ্ডেনের আবহাওয়ায় কোনো পল্লী ভরা রহিয়াছে। কোনো পাহাড়ের বুকে পাইনের ছুঁচোল শোভা বিরাজ করিতেছে। ময়দানের উপর দিয়া সাদা সরু সড়ক আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, মন্দিরের চূড়া আশে পাশের খোলার চালাগুলাকে তদ্‌বির

করিতেছে। কোথাও সূর্য্যোদয়, কোথাও সূর্য্যাস্ত, কোথাও পাহাড়ী বনের সঙ্গে হ্রদের লুকোচুরি।

এইসব দেখিতেছি আর ভাবিতেছি আমাদের দেশের চিত্র-শিল্পীরা ছবি আঁকা কাহাকে বলে এখনো জানেন কি না সন্দেহ। বাহ্য জগতের রূপ, লাবণ্য এবং রংএর গরিমা তাঁহাদের চোখের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করা চলে না। সাগরের কিনারা, দরিয়ার ধার, ঝরণার নর্ত্তন, পাহাড়ের মহিমা, বনের নিবিড় শান্তি, আটচালার গৃহস্থজীবন, নগরের কোলাহল,—এইসব জিনিষ রঙে লেপিতে পারা অতি বাহাদুরির কথা। এই কাজে জিনিষগুলো নিখুঁতভাবে দেখিবার ক্ষমতা ত চাইই,—তাহার উপর চাই প্রকৃতিকে বাড়াইয়া-কমাইয়া কাটিয়া-ছাঁটিয়া চিত্রপটটাকে মোলায়েম ভাবে সকল অংশে ভরিয়া রাখিবার দক্ষতা। সেই চোখ এবং সেই দক্ষতা ভারতে বিরল।

লড়াইয়ের চিহ্নোৎ ও ফলাফল

১

একটা পাহাড়ের গায়ে দেখিলাম ঘরবাড়ীগুলা ভাঙা-চুরা। স্থানীয় সঙ্গীরা বলিলেন :—"লড়াইয়ের চিহ্ন। ঐ দেখুন আঙুরের ক্ষেতগুলা এই পাঁচ বৎসরেও পুনরায় জাঁকিয়া উঠিতে পারে নাই। লতাগুলা একদম লোপাট হইয়া গিয়াছিল। চাষীরা গোড়া পত্তন হইতে সুরু করিতে বাধ্য হইয়াছে।"

লেহ্বিকো ছিল লড়াইয়ের বড় কেন্দ্র। এইখান হইতে অষ্ট্রিয়ান

পণ্টন দক্ষিণ ইতালির উপর হামলা চালাইয়াছিল। রেজিনা হোটেলটাই ছিল সেনাপতির আড্ডা।

অনতিদূরে রোন্‌চেনিঅ পল্লী। এই গ্রামের ঝরণায়ও যে জল পাওয়া যায় তাহা লইয়া পান "কুর" এবং স্নান-"কুর" চলে। বহু স্বাস্থ্যান্বেষীর সমাগম হইয়া থাকে। এখানকার বড় হোটেলের পাইন বাগানে একদিন কাটানো গেল।

রোণচেনিঅ'র অন্যান্য "আল্‌বর্গে"য় দরদস্তর করিতে গিয়া দেখিলাম ঘরগুলা লড়াইয়ের দাগ বহন করিতেছে। একজন কর্ম্মকর্ত্তা বলিলেন :—"এই পল্লীর একটা বাড়ীও খাড়া থাকিতে পারে নাই। আজ এখানে যাহা কিছু দেখিতেছেন সবই হয় নয়া-গড়া না হয় মেরামতের ফল।"

লড়াই সুরু হইবা মাত্র অষ্ট্রিয়ান গবর্ণমেণ্ট শুগানা-তালের সকল ইতালিয়ান-ভাষী কিষাণকে ত্রেন্তিন প্রদেশ হইতে বোহিমিয়া প্রদেশে চালান করিয়াছিল। রোণচেনিঅর এক বর্দ্ধিষ্ণু কিষাণ বলিল :—"ভিটামাটি ছাড়িয়া কপর্দ্দকহীন ভাবে এক দূর বিদেশে আস্তানা গাড়া কিরূপ, ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেহ তাহা বুঝিবে না।"

এই পরিবারের এক ছেলে আর্জেন্টিনায় রহিয়াছে,—আর এক ছেলে নিউইয়র্ক প্রদেশে ফল বেচার কাজে বাহাল আছে। স্বামী স্ত্রী দুই জনেই বহুকাল আর্জেন্টিনায় ছিল। স্পেনিষ ও ফরাসী ভাষায় কথা বলিতে পারে।

ত্রেন্তিন প্রদেশের কিষাণ মহলে আমেরিকা-ফেরৎ নরনারী প্রায়ই চোখে পড়িতেছে। এক ব্যক্তি লোহার কারখানায় কাজ

করিত। আর এক ব্যক্তি সঙ্গীতের ব্যাণ্ড চালাইত। একজন সেদেশে চাষ আবাদও চালাইয়াছে।

ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্র আজকাল কড়া আইন জারি করিয়াছে। জাপানী, চীনা ও ভারতবাসীর বিরুদ্ধে যেমন, ইতালিয়ানদের বিরুদ্ধেও তেমনি কঠোর। ইতালিয়ানেরা দক্ষিণ আমেরিকার দিকে ভিড়িতেছে।

কয়েকজন ইতালিয়ান যুবা লাম্বারোণে পাহাড় হইতে নামিয়া লেহ্বিকোয় ফুর্ত্তি করিয়া গেল। ইহাদের নিকট শুনিলাম,—যুদ্ধের ফলে যে সব বাড়ীঘর নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সেই সব এক ইতালিয়ান কোম্পানী পুনরায় তৈয়ারি করিয়া ফেলিয়াছে। পুরাণো বাসিন্দারা আবার নিজ নিজ বাস্তু ভিটায় ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এজন্য ইহারা কোম্পানীকে কত মূল্য দিতে বাধ্য তাহার ব্যবস্থা করা হয় নাই। গবর্মেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া গৃহস্থদের স্বার্থ রক্ষা করিতেছে।

যুবারা সার্ভেয়ার বা এঞ্জিনিয়ার,—রোম হইতে এখানকার ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিবার খরচ পত্র করিয়া দেখিবার জন্য ইহাদিগকে পাঠানো হইয়াছে। ইহাদের রিপোর্ট পাইলে গবর্মেণ্ট কোম্পানীর সঙ্গে দরদস্তুর করিবে।

লেহ্বিকোর আশে পাশে পাহাড়ের ডগায় ডগায় সেকালের অষ্ট্রিয়ান দুর্গ গণ্ডা গণ্ডা। কোনো কোনো ইমারৎ পাহাড়েরই যেন কোন এক অংশ মাত্র দেখায়।

২

কয়েকজন স্থানীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে হ্রদের ঘাটে আলাপ হইল। ইহারা বলিতেছেন:—"মহাশয়, হোটেল চালানো কি গবর্মেণ্টের

কাজ ? আগে অষ্ট্রিয়ার আমলে লেহ্বিকোর বাগ্নি বা স্নানাগার-গুলা ছিল বার্লিনের এক ব্যবসায়ী-কোম্পানীর হাতে। সেই কোম্পানী টাকা খরচ করিয়া বিজ্ঞাপন দিত। বিলাত হইতে, রুশিয়া হইতে, জার্ম্মাণি হইতে, আমেরিকা হইতে স্বাস্থ্যান্বেষীরা দলে দলে আসিত।

"আর ইতালির আমলে পৌরশাসন-কর্ত্তারা প্রতিষ্ঠানগুলা চালাইবার ভার লইয়াছে। এই বৎসর মাত্র দেড় লাখ লিয়ার (অর্থাৎ প্রায় বাইশ হাজার টাকা) বিজ্ঞাপনে খরচ হইয়াছে। অন্ততঃ এক লাখ টাকা খরচ করিলে তবে লেহ্বিকোর মতন জগতের একমেবাদ্বিতীয়ং স্বাস্থ্য-নিবাসের উপযুক্ত বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্ভব। কিন্তু অত টাকা খরচ করা পার্লমেণ্টের পক্ষে অসাধ্য।"

সরকারী ঘরবাড়ীগুলার ভিতর বাহির দুই-ই দেখিয়া সন্তুষ্ট হওয়া যায়। পৌর ভবন "মুনিচিপিও" নেহাৎ নিন্দনীয় নয়। হাসপাতালটা ছোট হইলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রেণ্টগেন আলোর যন্ত্রপাতিও আছে। বিদেশী রোগীরা রোজ পাঁচ টাকা দিলে এখানে থাকিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পায়। খাওয়া খরচ আলাদা দিতে হয় না।

শিশু-ভবন

"আজিলো ইন্ফান্তিলে" (শিশু-ভবন) একটা কিণ্ডারগার্টেন ইস্কুল। চার জন "সিষ্টার" (বা ভগ্নী) শিক্ষকতা করিয়া থাকেন। বাহির হইতে একজন ইতালিয়ান শিক্ষয়িত্রীকে আনাইয়া ইহাঁরা আমাকে ইস্কুল বিষয়ক খবরাখবর দিলেন। ইহাঁরা

নিজে ইতালিয়ান ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানেন না। বাহিরের শিক্ষয়িত্রী জার্ম্মাণে দোভাষীর কাজ করিলেন।

প্রায় দেড়শ বালক বালিকা দেখিলাম। তিন হইতে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত ইহাদের বয়স। "লেখাপড়া" এই আজিলোয় শিখানো হয় না। ছয় বৎসরে পড়িবা মাত্র ত্রেন্তিনোর বালক বালিকারা যে পাঠশালায় যাইতে বাধ্য সেখানে হাতে খড়ির ব্যবস্থা।

আজিলোর ঘর গুলা নিরেট ও স্বাস্থ্যজনক। শিশুরা সিজিল মিছিল চলাফেরা করিতে শিখিতেছে। সিষ্টাররা গান শিখাইতেছেন, ছবি দেখাইয়া বস্তুজ্ঞান জন্মাইতেছেন। সকাল ৮টা হইতে বিকাল ৫টা পর্য্যন্ত শিশুরা আজিলোয় কাটাইতে অভ্যস্ত। ধনী দরিদ্র সকল পরিবারের ছেলে পুলেরাই এখানে। খালি পায়ে অথবা মোজাহীন ভাবে কাহাকেও দেখিলাম না। কিন্তু পথে ঘাটে যে সব কিষাণ ছেলেদের সঙ্গে দেখা হয় তাহাদের পায়ে সাধারণতঃ মোজাজামা দেখি না।

দুপুর বেলা শিশুরা আজিলোয় খাইতে পায়। দুধ, শাকশব্জীর ঝোল ইত্যাদি খাবার জুটে। এই জন্য দিতে হয় মাসে বার আনা। তাহা ছাড়া স্কুলের বেতন হিসাবে মাসে লাগে দুই আনা। অর্থাৎ প্রতি মাসে চৌদ্দ আনা পয়সা খরচ করিয়া প্রত্যেক পরিবার নিজ নিজ শিশু সন্তানকে রোজ নয় ঘণ্টার জন্য প্রাসাদতুল্য ইমারতে উপযুক্ত অভিভাবকের জিম্মার রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকে।

ইস্কুলের খরচ উঠে কোথা হইতে? পৌরসভা হইতে আসে বার্ষিক প্রায় তিন হাজার টাকা। তাহা ছাড়া পল্লীবাসীরা

মরিবার সময় দান খয়রাত করিতে অভ্যস্ত। লোকজনের নিকট হইতে চাঁদা বা এককালীন দানও তোলা হইয়া থাকে।

অষ্ট্রিয়ান আমলে ত্রেন্তিনয় বাধ্যতামূলক শিক্ষাবিধান জারি ছিল। সেই বিধান ইতালিয়ান আমলেও চলিতেছে। কিন্তু আসল ইতালিতে সার্ব্বজনিক শিক্ষাবিধান প্রচলিত ছিল না। মাত্র দুই বৎসর হইল শিক্ষাসচিব জেন্তিলের প্রভাবে এই নিয়ম জারি হইয়াছে। কাজেই ইতালিয়ান সমাজে নিরক্ষর নরনারীর সংখ্যা অনেক।

এক মাতব্বর

তিনজন চাষী প্রকাণ্ড চুপড়ী ঘাড়ে করিয়া ক্ষেতের নিকটবর্ত্তী এক গলির মাথায় খাড়া। চুপড়ীর ভিতর দেখিতেছি সোনালী রেশমের দানা। এক ব্যক্তি হাত মুখ নাড়িয়া আবেগময়ী ভাষায় গলা ফাটাইয়া বক্তৃতা করিতেছেন। ইনি সুপরিচিত গারোলো বাবু। দিনে দশবার ই হার সঙ্গে,—যেখানেই যাই,—দেখা হইবেই হইবে।

দেখা হইবামাত্র চাষীদিগকে বিদায় দিয়া গারোলো বাবু হাত বাড়াইয়া সজোরে করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন:—"ব্যন জ্যর্ণ, সিনিয়র। এদের সঙ্গে এতক্ষণ ঘণ্টা খানেক ধরিয়া কি বকিতেছিলাম জানেন? বলিতেছিলাম,—আরে মুখ্খু, তোরা পোলু পুষিয়া রেশমের দানাগুলা পাইয়াই সন্তুষ্ট আছিস্ কেন? ঐ দ্যাখ ব্রেন্তার জল বহিয়া যাইতেছে। মাঠের ঐ কোণে লেহ্বিকোর চাষীরা মিলিয়া একটা রেশমের ফ্যাক্টরী খাড়া করনা কেন। অমুক অমুক চাষীরা এইরূপ করিতেছে। ইত্যাদি।"

ইতালিতে বারকয়েক

গারোলোর মাথায় সর্ব্বদাই একটা না একটা খেয়াল চাপিয়াই আছে। একদিন শুনিলাম,—"জানেন, আমি পৌরসভায় কি করিয়াছি? রেজিনা হইতে গ্র্যাণ্ড হোটেল পর্য্যন্ত একটা সান্ধ্য-ভ্রমণের সড়ক কায়েম করিতে হইবে। কাষ্টানিয়েন গাছের ছায়ায় যাহাতে দিবাভাগেও বনের সুখ পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করা চাই। লেহ্বিকোকে সুশ্রী করিয়া ছাড়িতেই হইবে।"

আর একদিন সরকারী বাগিচার সম্মুখ দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে গারোলো বলিলেন ঃ—"বলুন ত এই বাগিচায় কোন্ জিনিষের অভাব? ঠিক মধ্যস্থলে চাই এক মর্ম্মরমূর্ত্তি। কার? লেহ্বিকোয় যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম বাঞি বা স্নানাগারের ব্যবস্থা করে সেই দূরদর্শী আভাসানির।"

লেহ্বিকোয় একজন খাঁটি পল্লীসেবকের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। গারোলোর পয়সার অভাব নাই। পূর্ব্বে ছিলেন ডাকঘরের কর্ম্মচারী,—এক্ষণে পেনশ্যন্ ভোগ করিতেছেন। অধিকন্তু দুই চার খানা ভাড়াটে বাড়ী হইতেও আমদানি হয় কিছু কিছু। গারোলোর মুখে প্রায়ই শুনি—"আমার মত এই,—যে ব্যক্তি লেহ্বিকোর জন্য খাটিতেছে সে রোমেরই সেবক।"

জুলাই মাসের গরম

১

জুলাই মাস পড়িয়াছে। আঙ্গুরের ফল গজাইতেছে,—বড় হইবে, পাকিবে তিন মাস ধরিয়া। শুনিলাম, লেহ্বিকো অঞ্চলের দ্রাক্ষাফল সত্য সত্যই খাট্টা। ত্রেন্তোর আঙ্গুর নাকি নামজাদা।

ইতালিতে বারকয়েক

ফলের বাগান এই জনপদের অন্যতম সম্পদ। আপেল ফলিতেছে,—এখনো গাছে গাছে কচি মাত্র। আপেল আমাদের নাসপাতি।

পেয়ারাগুলা দেখিতে ঠিক আমাদের পেয়ারার মতন। বাজারে এখনো পাওয়া যায় না। বাগানে বাগানে বেড়াইতে গিয়া গাছ হইতে দু'একটা চুরি করিয়া খাইতে আপত্তি নাই। তবে সম্প্রতি অবশ্য কাঁচা ও ডাঁসা মাত্র।

পীচ্ এখনই বাজারে উঠিয়াছে। পীচের গন্ধে 'নন্দিত' হইয়া জাপানের পাইন বনে ঝরণার গান শুনিতাম। তখন হইতে পীচের নেশা পাইয়া বসিয়াছে। ত্রেন্তিনের পীচ খাইয়াও আত্মিক তৃপ্তি কম পাইলাম না।

কাষ্টানিয়েন বনের দশ বিঘা পাহাড়ী জমিতে এক কিষাণ পরিবার ঘরকন্না করে। হাঁস, মুর্গী, বিড়াল, হরেক রকম জানোয়ারই দেখিলাম ইহাদের আওতায় বন্ধুভাবে বসবাস করিতেছে। যথা কুকুরের লেজ চাটিতেছে বিড়াল। মুর্গীর ঘাড়ে চড়িতেছে হাঁস ইত্যাদি।

মৌমাছির চাষ দেখা গেল। যে ফুলবাগানে মৌমাছি মধু লুটে সেই ফুলবাগানও কিষাণেরই তৈয়ারি। মধু খাইয়া বুঝিলাম, —ঠিক যেন জমাট বাঁধা দানায় ভরা মিঠা ক্ষীর মুখের ভিতর চলাফেরা করিতেছে।

রেশম পোষার ব্যবসাও আছে। শুনিলাম প্রায় দেড় হাজার মন রেশম এক লেভিকোতেই উৎপন্ন হয়। সের প্রতি চাষীরা প্রায় দশ টাকা।

স্ত্রীপুত্রসহ চাষী খাটে রোজ সকাল হইতে রাত নয় দশটা পর্য্যন্ত। আঠার ঘণ্টায় রোজ। সঙ্গে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন এক ইতালিয়ান পরিবার। ইঁহারা বলিলেন—"পরের জন্য গতর খাটাইতে হইলে ইহারাই দাবী করে মাত্র আট ঘণ্টার রোজ। আপন আর পরের কাজে এই তফাৎ !"

২

ভূদেব মুখোপাধ্যায় শাস্ত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন,—"গ্রীষ্মকালে দিবানিদ্রা প্রশস্ত।" ইচ্ছা থাকিলেও অনেক সময়ে শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে না।

ভূদেবের পাঁজি কি একমাত্র ভারতের জন্যই রচিত হইয়াছিল ? না ইয়োরোপের পক্ষেও এই শাস্ত্রই খাটে ? "সামাজিক (অথবা পারিবারিক" ?) প্রবন্ধে" বোধ হয় তাহা খোলসা করিয়া বলা হয় নাই। যাহা হউক,—ইয়াঙ্কিস্থানে দেখিয়াছি মার্কিন নরনারীরা গ্রীষ্মে পেট ভরিয়া ঘুমায়। জার্ম্মাণরাও গ্রীষ্ম শাস্ত্রের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতেই অভ্যস্ত।

আর লেহ্বিকোয় ত "কামের মধ্যে দুই,—খাই আর শুই"। জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান, স্বাস্থ্যান্বেষী, "নেটিভ্" সকলেই শাস্ত্রের ইজ্জদ রক্ষা করিতেছে। মাঠে মাঠে দেখি চাষীরাও ঘাস শুকাইতে দিয়া অথবা আলু-আঙ্গুরের পাতায় তুঁতিয়ার ফল ছিটাইবার ফাঁকে ফাঁকে আপেল তলায় বা বাদাম তলায় পড়িয়া ঘুম মারিতেছে।

কাজেই আর কি শাস্ত্র লঙ্ঘন করা সাজে ? মাঝে মাঝে, নেহাৎ

ইতালিতে বারকয়েক

ভাল ছেলে সাজিবার ঝোঁক না চাপিলে,—লিণ্ডেন তলায় বা ঘরেই গ্রীষ্মধর্ম্ম পালন করা যাইতেছে।

লেহ্বিকোয় পাওয়া যায় ভারতপ্রসিদ্ধ সবই। মায় সাপ পর্য্যন্ত। ঘাটের ধারে বেড়াইতে যাইতেছি এমন সময়ে দেখি তুইটা প্রকাণ্ড লম্বা সাপের লাশ বাঁধের উপর পড়িয়া রহিয়াছে! গারোলা বলিলেন—"ভয় পাবেন না মশায়। অমন সাপ ডজন ডজন হ্রদের কিনারায় ঝোপের ভিতর ঘর করিয়া থাকে। ও সাপের বিষ নাই।"

তাই সই! কিন্তু গ্রাণ্ড হোটেলের অনতিদূরে পাথরের পাহাড়ী গলি দিয়া হাঁটিতেছি। বেশ গরম দিন। তুই দিকেই আঙ্গুরের ক্ষেত। সম্মুখেই দেখি একটা কালো ছোট্ট কি একটা পাথরের ভিতর হইতে ফণা তুলিয়া রহিয়াছে। ত্রাহি মধুসূদন!

ইয়াঙ্কি-ইতালিয়ান ব্যাণ্ড-বাদক শুনিয়া বলিলেন—"আঙ্গুরের ক্ষেতের কালো বেঁটে সাপ? সাবধান। ওগুলা ভয়ঙ্কর জীব।" বলিলাম—"আজ্ঞে, তা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না।"

ডাক্তারের সঙ্গে গল্প-গুজব

ডাক্তার স্ক্রিন্‌ৎসি সরকারী হাসপাতালের কর্ত্তা। নিজে অস্ত্র-চিকিৎসক। ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"ইতালিয়ান গবর্ণমেণ্ট পচা জল ছেঁচিয়া দেশকে নাকি অনেকটা ম্যালেরিয়া-মুক্ত করিতে পারিয়াছে। ঐ সম্বন্ধে কাগজ পত্র এইখানে কোথাও পাওয়া যাইবে কি?"

স্ক্রিন্‌ৎসি বলিলেন—"ত্রেন্তিন এতদিন ছিল অষ্ট্রিয়ার এক

প্রদেশ। এখানে ম্যালেরিয়া নাই। ইতালিতে যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহার খবর জুটিবে রোমে। চিকিৎসাধ্যাপক গ্রাসি এই দিকে অনেক কাজ করিয়াছেন। ইতালিয়ান স্বাস্থ্যোন্নতি-প্রয়াসের সকল বৃত্তান্ত গ্রাসির নিকট পাওয়া যাইবে। গ্রাসি সেনেটেরও সভ্য।"

লেহ্বিকোর জল সম্বন্ধে স্কিনৎসি বলিতেছেন—"ম্যালেরিয়ায় ভোগা দুই প্রকার। প্রথমতঃ জ্বরে পড়িয়া থাকা। তাহার প্রধান ওষুধ আজ পর্য্যন্ত কুইনাইন ছাড়া অন্য কিছু আবিষ্কৃত হয় নাই। আর্সেনিকও কিছু কিছু ব্যবহৃত হয়। লেহ্বিকোর জলে আর্সেনিক আছে বলিয়া ব্যবহার করা চলে। কিন্তু ম্যালেরিয়ায় আসল বিপদ এই যে, জ্বর সারিয়া যাইবার পরও শারীরিক গ্লানি, দুর্ব্বলতা এবং অস্বাস্থ্য কোন মতেই ছাড়ে না। রক্ত আগাগোড়া দূষিত হইয়া যায়। তাহার ফলে মানুষ এক প্রকার আধমরা ভাবে জীবন ধারণ করে। এই রক্তদোষ, আধমরা ভাব, এবং নিত্য নৈমিত্তিক রুগ্নতা সারিবার পক্ষে লেহ্বিকোর জল যারপর নাই ফলপ্রদ। ইহাতে লোহা আর আর্সেনিক দুইই এমন ভাবে মিশিয়া রহিয়াছে যে রক্তের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। অথচ সাধারণতঃ লৌহময় ওষুধ ব্যবহার করিলে হজম করার শক্তি সম্বন্ধে যে সকল অসুবিধা জুটে এই জলে তাহা অসম্ভব। যাহাদের পক্ষে প্রথম প্রথম পান-চিকিৎসা অসহ্য তাহারা স্নান-চিকিৎসা হইতে সুরু করিতে পারে। কিন্তু নরম জলটা পান করিয়া বরদাস্ত করা প্রায় সকল রোগীর পক্ষেই সুসাধ্য।"

ইতালিতে বারকয়েক

ইতালিয়ান পালা-পার্ব্বণ

১

ইতালিয়ান শিশু এবং বালক বালিকারা জার্ম্মাণ শিশু এবং বালক বালিকাদের মতন হৃষ্টপুষ্ট ও সুস্থ সবল নয়। ইহারা জন্মেও নেহাৎ ক্ষুদ্র জীব ভাবে। রাস্তায় ঘাটে মায়ের কোলে কোলে যে সব বাচ্চা দেখিতেছি তাহাদিগকে ভারতীয় নবজাত শিশুর দোসর বিবেচনা করা অতি সহজ।

শিশুদের ভিতর সুন্দর চেহারা দুই চারটা চোখে পড়ে। কিন্তু বড় হইবামাত্র ইহাদের রূপ যেন শ্রী হারাইতে থাকে। ইতালিয়ান বাপ-মাদের চেহারায় গড়নের সৌন্দর্য্য একেবারে বিরল। ইতালিয়ানদের সঙ্গে বনিবনাও মেলমেশ বেশ হইয়া গিয়াছে। চাষী বাবু সকল সমাজের "সিনিয়র" "সিনিয়রা"গণ রাস্তায় দেখা হইলে "ব্যন জ্যর্ণ," "ব্যনা সেরা" ইত্যাদি সকাল বিকালের অভিবাদন জানায়। ছেলে পুলেদের ত কথাই নাই। দল বাঁধিয়া ঘিরিয়া দাঁড়ায়। এমন কি শিশুরাও মায়ের কোল হইতে হাসিয়া হাত নাড়িয়া কুটুম্বিতা করে। মজার কথা,—ইতালিয়ান শব্দ আজ পর্য্যন্ত একটাও রপ্ত হয় নাই। লোকজনও ইতালিয়ান ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানে না!

ক্যাথলিকদের "বার মাসে তের পার্ব্বণ।" একদিন একটা বড় গোছের সমারোহ দেখিলাম। মনে হইল যেন গোটা

লেহ্বিকোর সাত হাজার স্ত্রীপুরুষই বুঝি গির্জ্জার আবহাওয়ায় হাজির।

বিপুল শোভাযাত্রা—"নগর-সঙ্কীর্ত্তন,"—গান হইল না, যদিও সঙ্গীত ছিল। নিশান উড়িতেছে। পুরোহিতরা যীশুহৃদয় বহিতেছে। সামিয়ানার চলন চলিতেছে। একেবারে মদনমোহনের মিছিল!

পালাপার্ব্বণ ছাড়া রোজই ছোট খাটো তিথি অনুষ্ঠিত হয়। আজ অমুক সাধুর দিন, কাল অমুক ঋষির দিন ইত্যাদি কথা ক্যাথলিক মহলে সুপরিচিত। পঞ্জিকার ভিতর দেবদেবী সাধু-সন্তদের উপলক্ষ্যে প্রত্যেক দিনই একটা না একটা পূজার উল্লেখ দেখিতে পাই।

লেহ্বিকোর লোকেরা হিন্দুদের মতন এই সব দৈনিক তিথিগুলা "সংক্ষেপে সারিতেই" অভ্যস্ত। অর্থাৎ রোজ রোজ গির্জ্জায় যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু রবিবারে বোধ হয় আবালবৃদ্ধ বনিতা কেহই গির্জ্জা বাদ দেয় না। গির্জ্জার ভিতর একদিকে বসে পুরুষ, অপরদিকে স্ত্রী। ভোর হইতে বারটা পর্য্যন্ত পাঁচ ছয় ঘণ্টা গির্জ্জায় লোকে লোকারণ্য।

চাষী বাবু সকলেই রবিবার "ফর্সা" অথবা নয়া "পোষাকী" পোষাক পরিতে অভ্যস্ত। ইহা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কি না বলিতে পারি না। কিন্তু সপ্তাহে অন্ততঃ একটা দিন সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাপড় চোপড় ব্যবহার করিতে বাধ্য থাকা শারীরিক ও আত্মিক হিসাবে বিশেষ মূল্যবান বিবেচনা করি।

মামুলি ডালভাত খাওয়ার একঘেয়ে ঘূর্ণিপাকের মধ্যে মাঝে মাঝে "মুখ বদলাইবার" ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। পরিবর্ত্তনগুলা

ইতালিতে বারকয়েক

মানুষ মাত্রেরই চিত্তের উন্নতি বিধান করে। পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও মাঝে মাঝে নিয়ম বদলানো অত্যাবশ্যক। পালা-পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে সাজিয়া গুজিয়া বাহির হইতে পারা শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক। জীবন চায় রকমারি রূপ-রসের স্বাদ। বৈচিত্র্য রাখিতে না পারিলে আত্মা বাড়িতে পারে না। ধনী দরিদ্র সকলের পক্ষেই এই আধ্যাত্মিক নিয়ম মানিয়া চলা সম্ভব।

সপ্তম অধ্যায়

'ত্রেন্তিন'য় পাহাড় দেখা

সুগানা উপত্যকায় ওঠা-নামা

১

সুগানা উপত্যকায় আসিয়াছিলাম রেলে,—ত্রেন্ত হইতে পূর্ব্বদিকে। লেভিকো পর্য্যন্ত বিশ পঁচিশ মাইলে চড়াই উঠিতে হইয়াছিল,—মাত্র প্রায় নয় শ ফিট।

সেই পথই আবার দেখিলাম খোলা অটোমোবিলে। এই দেখায় আর রেলে দেখায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য। মাথাটা যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বাধীন ভাবে আসমানের তলে খাড়া হইতে না পায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধরাতলের সম্পদ প্রায় অনধিকৃত থাকে।

আবার পায়দলেও সেই সুগানা "তালের" উঠা-নামার সঙ্গে উঠিলাম নামিলাম। এই উৎরাই-চড়াইয়ের কিম্মৎ লাখ টাকা। প্রকৃতির গতি-বিধির সঙ্গে মাংসপেশীর যোগাযোগ যেই হইল তখনই বুঝিলাম দুনিয়াখানা একটা বিপুল ইমারত। এই বিপুল বাস্তুর গড়ন-বৈচিত্র্যই একসঙ্গে হাজার "গথিক" গির্জ্জা আর "গোপুরম্" পয়দা করিয়াছে।

সুগানা তালের কোথাও কোথাও নোন-উপত্যকার বিরাট

উচ্ছৃঙ্খলতাই বিরাজ করিতেছে। পাহাড়গুলাকে দুর্গ বলিব কি দুর্গগুলাকে পাহাড় বলিব সমঝিতে পারিতেছি না। দুর্গে আর পাহাড়ে এখানে বিলকুল "প্রকৃতি-পুরুষের" সংযোগ। চিহ্বেৎ-সোনায় পাহাড়ের গা দেখিয়া কার সাধ্য বুঝে যে, এ একটা কেল্লার দেওয়াল।

বিপজ্জনক পথে কোথায়ও ঝরণার বা দরিয়ার তেজ স্পর্শ করিতেছি। সঙ্গী সেখানে গলায় ঘণ্টাওয়ালা ছাগলের দল। ঝোপে ঝোপে হয় লাল "পপি" কিম্বা "জিরানিয়াম" ফুলগুলা। অথবা নীলাভ-হল্‌দে "প্লাম" ফুলের গোছা পার্ব্বত্য তাণ্ডবে সুষমা ছড়াইতেছে।

পাহাড় দেখার সাধ মিটাইতেছি। নীচের দিকে পাইন-বন যদিও বিরল,—কিন্তু লিণ্ডেন বা কাষ্টানিয়েন গাছের শাখায় শাখায় পাখীর বৈকালী গান কানে পশিতেছে। লেহ্বিকোর নিকট বিয়াজিয়ো পাহাড়টায় পাখী ঢুঁড়িতেই বাহির হই। কিন্তু আওয়াজ মাত্র শোনা যায়। "নাইটিঙ্গেল" ও "ফিঞ্চ" ইহাদের পশ্চিমা নাম।

২

এই উপত্যকায় পার্জিনে পল্লী ত্রেন্ত আর লেহ্বিকোর মাঝামাঝি। এখানে এক তাঁতী যুবার সঙ্গে আলাপ হইল। রেশমের চাষ ও কারবারে পার্জিনে এই অঞ্চলের বড় আড্ডা। যুবার বাপ, ভাই, সকলেই রেশমের কাপড় তৈয়ারি করে। শুনিলাম,—চীনা পোকা আনাইয়া ইতালিয়ান্ পোকার সঙ্গে

"কলম" করা হইয়া থাকে। এই বর্ণসঙ্করে যে রেশম প্রস্তুত হয় তাহাই নাকি সেরা।

এই ধরণের বর্ণসঙ্করের ব্যবস্থা দেখিতেছি আঙুরের চাষেও। একজনের কথায় বুঝিতেছি যে, ইয়াঙ্কিস্থানের আঙুরের বীজ আমদানি করিয়া ইতালিয়ানেরা স্বদেশী চাষের উন্নতি বিধান করিতেছে। ভারতেও মার্কিণ গম এবং তুলার বীজই আমাদের এই দুই প্রধান শস্যকে 'জাতে' তুলিতেছে। দুনিয়ায় আমেরিকার দান অনেক।

এক চাষীর ঘরবাড়ী দেখিতে দেখিতে তাহার "মধুচক্রে" গিয়া হাজির হইলাম। মৌমাছির "চাষ" করিবার জন্য যে-সকল বাক্স কায়েম হইতেছে সেগুলা মার্কিণ ওস্তাদের "পেটেণ্ট।" রহ্বেরেত্তর এক লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক সেই কাঠাম নকল করিয়া ত্রেন্তিনয় অনেক মধুর বাক্স্ চালাইতেছে।

৩

রোণ্‌চেনিঅ, লেহ্বিকো, পার্জিনে বা অন্যান্য পল্লীগুলার কেনোটাই হাজার দেড়েক ফিটের উঁচু নয়। কিন্তু সুগানা তালের গিরিশৃঙ্গ প্রায়ই পাঁচ ছয় সাত হাজার ফিট উঁচু।

কেনো কোনো পাহাড়ের উপর উঠিয়া পায়চারি করিতে থাকিলে দেখিতে পাই অপর পারের লোকালয় ও চাষের ক্ষেত-সমূহ—কোনোটা পাহাড়ের কোলে কোনোটা বা পাহাড়ের ঘাড়ে বুকে বা পায়ে। কাজেই চোখের সম্মুখে মেটে-কালো খোলার চালাগুলার ঢেউ সবুজ আবেষ্টনের ভিতর ভাসিতে থাকে। উপরের

মাইলের পর মাইল, ছোট ছোট পাইনের সমুদ্র। গিরিশৃঙ্গের পাথুরে নীরস খট্‌খটে তরঙ্গ ত আকাশের ঐশ্বর্য্য বটেই।

কিন্তু বোধ হয় এই অঞ্চলে সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর দৃশ্য পল্লী-গির্জ্জাগুলার চূড়ার লহর। মন্দিরহীন গাঁ স্থগানাতালে একটাও দেখি না। টিরোলের অষ্ট্রিয়ান আল্প্‌সেও মন্দিরের শিখর-সমূহ লহরিতে থাকে। সুইস আল্পস্‌বাসীদের পল্লীজীবনেও মন্দির-চূড়ার উঠানামা পর্ব্বত-শৃঙ্গের তরঙ্গমালারই প্রায় সমান্তরালরূপে দেখা দেয়। আল্পস্‌ পাহাড়ের গোয়ালা, চাষী, তাঁতী, ছুতার, বাবু, কেরাণী, ইস্কুলমাষ্টার সকলেই "ধর্ম্মহীন" জীবনকে পশুত্বেরই সমান বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত! ভারতে মন্দিরের সংখ্যা বেশী কি ইয়োরোপে গির্জ্জার সংখ্যা বেশী ?

৪

রোদে ইয়োরোপীয়ান্‌ নরনারীর মুখ চোখ বুক পিঠ হাত পা পুড়িয়া লাল্‌চে হইয়া যায়। ইহারা গ্রীষ্মকালে এইরূপ কটা বা বাদামি রং পরিতে পছন্দ করে। আর, ভারতবাসীর সনাতন বাদামি খোলসে আর-একপোঁছ কালী লেপা হইয়া যায়।

এইরূপে রোদ পোড়া খাইতে খাইতেই মাঠে শুক্‌না ঘাসের গন্ধ শুঁকিতেছি। অথবা গাছে গাছে পীচ, আপেল, বা পেয়ারফলের সংখ্যা আন্দাজ করিতেছি। "দিনে দিনে" এসব "পরিবর্দ্ধমান" সন্দেহ নাই,—তবে "ছুরী নূন হাতে" ছুটিয়া আসিলে ও বড় বেশী আরাম পাওয়া যায় না। জুলাই মাস,—আরও কিছুকাল অপেক্ষা করা দরকার।

যাহা হউক গোয়ালার পরিবারে ছেলেপুলেদের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়া গেল। গোয়ালিনী গরম দুধ ও তাজা "ঘরের মধু" দিয়া আপ্যায়িত করিল। সুখ-দুঃখের বাক্যালাপ চলিতেছে।

শিল্প-বাণিজ্যে ইতালিয়ান বনাম অষ্ট্রিয়ান

প্রায় পরিবারেরই বিঘা দুইচার জমি। গোটা অঞ্চলই বেশ উর্ব্বর। পোড়ো জমিন একছটাকও নয়। অথচ পল্লীগুলা সবই দরিদ্র কেন? সুগানাতালে, নোনতালে, আদিজে-তালে—হাঁটিয়া, রেলে বা বিনাপয়সার অটোমোবিলে,—যতগুলা ঘরবাড়ী দেখিয়াছি সবই পুরানা, ভাঙাচুরা, অপরিষ্কার। স্বচ্ছলতার, আরামের, জীবনানন্দের কোনো প্রকার বাহ্য লক্ষণ দেখিতে পাই না। নতুন বাড়ীঘর, মেরামত করা কপাট বা দেওয়াল, বাঁধানো চক্‌চকে রোয়াক, অথবা সড়কের স্বাচ্ছন্দ্য একদম বিরল।

একজন লিখিয়ে-পড়িয়ে ইতালিয়ান্ বাবু বলিলেন,—"একমাত্র চাষ-আবাদের জোরে ত্রেন্তিনের লোকেরা বড় লোক হইবে কি করিয়া? আমাদের এই জনপদে শিল্পের অভাব যৎপরোনাস্তি। ইতালিয়ান্‌দের ধাতে নয়া নয়া শিল্প কায়েম করিবার ক্ষমতা আজ পর্য্যন্ত জন্মিল না। অথচ অষ্ট্রিয়ান্‌রা শিল্পে বাণিজ্যে লক্ষ্মীমন্ত লোক।"

জিজ্ঞাসা করিলাম:—"ত্রেন্তিন ত এতদিন অষ্ট্রিয়ার বশেই ছিল। অষ্ট্রিয়ান্ আমলে এখানে শিল্পের বিকাশ হয় নাই কেন?" ইতালিয়ান্ সঙ্গী বলিতেছেন:—"অষ্ট্রিয়ান্-জার্ম্মান্ জাতের একটা রোক্ বা গোঁ আছে। সেই রক্তের জোর আমাদের নাই। অন্ততঃ

পক্ষে এ পর্য্যন্ত আমাদের চরিত্রে সেইরূপ উন্নতির আকাঙ্ক্ষা এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টা দেখা দেয় নাই।”

ইতালির প্রতিহিংসা

১

ত্রেন্তর বিশ পঁচিশ মাইল উত্তর দক্ষিণ সর্ব্বত্রই ইতালিয়ান্ ভাষার “মণ্ডল”। রক্তে ও ভাষায় এই জনপদের নরনারী খাঁটি ইতালিয়ান। হ্বেনেৎসিয়া প্রদেশের যে ইতালিয়ান, ত্রেন্তিনর এই অঞ্চলেও ঠিক সেই ইতালিয়ান।

তবে অষ্ট্রিয়ান আমলে পাঠশালার কৃপায় গোয়ালা চাষী তাঁতীরাও কিছু কিছু জার্ম্মান শিখিয়াছে। সেই জার্ম্মানের জোরেই পল্লী পর্য্যবেক্ষণ করা সম্ভব হইতেছে।

ইতালিয়ান গবর্মেণ্ট ত্রেন্তিনকে পুরাপুরি ইতালিয়ান আদর্শে গড়িয়া তুলিবার জন্য হয়রাণ। আজ অমুক “জাতীয় উৎসব”, কাল অমুক স্বদেশ-সেবকের জন্মতিথি, পরশু অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অমুক লড়াইয়ের ঘোষণা দিবস, অথবা অমুক দিন অমুক শহরে ইতালিয়ান পল্টন প্রবেশ করিয়াছে, এই সবের স্মৃতি-রক্ষার জন্য “রাষ্ট্রীয়” পালা-পার্ব্বণ যৎপরোনাস্তি। রোজই পল্লীতে পল্লীতে একটা-না-একটা কাণ্ড উপলক্ষ্যে “জাতীয়” পতাকা উড়িতেছে। অধিকন্তু কালো কুর্ত্তাপরা ফাশিষ্ট যুবাদের ঘন ঘন গতিবিধি এবং সর্দ্দারি লাগিয়াই আছে।

২

জার্ম্মান ভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে ইতালিয়ান গবর্মেণ্টের, "খাঁটি স্বদেশী" ইতালি-সেবকদের এবং ফাশিষ্ট-সমিতির পাণ্ডাদের জুলুম খুব বেশী। গোটা ত্রেন্তিন প্রদেশের লোক-সংখ্যা প্রায় সাত লাখ হইবে। তাহার ভিতর খাঁটী ইতালিয়ান নরনারী মাত্র চার লাখ। অপর তিন লাখ লোক রক্তে ভাষায় চেহারায় মায় চুলের রঙে অষ্ট্রিয়ান অর্থাৎ জার্ম্মান।

এই জার্ম্মান রক্তওয়ালা নরনারীদের উপর ইতালিয়ানদের হামলা এই পাঁচ বৎসরেও থামে নাই। কোনো ইতালিয়ানের সঙ্গে রাস্তায় ঘাটে দেখা হইলে অভিবাদন করিবার সময় কোনো জার্ম্মান পুরুষ বা স্ত্রী ভুলিয়া হঠাৎ যদি "ব্যন্ জ্যর্ণ"র বদলে "গুটেন্ টাগ" বলে তাহা হইলে সেই জার্ম্মান পরিবারের ভিটেমাটি উচ্ছন্ন হইবার আশঙ্কা আছে। মারপিট, রক্তারক্তি, লুটপাট অনেক হইয়া গিয়াছে। জার্ম্মানরা ভয়ে জড়সড় হইয়া চব্বিশ ঘণ্টা মুমূর্ষু ভাবে জীবন ধারণ করে। ভারত-সন্তানের পক্ষে এ এক নতুন দৃশ্য। কিন্তু "ঘাগী" গোলাম তাজা গোলামদের জীবন-কথা বিনা বাক্য-ব্যয়েই বুঝিয়া লইতে পারে।

অষ্ট্রিয়ানরা এতদিন ইতালিয়ানদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছিল। ১৯১৯ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত চলিতেছে। শাস্ত্রেই আছে "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি। প্রতিহিংসা লওয়া "মানুষ মাত্রের" স্বধর্ম্ম।

ইতালিতে বারকয়েক

যৌবন-আন্দোলনের এক কাঁচ্চা

পাহাড়-ভ্রমণের এক নয়া পন্থা আবিষ্কার করিয়াছি। ঘণ্টা-পাঁচেকের বেশী একটানে রেলে চলা বেকুবি। আধাদিন রেলে কাটাইয়া আধাদিন রাখাল কিষাণদের সঙ্গে হামদর্দ্দি চালানোই প্রকৃষ্ট পন্থা। রাত্রিযাপন ও যথাস্থানে। তৃতীয় শ্রেণীর মোসাফিরি,—বলাই বাহুল্য। রুটী দুইচার টুকরা, কিছু মাখম আর বড় জোর দুএকটা ডিম সিদ্ধ পথের সম্বল। মাঠে মাঠে ফলের ত অভাব নাই-ই। আর দুধের জন্য ভাবনাই বা কি? "ওমা, আমার যে ভাই তারা সবাই তোমার রাখাল তোমার চাষী।"

একদিন "আলবের্গয়" বসিয়া "রিজত্ত" ভাত খাইতেছি। তিনটী অষ্ট্রিয়ান যুবা আসিয়া হাজির। ইহারা সুদূর হ্বিয়েনা হইতে আল্‌প্‌স্ পার হইয়া ত্রেন্তিনয় পৌঁছিয়াছে। সবই পায়দল। এখন আবার পায়দলই সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড হইয়া ফ্রান্সের যাত্রী। পথে পথে ভিখ্ মাগিয়া খাওয়াই যুবাদের দস্তুর।

এই উপলক্ষ্যে এক জার্ম্মান্ নারী বলিলেন—"জার্ম্মানিতে এবং অষ্ট্রিয়ায় যৌবন-আন্দোলনটা এক অনর্থের কারণ দাঁড়াইয়া যাইতেছে। মজুরেরা, ছেলে ছোকরার নিষ্কর্ম্মা জীবন চালাইবার একটা ফিকির পাইয়াছে! 'ভবঘুরে্য',ভ্যাগাবণ্ড, জোচ্চোর ইত্যাদির দল বাড়িয়া যাইতেছে।" দুনিয়ার সকল "সু"র সঙ্গে বোধ হয় গণ্ডা কয়েক "কু"ও মাখানো থাকে।

সঙ্গীতের "মেলডি" ও "হার্ম্মণি"

পথে-পথে পাহাড়ী আত্মার বাণী শুনিতেছি নির্ঝরকণ্ঠে। আকাশ ফাটাইয়া আওয়াজগুলা পাথরের চাপের ভিতর হইতে স্বাধীনতা লাভ করিতেছে। গভীর খাদের গতিভঙ্গীর সঙ্গে-সঙ্গে গাছ-গাছড়ার অন্তরালে যাইয়া ধ্বনিসমূহ নিঃশেষ হইতেছে।

ভাবিতেছি, ঝর্ণার আওয়াজকে ভারতীয় সঙ্গীতে রূপ দেওয়া সম্ভবপর হইবে কি ? অন্ততঃ পক্ষে এই ধরণের ধ্বনিকে "সঙ্গতে" বসাইয়া ভারতীয় ওস্তাদজীরা যন্ত্র বাজাইতে অভ্যাস করুক না কেন ? তাহা হইলে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে "হার্ম্মণি" নামক যে ধ্বনিবস্তু মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়াছে ভারতীয় নরনারী সহজেই তাহার মর্ম্ম কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিবে।

আমাদের দেশে মামুলি লোকজনও অনেকেই মেঘ, বৃষ্টির বা ঝড়ের সময় গান গাহিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে অভ্যস্ত। বেহালা, সেতার, হার্ম্মোনিয়াম্, বাঁশী বা অন্য কোনো যন্ত্র বাজাইবার সময়ও ঘরের বাহিরে তুফানের আওয়াজ অনেক বাদক কানে ধরিয়া থাকিবেন। সেই সময়ে কণ্ঠ-ধ্বনির এক অপূর্ব্ব পরিপূর্ণতা লক্ষ্য করা বোধ হয় অনেকেরই অভিজ্ঞতার অন্তর্গত।

গলার স্বর এবং বাজনার স্বরকে "পরিপূর্ণ" করিয়া তোলাই "হার্ম্মণির" কাজ। দরিয়ার কলকলে, বর্ষার ঝমঝমে, তুফানের প্রলয়-নিশ্বাসে আর নির্ঝরের অফুরন্ত জলের আহ্বানে এমন অনেকগুলা স্বর আছে যে সব গান-বাজনার সুরের অন্তর্গত ভিন্ন

ভিন্ন স্বরের "স্বাভাবিক" জুড়িদার স্বরূপ। যেই এই দুই ধরণের স্বরের দেখাদেখি হয় তেমনি দুয়ে এক আত্মিক সংযোগে মিলিয়া অপরূপ ধ্বনির সৃষ্টি করে। সুরটা যেন এই স্বর-সংযোগের জন্যই বসিয়াছিল। এইজন্যই বেহাগই হউক বা ভৈরবীই হউক,—আর গায়ক বাদক ওস্তাদই হউক বা আনাড়ই হউক,—"মেলডি" বা সুরগুলা ঝর্ণার আবেষ্টনে, নদী-স্রোতের "ব্যাক্গ্রাউণ্ডে," ঝড়ের আব্হাওয়ায় প্রাণ পাইয়া ফুলিয়া উঠে। "মেলডি"র স্বরগুলার কি একটার যেন অভাব ছিল। অভাব পূরণ হইবামাত্র সুর নবরূপে দেখা দিতে থাকে।

যে-সকল গুণীরা ঝড়-তুফান হইতে, নদীর আওয়াজ হইতে, নিবিড় বনের শোঁ শোঁ হইতে, পাগলা-ঝোরার উন্মাদ গর্জ্জন হইতে বাছিয়া বাছিয়া স্বরগুলা আলাদা করিতে সমর্থ আর সেইসব বাছা বাছা স্বর আমাদের তথাকথিত রাগরাগিণীর স্বরগুলার সঙ্গে গাঁথিয়া দিতে সমর্থ তাঁহারাই ভারতে "হার্ম্মণি" আবিষ্কার করিয়া বসিবেন। ইয়োরোপে "মেলডি"র অর্থাৎ রাগরাগিণীর পরিপূর্ণতা-বিধায়ক স্বরগুলা আবিষ্কৃত হইয়াছে আজ বৎসর শ দুয়েক। ভারতের রাগরাগিণীগুলা আজও "ব্যাকগ্রাউণ্ড"হীন রূপে একাকী নিজ নিজ সুর-জীবন চালাইয়া চলিয়াছে।

সঙ্গীতের আসল কাঠামটাই রাগরাগিণী, গৎ, সুর, অর্থাৎ "মেলডি"। "মেলডি"-হীন সঙ্গীত কল্পনা করা অসম্ভব। "হার্ম্মণি" হইতেছে "মেলডি"র সখা, সখী, স্ত্রী, স্বামী, জুড়িদার ইত্যাদি। "হার্ম্মণি"হীন সঙ্গীত অসম্ভব নয়। "মেলডি" স্বরাট্—"হার্ম্মণি" এক্লা টিকিতেই পারে না। কিন্তু "মেলডি"র সঙ্গে "হার্ম্মণি"র

পরিণয় ঘটিলে যে কোনো কণ্ঠ-সঙ্গীত বা বাদ্য-সঙ্গীতই নবজীবন লাভ করিতে বাধ্য।

যে-কোনো ভারতীয় নরনারী যে-কোনো সুরে গান গাহিতে থাকুন, সঙ্গে যদি কোনো "পশ্চিমা'' হার্ম্মণিবিৎ সঙ্গীতজ্ঞ থাকেন—আর তাঁহার কান যদি নেহাৎ পূরব-বিরোধী না হয়,—তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ টকাটক আমাদের প্রত্যেক "মেলডি''র অনুরূপ যথোচিত স্বর জুড়িয়া দিতে সমর্থ হইবেন। কোন্ স্বরের সঙ্গে কোন্ স্বরের "মেল'' চলে তাহা 'সঙ্গীত-বিষয়ক গণিতের' মাপা-জোকা' এলাকায় অ আ ক খ। এই কথাটা ভারতবাসীর কানে পশিলে ভারতীয় বৈঠকে বৈঠকে হার্ম্মণি সম্বন্ধে কিম্ভূতকিমাকার মত প্রচারিত হইবে না।

আদিজে-তালের সমতল ভূমি

আদিজে উপত্যকার সুবিস্তৃত সমতল ভুঁইয়ে সাদা সরু আঁকা-বাঁকা পাথুরে পথ খেলিতেছে না। মন্দির-চূড়া এখানে আর লহরায়িত নয়। নদী ছুটিয়া চলিতেছে খাড়া দক্ষিণ। সাদা ধবধবে জলের স্রোত শুইয়া শুইয়া গড়াইতেছে। দুই পাশে যতদূর নজর যায় দেখিতেছি কেবল আঙুরের ক্ষেত,—কোথায়ও কোথায়ও তামাকের চাষ চলিতেছে।

যেন এক সুবিশাল ময়দান, চারদিকে যার আকাশস্পর্শী দেওয়ালে ঘেরা। পূবে পশ্চিমে পাহাড়ী দেওয়ালশ্রেণী একদম প্রায় সোজা উঠিয়াছে। উত্তর দক্ষিণেও পাহাড়গুলা যেন বা পারিপ্রেক্ষিকের নিয়মেই একত্র আসিয়া মিশিয়াছে।

ইতালিতে বারকয়েক্

এই ধরণের পর্ব্বত-বেষ্টিত বিরাট্ চতুষ্কোণের পর চতুষ্কোণ নজরে পড়িতেছে। কোনো চতুষ্কোণের দেওয়ালগুলায় প্রস্তর-স্তর ধরাতলের সঙ্গে সমান্তরালভাবে সাজানো। পরবর্ত্তী চতুষ্কোণে স্তর-সমূহ ভূমির উপর সোজা দণ্ডায়মান।

চতুষ্কোণের আওতা ছাড়াইয়া পশ্চিম দিকে গেলেই নোন উপত্যকার পাথরের হুড়াহুড়ি দৃষ্টিগোচর হয়। ত্রেন্তিন প্রদেশের এই অঞ্চলের নাম-ডাক টুরিষ্ট-মহলে খুব বেশী। প্রত্যেক পল্লাই প্রসিদ্ধ। "দলমিতি" শৈলমালার কাম্পিনিয় এবং ব্রেন্তা-শ্রেণী পশ্চিম ত্রেন্তিনর পর্ব্বত-গৌরব। এই মুল্লুকের শিখরগুলা প্রায়ই নয় হাজার ফিট উঁচু।

এঞ্জিনিয়ার লান্‌সিঙার্ বলিতেছিলেন :—"আগামী সপ্তাহে একটার ঘাড় মট্‌কাইতে যাইব। ইচ্ছা হয় কি ?" বলিলাম :—"এ যাত্রায় শুনিয়া রাখা গেল।"

বার হাজার ফিট উঁচু পাহাড় ইয়োরোপের পক্ষে উচ্চতম শ্রেণীরই সামিল। সেই জাতীয় পর্ব্বতমালাও ত্রেন্তিনয় রহিয়াছে। টিরোল আর ত্রেন্তিনর সীমান্ত প্রদেশে অর্ট্‌লার পাহাড় এই গৌরবের অধিকারী। ব্রেন্তা আর অর্টলারের সম্পদ ত্রেন্তিনকে সৌন্দর্য্যান্বেষীদের নিকট চিরবাঞ্ছিত করিয়া রাখিয়াছে। এই সৌন্দর্য্য অবশ্য দুর্দ্দান্ত প্রস্তরাত্মার অবাধ তাণ্ডব। দূর হইতেই কিছু কিছু সেলাম করা গেল। ছবি দেখিয়া "ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনম্" চলিতেছে।

চষা জমিনের ব্যাড়ায় দেখিতেছি বুনো গোলাপের ঝোপ। রংবেরঙের গোলাপী আইল বা গালর ভিতর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে

লোকালয়ে আসিয়া পৌঁছিতেছি। "বোলেন্তা" নামক ভুট্টার আটা সিদ্ধ খাইয়া গৃহস্থদের অতিথিসেবায় সাহায্য করা যাইতেছে। চেরি প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে। দুটো একটা পীচ চাখিবার সুযোগ জুটিতেছে।

আকাশ মেঘের আওতায় ধূসরবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যায় মেঘগুলা পাহাড়ী খুঁটার মাথায় মাথায় শুইয়া সামিয়ানা প্রস্তুত করিতেছে। মেঘের ডাক আর "আঙুর-বাড়া গরম" ত্রেন্তিনর গ্রীষ্ম-সাথী।

ত্রেন্তিনর জার্ম্মাণ-সমস্যা

১

ইতালিয়ান মণ্ডলে সড়কের নামগুলায় জার্ম্মাণ আর নাই। সবই ধুইয়া মুছিয়া ইতালিয়ান করা হইয়াছে। কিন্তু যতই উত্তরে আসিতেছি ততই ত্রেন্তিনর জার্ম্মাণ্ মণ্ডল পাওয়া যাইতেছে। সীমান্ত-প্রদেশের দস্তুরই এই। কোথায় যে এক ভাষার খতম আর কোথায় যে অপর ভাষার সুরু তাহা মাপিয়া-জুকিয়া সাব্যস্ত করা একপ্রকার অসম্ভব।

ইতালিয়ান ভাষার এক গ্যাঁজ গিয়া জার্ম্মাণ মণ্ডলে প্রবেশ করিয়াছে। আবার জার্ম্মাণ ভাষার এক গ্যাঁজ ইতালিয়ান্ মুল্লুকে প্রবিষ্ট হইয়াছে। জার্ম্মাণ মণ্ডলের ইতালিয়ানরা তাহাদের নিজ গ্যাঁজটা ইতালির সঙ্গে জুড়িয়া দিতে চাহিত। সেই গ্যাঁজ-সমস্যাকে বলা হইত "ইরেডেন্টিজ্‌ম্।"

ইতালিতে বারকয়েক

ইতালিয়ানেরা এখন কেবল গ্যাঁজটা মাত্রই ইতালির সঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছে এরূপ নয়। সেই গ্যাজের সঙ্গে সঙ্গে খাঁটি জার্ম্মাণ মুল্লুকই আজ ইতালির এক প্রদেশে পরিণত।

বোৎসেন শহরে পৌঁছিতে পৌঁছিতে ত্রেন্তিনর এই গ্যাঁজ দখলটা বেশ বুঝা গেল। এইখানেই ইতালির জার্ম্মাণ মণ্ডল। খাঁটি ভাষার তরফ হইতে ইতালিতে আর অষ্ট্রিয়ায় সীমানা ভাগাভাগি করিতে হইলে বোৎসেনের খানিক দক্ষিণে খুঁটা ফেলিতে হইত; কিন্তু বোৎসেনের কাছাকাছি পাহাড় পর্ব্বত-ঘটিত প্রাকৃতিক সীমানা পাওয়া দুষ্কর। কাজেই অষ্ট্রীয়া বেচারার সীমানা যার-পর নাই সঙ্কুচিত হইয়াছে। ইতালি ইংরেজের গুপ্ত সন্ধির ফলে বোৎসেনের বহু উত্তরে নিজ সীমানা ঠেকাইতে পারিয়াছে। ফলতঃ কমসেকম তিন লাখ খাঁটি জার্ম্মাণ আজ ইতালির গোলাম। ইহারা ইতালিতে অষ্ট্রিয়ান্ বা জার্ম্মাণ "ইরেডেন্টিষ্ট্" আন্দোলন চালাইতেছে।

ত্রেন্তিন আগে ছিল ইতালিয়ান্ "ইরেদেন্তা।" আজ সেই মুল্লুকই অষ্ট্রিয়ান্ "ইরেদেন্তায়" পরিণত। ফরাসী-জার্ম্মাণের আলসাস-লোরান্ আর অষ্ট্রিয়ান্-ইতালিয়ানের ত্রেন্তিন রাষ্ট্র-সমস্যায় একই চিজ।

২

ইতালিয়ান্ সরকার বোৎসেন্ অঞ্চলে জার্ম্মাণ ভাষা পুরাপুরি তুলিয়া দিতে সাহসী হয় নাই। ইতালিয়ান ভাষাকেই রাজ-ভাষা

ও ইস্কুলের ভাষা করা হইয়াছে। কিন্তু গৃহস্থেরা ঘরে বাহিরে জার্ম্মাণ বলিতে এখনো অধিকারী।

দোকানপাটের নামে জার্ম্মাণ ভাষা আজও চলিতেছে। ত্রেন্ত ইত্যাদি শহরে ইহা অসম্ভব। এমন কি একটি খবরের কাগজও বোৎসেনে জার্ম্মান্ ভাষায় পরিচালিত হয়। কাগজটা পড়িয়া দেখিলাম তাহাতে জানা যায় মাত্র যে, আজ অমুক লোকের পেটের অসুখ হইয়াছে, অথবা কাল অমুক পাহাড়ে বৃষ্টি পড়'পড়' হইয়াছিল ইত্যাদি। অর্থাৎ স্থানীয় (জার্ম্মাণ) নরদারীর আসল রাষ্ট্রিক সুখদুঃখ আলোচনা করা সম্ভবপর নয়।

সুগানা-তালে, নোন-তালে, আদিজে-তালে,—হ্বেরোনা হইতে এ পর্য্যন্ত যে-সকল ঘর-বাড়ী দেখিয়াছি সে-সব ইতালিয়ান্ ধাচে গড়া! রেণেসাঁসের ছায়া সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছে। কিন্তু বোৎসেনে পৌঁছিতে পৌঁছিতে নয়া গড়নের ইমারত দেখিতেছি—"গথিকে"র প্রভাব সমন্বিত ছুঁচোল ত্রিকোণ ছাদবিশিষ্ট ঘর-বাড়ী জার্ম্মাণ "কুল্‌টুরে"র সাক্ষ্য দিতেছে।

বোৎসেনে চারণ-কবি হ্বাল্টারের স্মৃতিস্তম্ভ বিরাজ করিতেছে। হ্বাল্টার ছিলেন মধ্য-যুগের "মিনেসিঙ্গার"। জার্ম্মাণ-সাহিত্যের শেষ গাথা-কবি হিসাবে হ্বাল্টারের ইজ্জৎ খুব বেশী। বোৎসেন শহর সেই জার্ম্মাণ সভ্যতার এক বড় খুঁটা। ত্রেন্তর দান্তে-মনুমেণ্ট ইতালির পক্ষে যা, বোৎসেনে হ্বাল্টার-ডেঙ্কমালও জার্ম্মাণ জাতির পক্ষে তাই।

ইতালিয়ানেরা বোৎসেনের নাম বদ্‌লাইয়া দিয়াছে। নয়া নাম বোলৎসান। এই অঞ্চলের প্রত্যেক পল্লী এবং শহরই এখন

দুই নামে পরিচিত। প্রথম নাম ইতালিয়ান্। দ্বিতীয় নাম জার্ম্মাণ। কেতাবে, রেলওয়ে ষ্টেশনে জার্ম্মাণ নামটা বন্ধনীর ভিতর দেখিতে পাই। ইহারই নাম "নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে"।

বোৎসেন ত্রেন্তর মতনই অগ্নিকুণ্ড। এইখানে এক বন্ধু জুটিয়াছেন দত্তরে কলমান। সেকালে ইনি ছিলেন ইতালিয়ান্ "ইরেদেন্তিষ্ট"দের অন্যতম চাঁই লড়াইয়ের সময়ে ইনি ইতালির পক্ষ হইতে প্যারিসে যাইয়া অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা চালাইয়াছেন। এখন কলমান বোৎসেনে ইতালিয়ান্ শিখাইবার কাজে বাহাল আছেন। ত্রেন্তর বাতিস্তি ছিলেন কলমানর এক দোস্ত।

বোৎসেন বা বোল্ৎসানর পূর্ব্বদিকে তাকাইলে এক অপূর্ব্ব পাহাড়-শ্রেণী চোখে পড়ে। ব্রেন্তা শ্রেণীর মতনই সে-সব পাথরের উন্মাদনা। বিশেষ কথা এই যে, শৃঙ্গগুলা লালে লাল। এই গোলাপী গিরির নাম তাই "রোজেন-গার্টেন"।

এঞ্জিনিয়ারিং-ঘটিত একটা তথ্য বোৎসেনের বড় কথা। তারে-ঝোলা গাড়ীতে হাওয়ার উপর দিয়া পাহাড় পার হইতে হয়।

এখানকার একজন নাক-কান-গলার ডাক্তার বলিলেন,—"সেপ্টেম্বর অক্টোবরে বোৎসেন অতি রমণীয়। তখন একবার আসা চাই।" ডাক্তারবাবু জাতে জার্ম্মাণ।

বোৎসেনের গিরি-দুর্গ অতি "রোমান্টিক"। প্রধান গির্জ্জায় জার্ম্মাণ প্রাণই পাকড়াও করিতেছি।

ইতালিতে বারকয়েক

নয়া অষ্ট্রিয়ার সীমানায়

আইজাকের জল আসিয়া বোৎসেনে আদিজের সঙ্গে মিশিয়াছে। আদিজের কিনারায় এতক্ষণ সোজা উত্তরে উজাইয়া আসিতেছিলাম। উত্তর-পশ্চিমের মেরাণ হইতে আসিয়া আদিজে বোৎসেনে দক্ষিণমুখী হইয়াছে। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের তরফ হইতে মেরাণ-বোৎসেন জনপদ জগদ্‌বিখ্যাত।

এইবার আইজাক তালে পা ফেলিলাম। এই দরিয়া আদিজের মতন শান্ত শিষ্ট নয়। উপত্যকা যার-পর-নাই সঙ্কীর্ণ। লাফালাফি আর ফোঁস-ফোঁস ছাড়া আইজাকের আর কোনো ভাষা নাই। আবার নোন-তালের বিপ্লব-গরিমাই উপভোগ করিতেছি।

আঙুরের রাজ্য আর নাই। চাষ আবাদও নেহাৎ কম। জমিন অতি অপ্রশস্ত ওট্‌স্ শস্যের ক্ষেত দেখা যাইতেছে। টিরোলের প্রাকৃতিক দৃশ্য, টিরোলের পল্লীজীবন, টিরোলের পাহাড়-সম্পদই এখানকার আবেষ্টনে পুনরায় পাইতেছি।

পাহাড়ের কোলে বৃক্‌সেন শহর বোৎসেনের চেয়েও সুন্দর দেখাইতেছে। আজকাল ইতালিয়ান নাম ব্রেসাননে। সবুজ আওতায় লাল-টালিওয়ালা ছাদের ঘর-বাড়ী অতি মনোরম। সরকারী হাসপাতালের অন্যতম জার্ম্মাণ ডাক্তার অনেক দিনকার পরিচিত বন্ধু। বুঝা গেল, ইতালিয়ান সর্দ্দারদের প্রভুত্ব রোজই বাড়িয়া চলিয়াছে।

এই সকল অঞ্চলে টিরোলী আল্পসের ধরণ-ধারণ সবই পূরা মাত্রায় বিরাজমান। কি বোৎসেন, কি বৃক্‌সেন, কি অন্যান্য পল্লী

কোথায়ও ইতালির ছায়ামাত্র নাই। এই মুল্লুককে ইতালির অংশে পরিণত করিতে হইলে অনেক কাঠ-খড় খরচ করিতে হইবে।

পাহাড়ের পর পাহাড়, পাহাড়ের ঘাড়ে পাহাড়, পাহাড়ী গলি, পাহাড়ী উপত্যকা, এই সবই এই অঞ্চলের একমাত্র দৃশ্য। আবার পাইন-বনের সুঘ্রাণ বিনা ক্লেশেই পাইতেছি। বিপুল তরুবর পর্ব্বতের গায়ে গায়ে সারি দিয়া অসীম রাজ্য বিস্তার করিয়া আছে।

এই আবেষ্টনেই পার্ব্বত্য পথের দুই ধার গাঁথিবার জন্য বিপুল কেল্লা তৈয়ারি করা হইয়াছিল। ফ্রান্‌ৎসেনস্-ফেষ্টে পল্লীর ইতালিয়ান্ নাম ফর্ত্তেৎসা। ত্রেন্তিন প্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের গিরি-দুর্গের মতনই ফ্রান্‌ৎসেন্‌স্-ফেষ্টের দুর্গও পাহাড়ী কলেবরেরই অন্যতম অংশবিশেষ।

আইজাক-তালের সঙ্গে এইখানে পুষ্টার-তালের মেলা-মেশা। আল্পসের গ্রীষ্মগৌরব ভোগ করিবার জন্য লোকেরা ফর্ত্তেৎসা হইতে রেলে পুষ্টা উপত্যকার সওয়ারি হয়। ত্রেন্তিনর উত্তর-পূবে পুষ্টার উপত্যকা।

গোজনজাস্ পল্লী ত্রেন্তিনর আর-এক "কুরর্ট" বা স্বাস্থ্য-নিকেতন। উত্তরের দিকে পাহাড়ে বরফের চাপ এখনো দেখা যাইতেছে। গোজেনজাস্ প্রায় চার হাজার ফিট উঁচু।

রেল এখানে দার্জ্জিলিং বা শিমলার পথের মতন একই পাহাড় ঘুরিয়া ঘুরিয়া উচ্চতর স্তরে উঠিতেছে। স্যুইটসার্ল্যাণ্ডে গোটহার্ড পার হইবার সময়ও এইরূপই করিতে হয়।

ইতালিতে বারকয়েক

আইজাক গর্জ্জন করিতে করিতে নামিতেছে। অতি সরু পাহাড়ী পথ। এই পথেই অষ্ট্রিয়ান্ সেনা ত্রেন্তিন ছাড়িয়া ইন্‌স্‌ব্রুকে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। অষ্ট্রিয়া আর ইতালির মধ্যে ইহাই একমাত্র পথ। এই পথের সঙ্কীর্ণতম অংশ ব্রেন্নার পল্লীতে অবস্থিত। সেই পল্লীতেই আজকালকার ইতালির উত্তরতম সীমানা। ইতালিয়ান্ নাম ব্রেন্নারো।

অষ্টম অধ্যায়

ইতালিয়ান নরনারী

মুসলিনির শত্রুপক্ষ

১

ইতালিতে আজও "অসহযোগ" চলিতেছে অভি পুরাদমে (মার্চ্চ, ১৯২৫)। গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আড়ি করিয়া এক দল পার্ল্যামেণ্টের সভ্য "বনবাসী" হইয়াছে। এই "বনবাস"-কাণ্ড কিছু বিচিত্র।

মান্ধাতার আমলে—অর্থাৎ রোমে যখন "সত্যযুগ" চলিতেছিল তখন—সরকারী কর্ত্তাদের সঙ্গে কোনো নামজাদা দলের ঝগড়াঝাঁটি বাধিলে সেই দলের লোক নিকটবর্ত্তী এক প্রাহাড়ে গিয়া আড্ডা গাড়িত। আমাদের সুপরিচিত বচন এই :—"অত্যন্ত বিমুখে দৈবে ব্যর্থ যত্নে চ পৌরুষে। মনস্বিনো দরিদ্রস্য বনাদন্যৎ কুতঃ সুখম্?"

সেকালের রোমাণরাও ঠিক এইরূপই বুঝিত। ইহারা আহ্বেন্তিনো পাহাড়ে গিয়া "বনবাস" চালাইত। ইহাকে "অভিমান" বলা চলে। আত্মীয় কুটুম্বদের কুব্যবহারে তিতিবিরক্ত হইয়া তাহাদের "মুখদর্শন না করিবার" মতন প্রতিজ্ঞা

করা বলিতে পারি। অথবা "ধর্‌ণা" দিয়া পড়িয়া থাকিয়া—শারীরিক কষ্ট ভোগ করিয়া উপর-ওয়ালাদের কিম্বা দেবদেবীর অনুগ্রহ আদায় করিবার ফন্দীও অনেকটা এইরূপ।

যাহা হউক, মুসলিনি আর ফাশিষ্টদের উপর চটিয়া একদল পার্ল্যামেণ্টের সভ্য "গৃহত্যাগী" হইয়াছেন। ইতালিয়ান সমাজে ইহাদিগকে "আহ্বেন্তিনবাসী" বলা হইয়া থাকে। অবশ্য বোধ হয়, কেহই আহ্বেন্তিনর বাসিন্দা হয় নাই। তবে ইহারা কেহই পার্ল্যামেণ্টে ফিরিবে না এইরূপ "জিদ্‌" ধরিয়াছে।

২

এই জিদ্‌ বড় জবর জিদ। ফাশিষ্ট দলের লোকেরা খোলাখুলি বলিতেছে—"বয়ে গেল। দু চার দশগণ্ডা লোকের অসহযোগে কি-ই বা আসে যায়?"

সিনিয়র (শ্রীযুত) ফারিনাচ্চি ফাশিষ্ট দলের সম্পাদক। ইনি পার্ল্যামেণ্টের সভ্যও বটে। অধিকন্তু ক্রেমণা সহরের এক দৈনিক কাগজ ফারিনাচ্চির সম্পত্তি।

এই কাগজে ফারিনাচ্চি বলিতেছেন:—"আমাদের উল্টা পক্ষের কেহ কেহ 'আহ্বেন্তিনবাসী' হইতে চান, হউন। কিন্তু তাঁহারা দেশের লোকের প্রতিনিধি হিসাবে পার্ল্যামেণ্টের সভ্য। পার্ল্যামেণ্টের কাজের জন্য তাঁহারা সরকারী মাহিয়ানা পাইয়া থাকেন। কাজ করিবেন না অথচ 'তঙ্‌খা' ভোগ করিবেন এ কিরূপ নীতি? যদি তাঁহারা পার্ল্যামেণ্টের বেতন চাহেন তবে তাঁহাদিগকে পার্ল্যামেণ্টে ফিরিয়া আসিতেই হইবে।"

এইরূপ "ভাতে মারিবার" ভয় দেখাইয়া ফারিনাচ্চি অসহযোগ আন্দোলনকে কাবু করিবার মতলবে আছেন। কিন্তু এই চোখ-রাঙানিতে অসহযোগীরা ভয় পাইতেছে না। কেন না তাহাদের সরকারী বেতন বন্ধ করা একমাত্র মুসলিনির অথবা তাঁহার পেটোয়াদের মুখের জোরে সম্ভব নয়। তাহার জন্য একটা নতুন আইন জারি করা দরকার হইবে।

সেই আইন জারি করা অতি কঠিন। আবার দেশ শুদ্ধ হৈ হৈ রৈ রৈ পড়িয়া যাইবে। মুসলিনি বিগত ছয় মাস ধরিয়া যারপরনাই নাস্তানাবুদ হইতেছেন। তাহার উপর আর একটা গণ্ডগোল ঘাড়ে চাপাইয়া বিপদগ্রস্ত হওয়া তাঁহার সাধ নয়। বস্তুতঃ আজকাল মাঝে মাঝে তাঁহার "অসুখ-বিসুখ"ও হইতেছে!

৩

"আহ্বেন্তিনর দল" নাছোড়বান্দা। শত্রুপক্ষের পরাজয় না হওয়া পর্য্যন্ত ইহারা বনবাসেই থাকিবে মতলব করিয়াছে।

কিন্তু ইহাদের বন্ধুবর্গ বুঝাইয়া সুঝাইয়া বলিতেছে :—"আরে, পাগল, চোরের উপর রাগ করিয়া মাটিতে ভাত খাইলে কি লাভ? ইহাতে চোরই হাসিবে মাত্র। ফাশিষ্টদিগকে যদি ঢিট্ করিতে চাস, ত আয়, পার্ল্যামেণ্টে ফিরিয়া আয়। আমাদের সঙ্গে একত্রে আইনসঙ্গত উপায়ে গবর্ণমেণ্টের স্বপক্ষীয় দলটাকে কাবু করিতে লাগিয়া যা। পার্ল্যামেণ্টের ভিতরে না বসিয়া বাহির হইতে গবর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করিবি কি করিয়া? যদি সশস্ত্র লড়াই

চালাইবার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে কথা আলাদা। কিন্তু সেইরূপ বিপ্লবের সম্ভাবনা এখন নেহাৎ অল্প। গবর্ণমেণ্টের হাতে লোহা-লক্কড়, ফৌজ-পল্টন সবই পুরা মাত্রায় বিরাজ করিতেছে।"

এই সুর শুনিতে পাই "জ্যর্ণালে দিতালিয়া" নামক রোমের দৈনিক পত্রে। এই কাগজ ফাশিষ্টদের বিরোধী, বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই কাগজের নেতারা "অসহযোগী" নন। তবে ইহারা সকলেই গবর্ণমেণ্টের কট্টর দুস্মন। সিনিয়র সালান্দ্রা, অর্লান্দ, জ্যলিত্তি ইত্যাদি "বাঘা বাঘা" রাষ্ট্রনায়ক এই দৈনিকের মাতব্বর। ইহারা গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে কারবার করিতে করিতেই গবর্ণমেণ্টকে ঢিট্ করিয়া ছাড়িবেন এইরূপ ফন্দি করিয়াছেন।

এই যুক্তিতেও আহ্বেন্তিনবাসীরা ভিজিতেছে না। তাহাদের মুখে বোল মাত্র এক। ইহারা বলিতেছে:—"আগে দেশে স্বাধীনতা ফিরিয়া আসুক, তাহার পর আমরা পার্ল্যামেণ্টে ফিরিব। তবে দেশের এখন যে অবস্থা তাহাতে একটা বিপ্লব ঘোষণা করিয়া দেওয়া আমাদের মতলব নয়। তাহাতে দেশের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। আমরা অশস্ত্র অসহযোগ বজায় রাখিয়া চলিব।"

৪

"জিদ" ধরিলে মাঝে মাঝে কিছু কিছু কাজ যে না হয় এমন নয়। চরম-পন্থীরা দুনিয়ার সর্ব্বত্রই নিজ নিজ দেশের জন্য কিছু না কিছু সুফল ফলাইয়া ছাড়িয়াছে। আহ্বেন্তিনবাসীদের "ধরণা" দিবার ফলেও যেন ইতালিতে নতুন হাওয়া বহিবার উপক্রম দেখা যাইতেছে।

ইতালিতে বারকয়েক

ফাশিষ্ট সম্পাদক ফারিনাচ্চি তাঁহার দলের লোককে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। একটা ইস্তাহার জারি হইয়াছে। তাহাতে লেখা আছে:—"বন্ধুগণ! বিশেষ সতর্কভাবে চলাফেরা করিও। ফাশিষ্ট দলের কোথাও কেহ যেন বে-আইনি কিছু না করিয়া বসে। আমাদের দলের প্রত্যেক লোককে সংযত ও নিয়মবদ্ধ ভাবে কাজ করিতে হইবে। দেশ-বিদেশের কোনো লোক যেন না বলিতে পারে যে ফাশিষ্টদের দৌরাত্ম্যে ইতালিয়ানরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল।" ইত্যাদি।

ইহার নাম "গুঁতোর চোটে বাবা বলায়"। এতদিন পরে ফাশিষ্টরা খোলাখুলি "আইন", 'সংযম, "শৃঙ্খলা", "নিয়ম" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই সকল বস্তু যে এই দলের অজ্ঞাত এই কথাই গবর্ণমেণ্টের বিরোধী নরম ও গরম সকল দল সর্ব্বদা বলিয়া আসিতেছে। ফাশিষ্টদের এই দিকে চৈতন্য লাভ হওয়ায় ফাশিষ্ট-শত্রুরা বিজয় লাভের ইঙ্গিত পাইতেছে।

অপরদিকে মুসলিনি নতুন এক আইন কায়েম করিয়াছেন। সেই আইন অনুসারে এক নতুন পার্লামেণ্ট ডাকা হইবে। আজ কাল যে পার্ল্যামেণ্ট চলিতেছে সেই পার্ল্যামেণ্টের বাছাইয়ে মুস-লিনির দল বে-আইনি এবং অসহ্য অত্যাচারের প্রশ্রয় দিয়াছিল। নতুন আইন জারি করিতে বাধ্য হইয়া মুসলিনি খোলা মাঠে নিজের পরাজয় স্বীকার করিলেন। গবর্ণমেণ্টের শত্রুদের ইহা আর এক বিজয় লাভ (এপ্রিল, ১৯২৫)।

ইতালিতে বারকয়েক

সাংবাদিক-সম্মেলন

১

বল্‌ৎসানয় ইতালিয়ান "জ্যর্নালিস্তি" বা সাংবাদিকগণের একটা সম্মেলন ঘটিয়া গেল। রোম, ফ্লোরেন্স, মিলান, তুরিণ, ভেনিস ইত্যাদি শহরের কাগজওয়ালারা নিজ নিজ প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন। চার পাঁচ দিন ধরিয়া বোলৎসান এই সকল সাংবাদিকদের কর্ম্মকেন্দ্র ছিল। গবর্ণমেণ্টের খর্চ্চায় তাঁহারা আল্পস্ জনপদের বিভিন্ন পল্লী ও শহর দেখিয়া বেড়াইবার সুযোগ পাইয়াছেন।

রোমের 'ইদেয়া নাৎস্যনালে' (অর্থাৎ জাতীয় ভাব বা আদর্শ) নামক দৈনিকের প্রতিনিধি বলিলেন—"আদিজে এবং ইজার্কো এই দুই দরিয়ার পাহাড়ী জনপদ সবে মাত্র অষ্ট্রিয়ার তাঁব হইতে ইতালির দখলে আসিয়াছে। এই মুল্লুককে সকল উপায়ে ইতালিয়ান আদর্শে গড়িয়া তুলিবার জন্য আমাদের সমাজে আন্দোলন চলিতেছে। ত্রেন্তিন প্রদেশে এই জন্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। আমাদের এই জার্ম্মাণ (অষ্ট্রিয়ান) মণ্ডলে ইতালিয়ান ভাষা, ইতালিয়ান সাহিত্য, ইতালিয়ান সঙ্গীত, ইতালিয়ান ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার করা স্বদেশ-সেবকদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।" ত্রেন্ত শহরে সেনেটার তলমেই এই আন্দোলনের পাণ্ডা। ইতালিয়ান শিল্পপতিদিগকে এই নয়া অধিকৃত জনপদে কারবার গড়িয়া তুলিবার জন্য উস্‌কানো হইতেছে।

২

"ইদেয়া নাৎস্তনালে"কে ফাশিষ্ট-পন্থীদের কাগজ বলা যাইতে পারে। পুরাপুরি ফাশিষ্ট দলের এক প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি "তেভেরে" কাগজের লোক। রোম যে দরিয়ার উপর অবস্থিত তাহার ইতালিয়ান স্বদেশী নাম তেভেরে। ইংরাজিতে বলে 'টাইবার'। 'তেভেরে' মুসলিনির গুণমুগ্ধ, বলাই বাহুল্য। "শুনিলাম, ইতালিয়ানরা ত্রেন্তিন প্রদেশের সম্পদ সম্বন্ধে একদম অজ্ঞ। তাহাদের ভিতর এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্যগৌরব ইত্যাদির কথা প্রচার করা সাংবাদিকদের কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্য পালনের উপযুক্ত হইবার জন্যই আমরা এই সম্মেলনে আসিয়াছি।" যুবা সাংবাদিকগণের ভিতর অনেকেই ইতালিয়ান ছাড়া দুই একটি ভাষা জানে। ফরাসী জানে বহু ব্যক্তি। জার্ম্মাণে এবং ইংরেজিতে দখলও দেখিলাম কয়েক জনের। এই ভাষাজ্ঞান ছাড়া ইতালিয়ান সাংবাদিকেরা ভারতীয় সাংবাদিকগণের চেয়ে অন্য কোনো বিষয়ে উচ্চশ্রেণীর লোক নয় মনে হইল। ইতালিয়ান ভাষা পড়িতেছি বটে, কিন্তু এই ভাষায় কথা বলা বা বুঝা এখনো অসাধ্য। কাজেই ফরাসী ভাষাকেই গল্প গুজব, হাসি ঠাট্টার বাহন করিয়া লইয়াছি।

মিলানের এক প্রতিনিধি বলিলেন—"আমি এই মাত্র রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়া বলৎসানয় পৌঁছিলাম। মিলানে ভারতীয় কবির 'রাজসম্মান' ঘটিয়াছে বলিতে হইবে।"

৩

রোমের এক বড় কাগজ "জ্যর্ণালে দিতালিয়া"। প্রতিনিধি বলিলেন—"বিদেশে সংবাদ-দাতা রাখা যে-সে কাগজের পক্ষে সম্ভবপর নয়। প্যারিস ছাড়া আর কোথাও আমাদের প্রতিনিধি নাই। লণ্ডনে সংবাদ-দাতা রাখিবার চেষ্টা করা গিয়াছিল; খরচ অত্যধিক। মাসে লাগিত এক শ' পাউণ্ড, কাজেই বেশী দিন রাখা সম্ভবপর হয় নাই।"

ত্রেন্তিন প্রদেশের ছোট বড় মাঝারি পল্লী বা শহরের নানা প্রতিনিধির সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল। কোথাও খাটী জার্ম্মাণ কাগজ বাহির হয় কি না বুঝা গেল না। দুইলাখ ত্রিশ হাজার জার্ম্মাণ নরনারীর জনপদে ইতালিয়ান কাগজ ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে। ছাত্র, মাষ্টার, ব্যাঙ্কার, এঞ্জিনিয়ার, কবি ইত্যাদি নানা শ্রেণীর লোক বিভিন্ন কেন্দ্রে ইতালিয়ান সঙ্ঘ, ইতালিয়ান ক্লাব ইত্যাদি কায়েম করিতেছে। ছোট খাটো ইতালিয়ান দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক নানা কেন্দ্রে দেখা দিয়াছে। অবশ্য খোদ বলৎসানয় "ল্যাণ্ডস্‌মান" ইত্যাদি দৈনিক জার্ম্মাণ ভাষায় বাহির হয়।

স্থানীয় হোটেলওয়ালারা সাংবাদিক-সম্মেলনে যোগ দিতেছে। খবরের কাগজের সাহায্যে এই অঞ্চলের কথা ইতালিয়ান সমাজে ছড়াইয়া পড়িলে ইতালির নানা স্থানের নরনারী এখানে শফর করিতে আসিবে। তাহাতে হোটেলওয়ালাদের লাভ ষোল আনা। মেন্দলা পাহাড়ে, মেরাণ শহরে, ব্রেসাননে পল্লীতে, বলৎসান—সর্ব্বত্রই হোটেলওয়ালারা সাংবাদিকদিগকে ভোজ দিতেছে।

বিনা পয়সায় কয়েকটা ভোজ মারিয়া আসিলাম। বিনা পয়সায় রেলে শফরের নিমন্ত্রণও পাইয়াছিলাম।

হ্বেনিসের কাগজওয়ালা বলিলেন—"ইতালিয়ানেরা এখনো পাহাড়ী সৌন্দর্য্য এবং পাহাড়ের প্রাকৃতিক জীবন পছন্দ করিতে শিখে নাই। ইতালিয়ান আল্পসের বায়ু সেবন করিতে আসে জার্ম্মাণরা, ইংরেজরা, আমেরিকানরা। ইতালিয়ান সমাজে আল্প্‌স-প্রীতি জাগাইয়া তুলিবার জন্য আমরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। উত্তর ইয়োরোপীয়ানদের তুলনায় ইতালিয়ানরা বাস্তবিকই ঘরকুনো।"

স্ত্রী-স্বাধীনতার সীমানা

১

কোনো কোনো সাংবাদিক আসিয়াছিলেন সস্ত্রীক। কিন্তু "সিনরিণা (কুমারী) এস্তের লম্বার্দ স্বয়ং সাংবাদিক শ্রেণীর লোক। "হ্বিতা ফেম্মিনিলে" (নারী জীবন) নামক মাসিক কাগজ তাঁহার সম্পত্তি। কাগজের সম্পাদকও তিনি নিজেই। পত্রিকাটা সচিত্র। ইতালির নামজাদা লেখক-লেখিকারা এই মাসিকে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। শিল্প, সমাজ, সাহিত্য, রাষ্ট্র, আর্থিক কথা, পারিবারিক লেনদেন কিছুই বাদ যায় না। কাগজটা বাহির হয় রোমে। ইতালিয়ান মহিলা মহলে লম্বার্দর নাম আছে।

লম্বার্দ বলিলেন—"আমি নাংস্তনালিস্ত্‌ বটে, কিন্তু

ফাশিষ্ট নই। আমার যদি ভোট দিবার অধিকার থাকিত তাহা হইলে আমি 'দেমক্রাতিক' বা সাম্যপন্থীদলের স্বপক্ষে ভোট দিতাম। 'সিনিয়র' (শ্রীযুক্ত) আমেন্দলাকে নারীশ্রেণীর মুরুব্বি বিবেচনা করিতে পারি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন? মুসলিনি কি নারী জাতির বিপক্ষে?" লম্বার্দ জবাব দিলেন—"ফাশিষ্ট মাত্রেই নারী ক্ষমতার বিরোধী। আজ পর্য্যন্ত ইতালিতে নারীরা না পায় কোনো রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে ভোট দিতে, না পায় পার্ল্যামেণ্টে বা অন্য কোনো রাষ্ট্রীয় সভায় সভ্য হইতে। ইতালিয়ান নারী-সমাজের সম্মুখে এখনো বিপুল লড়াই মজুত রহিয়াছে।"

২

ইতালিয়ান মহিলা সমাজের অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্র সম্বন্ধে নানা খবর পাওয়া গেল। লাবরাতরিঅ প্রো দিসকুপাতে (বেকার নারীর কর্ম্মশালা) নামক প্রতিষ্ঠানের কথা শুনিলাম। যে সকল নারী কর্ম্মাভাবে বেকার বসিয়া থাকে তাহাদিগকে কাজ দিবার জন্য এই কর্ম্ম-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। সেলাইয়ের কাজ, রিফুকর্ম্ম, পোষাক তৈয়ারী করা ইত্যাদি নানাবিধ কাজের ব্যবস্থা আছে। বৎসর দুই তিন ধরিয়া "লাবরাতরিঅ"র (কর্ম্মশালার) কাজ চলিতেছে। এইটাকে বাড়াইয়া মেয়েদের জন্য একটা শিল্প-বাণিজ্য বিদ্যালয় গড়িয়া তুলিবার প্রস্তাব চলিতেছে।

"ভদ্র ঘরের মেয়েরা" "চির্কল লিচেয়ুম" নামে একটা ক্লাব তৈয়ারি করিয়াছেন। এইখানে লণ্ডন, বার্লিন ইত্যাদি নগরের

এই নামধারী ক্লাবের ঠাট অনুসারে লেন-দেন, "মিষ্টি মুখ" ইত্যাদি চলিয়া থাকে। মাঝে মাঝে দেশী বিদেশী নরনারীর বক্তৃতাও অনুষ্ঠিত হয়।

লম্বার্দ বলিলেন—"নামজাদা মহিলাদের ভিতর কুমারী তেরেসা লাব্রিঅলা ইতালির বাহিরেও প্রসিদ্ধ। ইনি রোমের বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের অধ্যাপক। আদালতে উকিলি করাও তাঁহার ব্যবসা।"

লাব্রিঅলা প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানসেবীর কন্যা। নিজেও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। নারী-কেরাণীদের সঙ্ঘ, নারী-মজুরদের সঙ্ঘ ইত্যাদি নানা শ্রেণীর নারী-সমিতি গঠন করার দিকে লাব্রিঅলার ঝোঁক দেখিতেছি। তাঁহার মতে এই সকল সঙ্ঘের সাহায্যেই ইতালিতে নারীরা "সাফ্রেজ" বা রাষ্ট্রীয় অধিকার দখল করিতে পারিবে। লাব্রিঅলা চরমপন্থী "ফেমিনিষ্ট" বা নারীত্বের পাণ্ডা নন।

লম্বার্দর আশাও বড় বেশী দূর যায় না। শুনিলাম—"ইতালিয়ান নারীরা ঘরের বাহিরে যাইয়া ব্যক্তিত্ব জাহির করিতে অসমর্থ। আমার সঙ্গে মার্কিন 'নারীত্ববাদিনী'দের অনেক আলোচনা হইয়াছে। তাঁহাদের সমান কর্ম্মতৎপরতা ইতালিয়ান নারী-সমাজে কোনো দিন দেখা দিবে কি না সন্দেহ। আমরা ল্যাটিন জাতীয় লোক। পুরুষের সঙ্গে টক্কর দিয়া তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে বোধ হয় এক প্রকার অসম্ভব। পুরুষের মুল্লুক হইতে নারীর মুল্লুক সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে দেখিতেই আমরা চিরাভ্যস্ত।"

"সিনিয়রা" (বিবাহিতা স্ত্রী) মারিয়া মাগ্রি জপেনি আর

একখানা মহিলা-পত্রিকার সম্পাদনে বাহাল আছেন। লাব্রিঅলা এবং লম্বার্দ'র মতন জপেনিও ইতালিয়ান নারী সমাজের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মতৎপরতা সম্বন্ধে নরম মতই পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহার কাগজের নাম "লা দন্না ইতালিয়ানা (ইতালিয়ান মহিলা)। দেশী বিদেশী সকল প্রকার মহিলা-জীবন এই পত্রিকায় আলোচিত হয়।

অবশ্য পৃথিবীতে আজকালকার নারীত্ববাদিনীদের (ফেমিনিষ্ট-দের) যে সকল আন্দোলন চলিতেছে তাহার প্রত্যেকটারই শাখা ও প্রতিনিধি ইতালিয়ান সমাজে আছে। রোম সেই সকল শাখা ও প্রতিনিধির কেন্দ্র।

কাউণ্টেস (জমিদার-পত্নী) গাব্রিয়েলা রাস্পনি নিখিল ইতালিয়ান মহিলা-পরিষদের প্রেসিডেণ্ট। ইতালির ক্যাথলিক সমাজের নারী-নায়ক হইতেছেন প্রিঞ্চিপেস্সা (রাজকুমারী) বান্দিনি। কয়েক বৎসর হইল বিশ্ব-নারী-পরিষদের কংগ্রেস বসিয়াছিল রোমে। তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীমতী আলিচে স্কিয়াহ্বনি। শুনিলাম সেই কংগ্রেসে ভারতীয় মহিলারাও কেহ কেহ যোগ দিয়াছিলেন।

পর্য্যটন-পত্রিকা

"রিহ্বিস্তা দেল আল্ত আদিজে" (ঊর্দ্ধ-আদিজের মাসিক পত্র) বল্‌ৎসান'য় বাহির হয়; সচিত্র কাগজ। ছবির সাহায্যে আদিজে উপত্যকার পাহাড়ী অঞ্চলগুলাকে দেশী বিদেশী সমাজে সুপরিচিত করা এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। এই পত্রিকায় ইতালিয়ান ভাষার

ইতালিতে বারকয়েক

একটা প্রবন্ধ লিখিবার ডাক পড়িল (এপ্রিল, ১৯২৫)। আলোচ্য বিষয় বলৎসান'র প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক দৃশ্য।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত বনাত্তা চার ভাষায় কথা বলিতে পারেন। সহকারী সম্পাদক হইতেছেন একজন কবি ও শিল্প-সমালোচক। কাগজটা সস্তা দরে বিক্রি হয়। অথচ ছবি ছাপা ইত্যাদি সবই উচ্চ শ্রেণীর চিজ্। শুনিলাম, সম্পাদন ও প্রকাশের বার্ষিক খরচ পড়ে প্রায় পনের হাজার টাকা। সাধারণতঃ ছাপা হয় হাজার দেড়েক কপি। গ্রীষ্মকালে পর্য্যটকদের ভিড়ের সময় পাঁচ ছয় হাজারের বেশী ছাপা হয় না।

এই ধরণের একটা উৎকৃষ্ট ভৌগোলিক ও পর্য্যটন-পত্রিকা ভারতে প্রকাশিত হইতে পারে না কেন ?

নবম অধ্যায়

ইতালি-ভ্রমণ ও "বর্ত্তমান জগৎ"

প্রথমবারকার ইতালি-ভ্রমণ

১

ইতালিতে ভবঘুরেগিরি করিয়াছি চার বার।* দুই বার স্থইটসাল্যাণ্ডের লুগানো হইতে, একবার রেলপথে, আর একবার হ্রদ-পথে। এই দুইবারে পাদহ্বা, হ্বেনিস, মিলান, ত্রেন্ত আর লেহ্বিক, প্রধানতঃ এই পাঁচ জনপদের সঙ্গে পরিচয়। ১৯২৪ সনের ফেব্রুয়ারির শেষাশেষি হইতে জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত এই অভিজ্ঞতার বহর। এই মাস চারেকের ভিতর ইতালিয়ান ভাষায় হাতে খড়ি দিতে চেষ্টা করি নাই। দু-একখানা ইতালিয়ান কেতাব ও কাগজ উল্টাইতে পাল্টাইতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। এই সময়ের মধ্যেই আবার একবার কিছুদিনের জন্য লুগানোয় ফিরিয়া গিয়াছিলাম। ঋতু হিসাবে উত্তর ইতালির লম্বার্দি, হ্বেনেৎসিয়া আর পাহাড়ী ত্রেন্তিন (বা জার্ম্মাণ-অষ্ট্রীয়ান পারিভাষিকে দক্ষিণ-টিরোল) এই তিন প্রদেশের বসন্ত আর গ্রীষ্ম চাখিতে পারিয়াছি।

ইতালিতে শেষ দুইবার আসি অষ্ট্রীয়ার ইন্‌স্‌ব্রুক হইতে।

* ১৯২৯-৩১ সনের ইতালি-ভ্রমণের পূর্ব্ববর্ত্তী কথা বলা হইতেছে।

ইতালিতে বারকয়েক

প্রথমবার ১৯২৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে। জুলাই ও আগষ্ট অর্থাৎ গ্রীষ্মের শেষার্দ্ধ কাটে "টিরোলী আল্পসের তালে তালে" আর জার্ম্মাণির ব্যাহ্বেরিয়া প্রদেশে। সেপ্টেম্বর মাস হইতে বসবাস ইতালির বল্‌ৎসান (জার্ম্মাণ, এ ক্ষেত্রে অষ্ট্রীয়ান, নাম বোৎসেন) নগরে। আঙ্গুর-পেয়ার-আপেল-পীচের এই আবেষ্টনে প্রায় দশ মাস কাটিয়াছিল, ১৯২৫ সনের জুন পর্য্যন্ত। মেরাণ আর হ্বিপিতেন (জার্ম্মাণ ষ্টার্‌ৎসিঙ) এই দুই অঞ্চলেও মাঝে মাঝে ঘুরাফিরা করিয়াছি।

পরে জুলাই আগষ্ট মাসের কিছুদিন আবার অষ্ট্রিয়ার ইন্‌স্‌ব্রুকে কাটিয়াছে। আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত কয়েক সপ্তাহ বল্‌ৎসানয় কাটাইয়া সেপ্টেম্বরস্থ প্রথম দিবসে হ্বেনিসে কিস্তী পাকড়াও করিলাম। যথা সময়ে ইতালিয়ান জাহাজ,—"ক্রাকহ্বিয়া",—বিনা দৈবদুর্ব্বিপাকে বোম্বাই বন্দরে আসিয়া ঠেকিল (১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২৫)। সাড়ে এগার বৎসর পূর্ব্বে ১৯১৪ সনের ৮ই এপ্রিল তারিখে বোম্বাইয়েই "যাচ্ছি কোথায় জানিনা ক' চল্লাম ছেড়ে হিন্দুস্থান।"

২

যাহা হউক, ইতালির বল্‌ৎসান জনপদে কাটিয়াছে প্রায় মাস এগার। এই খানেই— ১৯২৫ সনের ১লা জানুয়ারী তারিখে ইতালিয়ান ভাষায় হাতে খড়ি দিই। জার্ম্মাণ লেখক সাওয়ার প্রণীত "ইটালিয়েনিশে কোন্‌ভার্সাট্‌সিয়োনস্‌-গ্রামাটিক" (ইতালিয়ান্ কথা কওয়া ও ব্যাকরণ শিক্ষা) নামক গ্রন্থ গলাধঃ-

কব্‌ল করিতে লাগিয়া যাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪৪ (য়ুলিয়ুস গ্রোস কোং, হাইডেলবার্গ, ১৯২৩)। চার সপ্তাহে, প্রতিদিন ঘণ্টা দেড়েক করিয়া আন্দাজন খাইয়া লাগায় শ' তিনেক পৃষ্ঠা হজম করিয়া ফেলি। এই সঙ্গে সাথী ছিল একখানা জার্ম্মাণ-ইতালিয়ান অভিধান। তাহার পর হইতেই নানা প্রকার ইতালিয়ান কেতাব পড়িয়া চলিতেছি।

এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, চার সপ্তাহে যতখানি বা যতটুকু ইতালিয়ান দখল করিতে পারিয়াছি, ততটুকু জার্ম্মাণ দখল করিতে লাগিয়াছিল পাঁচ সপ্তাহ, আর ততটুকু ফরাসী দখল করিতে তিন সপ্তাহ দিয়াছিলাম! অর্থাৎ ফরাসীর চেয়ে ইতালিয়ান কঠিন বোধ হইয়াছে। ফরাসীর সাহায্যে ইতালিয়ানে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যায় নাই।

ফরাসী ভাষায় দখল কতটা আছে তাহা ফ্রান্সে থাকিতে থাকিতেই ফরাসী নরনারীর মহলে মহলে,—"খোলা মাঠে" যাচাই করাইবার সুযোগ পাইয়াছি। জার্ম্মাণির ঘাটে ঘাটেও জার্ম্মাণ বিদ্যার দৌড় "কাগজে কলমে" পরখ করানো গিয়াছে! কিন্তু ইতালিয়ানে এইরূপ খোলা মাঠের যাচাই সম্ভবপর হয় নাই। ফ্রান্সে, প্রথম হইতেই, লোকজনের সঙ্গে চিঠি-পত্র চালাইয়াছি,—বিশ্ববিদ্যালয়ে, আকাদেমীতে বক্তৃতা করিয়াছি,—আর মোলাকাতে বোল ব্যবহার করিয়াছি,—আগাগোড়া ফরাসীতে। জার্ম্মাণিতে অষ্ট্রিয়ায় আর সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডেও সর্ব্বত্র সকল ক্ষেত্রেই চালাইয়াছি ঐ সকল দেশবাসীর মাতৃভাষা জার্ম্মাণ।

কিন্তু ইতালিতে,—আশ্চর্য্যের কথা,—একদিনও ইতালিয়ান

ভাষায় কথা বলি নাই।* নিজে কোনো দিন একখানা চিঠি পর্য্যন্ত ইতালিয়ানে লিখি নাই। একটা প্রবন্ধ রচনায় হাত মক্‌স করিয়াছি মাত্র। সম্পাদকেরা সেটা কাগজে ছাপিয়াছেনও। যতদিন ইতালিয়ান জানিতাম না,—যথা পাদোহ্বা, হ্বেনিস, মিলান ইত্যাদি জনপদে,—ততদিন চালাইয়াছি ফরাসী। আর যেদিন হইতে ইতালিয়ান জানি,—যথা বল্‌ৎসানয়, সেদিন হইতে হ্বেনিসে সওয়ারি হওয়া পর্য্যন্ত পাঁচ ছয় মাস ধরিয়া প্রতিদিনই আজ এখানে, কাল ওখানে চলাফেরা করার সম্ভাবনা ছিল। ইতালিতে কতদিন থাকা হইবে তাহার স্থিরতাই ছিল না। যখন তখন ইতালি ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। এই অবস্থায় ইতালিয়ান ভাষায় লেখা-লেখির অভ্যাস করিতে একদম চেষ্টিত হই নাই,—ঐ প্রবন্ধটা ছাড়া। হরেক রকম ইতালিয়ান বই আর কাগজ পড়িয়াছি মাত্র। তবে ইতালিয়ান নরনারীর নিকট হইতে পাওয়া ইতালিয়ান ভাষায় লেখা চিঠি বুঝিবার জন্য কোনো দোভাষীর সাহায্য লইতে হয় নাই।

৩

এই সূত্রে ইতালি-প্রবাসের আর একটা বিশেষত্ব উল্লেখ করা আবশ্যক। অধিকাংশ সময়,—মাস এগার কাটিয়াছে বল্‌ৎসানয়, মেরাণয়, হ্বিপিতেনয়। এই শহর তিনটার নরনারী আগাগোড়া জার্ম্মাণ (অষ্ট্রিয়ান)। রাষ্ট্রিক হিসাবে এই অঞ্চল মহাযুদ্ধের পর হইতে ইতালির একটা প্রদেশ বটে। কিন্তু এখানে ইতালির গন্ধ

* দ্বিতীয় বারকার ইয়োরোপ ভ্রমণের (১৯২৯-৩১) বৃত্তান্ত স্বতন্ত্র।

মাত্র নাই। ইন্‌স্‌ব্রুককে অষ্ট্রীয়ান-জার্ম্মাণরা জানে উত্তর-টিরোলের কেন্দ্র বলিয়া তাহাদের বিবেচনায় বল্‌ৎসান (বোৎসেন সেইরূপ দক্ষিণ-টিরোলের কেন্দ্র। কাজেই বল্‌ৎসানের আবহাওয়ায় দশ-এগার মাস কাটানো আর ইন্‌স্‌ব্রুকে দশ এগার মাস কাটানো একই কথা,—কি ভাষায়, কি সাহিত্যে, কি সৌজন্য-শিষ্টাচারে, কি লেনদেনে, কি হাসি-ঠাট্টায়। সুতরাং এই কয় মাসের জীবনকে ইতালিয়ান অভিজ্ঞতা রূপে বিবৃত না করিলেই বোধ হয় ইতালির প্রতি সুবিচার করা হইবে।

রোম, ফ্লোরেন্স, বোলোনিয়া, নেপল্‌স ইত্যাদি শহর হইতে বক্তৃতাদির নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল। কিন্তু সে সব গ্রহণ করা হয় নাই, ওসব দিকে যাওয়াই হয় নাই। মিলানো, পাদোভা ইত্যাদি শহরগুলা খাঁটি ইতালিয়ান সভ্যতারই কেন্দ্র। কাজেই বর্ত্তমান গ্রন্থের যে সকল অভিজ্ঞতা এই সব জনপদের সন্তান, সেই সকল অভিজ্ঞতায় আসল ইতালির আত্মাই স্পর্শ করা হইতেছে।

বল্‌ৎসানয় থাকিবার সময় ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকা আর পুস্তকাদি হইতে নানা তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করা গিয়াছে। তাহা নানা আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

"দুনিয়ার আবহাওয়া" (১৯২৫) গ্রন্থের কয়েক অধ্যায়ে "ইতালির কোনোমি ক্যাবিনেট", "ইতালির দি স্কন্ত ব্যাঙ্ক", "জেনোয়া কনফারেন্সের আবহাওয়ায়", "ইতালি ও মধ্য ইয়োরোপ", "ইতালি ও আঙ্গোরা", "ইতালিতে বোলশেভিকী", "ইতালিতে ম্যালেরিয়া লোপ", "ইতালির কর্ফু দখল" "বৃহত্তর ইতালি", "মুসলিনি ও

দিরিভেরা", "সুইস-ইতালিয়ান সীমানায়", "উত্তর ইতালির সমাজ সমস্তা" নামক বিভিন্ন বিষয় বিবৃত আছে। অধ্যায়গুলা বর্ত্তমান গ্রন্থের সঙ্গে উল্টাইয়া পাণ্টাইয়া দেখা যাইতে পারে।

ইতালি বিষয়ক কয়েক অধ্যায় "ইকনমিক ডেভেলপ্ মেণ্ট" (আর্থিক উন্নতি, মাদ্রাজ, ১৯২৬) এবং "পলিটিক্স্ অব বাউণ্ডার।জ" (সীমানার রাষ্ট্রনীতি, কলিকাতা, ১৯২৬) নামক দুই ইংরেজি গ্রন্থেও প্রকাশিত হইয়াছে। এই বই দুইটার কিয়দংশ ইতালির নানা কেন্দ্রে লেখা হইয়াছিল। আর একখানা বই, "বিব্লিও-গ্রাফিক্যাল, কালচার‍্যাল অ্যাণ্ড এডুকেশ্যনাল নিউজ ফ্রম আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি অ্যাণ্ড ইতালি" নামে বাহির হইতেছে। তাহাতেও ইতালির কথা আছে।

৪

ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি (অষ্ট্রীয়া ও সুইটসার্ল্যাণ্ড), ফ্রান্স এবং আমেরিকার তুলনায় ইতালিকে বর্ত্তমান জগতের সভ্যতায় অনেকটা ছোট মনে হইয়াছে। এই কারণেই ইতালিতে যুবক ভারতের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ বহু খুঁটিনাটি পাইবার সম্ভাবনা। ইতালির পল্লীতে শহরে অনেকদিন ভবঘুরেগিরি করিতে পারিলে ভারতসন্তান স্বদেশের জন্ত নানা প্রকার সঙ্কেত ও ইঙ্গিত সংগ্রহ করিতে পারিবেন। ভারতবর্ষ আজ বর্ত্তমানে সভ্যতার অনেক নিম্নস্তরে অবস্থিত। আধুনিক মানবের আধ্যাত্মিকতা ভারতীয় নরনারীর জীবনে নেহাৎ কম দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তরে দাঁড়াইয়া ইংরেজ, জার্ম্মাণ, মার্কিণ ও ফরাসী আধ্যাত্মিকতার লাগাল পাওয়া

যারপর নাই কঠিন। ইতালিয়ানরা ঠিক যেন মাঝামাঝি অবস্থায় রহিয়াছে।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া ভারতের তরফ হইতে ইতালিকে ইয়োরোপের জাপান অথবা জাপানকে এশিয়ার ইতালি বিবেচনা করা আমার দস্তুর। ভারতের রাষ্ট্রীয়, আর্থিক ও আত্মিক উন্নতির কারিগরেরা ইতালিয়ান জাপানী স্তরটা আগে পাশ না করিয়া পরবর্ত্তী স্তরে পা ফেলিতে পারিবেন না। ইতালির সঙ্গে আর জাপানের সঙ্গে যুবক ভারতের আত্মীয়তা নিবিড়রূপে কায়েম করা আবশ্যক"।

আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। ইতালি যুদ্ধের পর হইতে,—বিশেষতঃ মুসলিনির আমলে,—বেগে উন্নতি লাভ করিতেছে। রাষ্ট্রীয় ডেমোক্রেসী বা স্বরাজের কথা ভুলিয়া এই মত জারি করিতেছি। ১৮৭০ সনের পর জার্ম্মাণি ইয়োরোপে যে-বেগে দৌড়িতেছিল, ১৯১৮-২২ সনের পর ইতালি যেন প্রায় সেই বেগে দৌড়িতেছে। আগামী ত্রিশ বৎসরের ভিতর ইতালি ইয়োরোপের এক প্রবল শক্তিতে দাঁড়াইয়া যাইবে। এই কারণেও উন্নতি-প্রয়াসী যুবক ভারতের পক্ষে ইতালির সঙ্গে সাহচর্য্য বিশেষ দরকারী।"

"বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলীর আবহাওয়া

১

এই কেতাব "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলীর শেষ খণ্ড। পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে,—(১) কবরের দেশে দিন পনর (১৯১৫, ২১০

পৃষ্ঠা), (২) ইংরেজের জন্মভূমি (১৯১৬, ৫৮৬ পৃষ্ঠা), (৩) বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র (১৯১৫, ১৩০ পৃষ্ঠা), (৪) ইয়াঙ্কিস্থান বা অতিরঞ্জিত ইয়োরোপ (১৯২৩, ৮২৪ পৃষ্ঠা), (৫) নবীন এশিয়ার জন্মদাতা,—জাপান (১৯২৭, ৪৮৫ পৃষ্ঠা), (৬) বর্ত্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য (১৯২৮, ৪৫০ পৃষ্ঠা)। (৭) সুইটসার্ল্যাণ্ড (৭৫ পৃষ্ঠা)।

নিম্নলিখিত খণ্ডগুলা যন্ত্রস্থ :—(৮) ফ্রান্স (৩০০ পৃষ্ঠা), (৯) জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়া (৬০০ পৃষ্ঠা)।

তাহা ছাড়া "দুনিয়ার আবহাওয়া"কে (১৯২৫, ২৭৬ পৃষ্ঠা) এই গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত করা চলে। এটা অবশ্য পর্য্যটন-কাহিনী নয়। জার্ম্মাণিতে, অষ্ট্রিয়ায়, সুইটসার্ল্যাণ্ডে ও ইতালিতে থাকিবার সময়ে জার্ম্মাণ, ফরাসী ও ইতালিয়ান কেতাব ও কাগজের মারফৎ যাহা শুনা গিয়াছে, এই বই তাহারই দলিল। এই সঙ্গে 'নবীন রুশিয়ার জীবন প্রভাত'' (১০০ পৃষ্ঠা প্রায়) ও উল্লেখযোগ্য। বইটা জার্ম্মাণ গ্রন্থের তর্জ্জমা-সার।

পর্য্যটক-কাহিনী "ডায়েরী" বা "দিন-লিপি" হিসাবে আত্মজীবন চরিত বিশেষ। "বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীকেও আত্মজীবন-চরিত বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই সমুদয়ের ভিতর আমি অমুক সময়ে অমুক লোকের সঙ্গে এইরূপ কথা বলিলাম অথবা অমুক লোকের নিকট এইরূপ শুনিলাম কিম্বা আজ সকালে অথবা বিকালে অমুক স্থান ছাড়িয়া অমুক স্থানের দিকে রওনা হইলাম ইত্যাদি শ্রেণীর তথ্য ছাড়া আত্ম-চরিতের আর-কোনো বস্তু হয়ত পাওয়া যাইবে না। যথাসম্ভব নিজের সুখ-দুঃখ, উল্লাস-

ইতালিতে বারকয়েক

উচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখিয়া কাটখোট্টা বস্তুনিষ্ঠভাবে দুনিয়ার নর-নারীকে ভারত সন্তানের সঙ্গে মোলাকাৎ করাইবার চেষ্টা করিয়াছি। তবে জগতের সভ্যতা জরীপ করিবার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থাবলীর আবির্ভাব। কাজেই জরীপ করিবার প্রণালীটার ভিতর আর জরীপের ফলাফল প্রচারের ভিতর লেখকের নিজস্ব ধরা পড়িতে বাধ্য

এই হাজার চারেকেরও বেশী পৃষ্ঠায় দুনিয়ার নানা দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, রাষ্ট্র-সমাজ-ধর্ম্ম-পরিবার ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য নানা প্রকারে খুঁজিতে চেষ্টা করিয়াছি। সমাজ-তত্ত্ব, তুলনামূলক ইতিহাস, সাহিত্য, সুকুমার শিল্প, নৃতত্ত্ব, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি বিদ্যার অনেক কথাই এই সকল বইয়ের ভিতর আছে। কিন্তু লেখকের পক্ষে গ্রন্থাবলীটা এক বিপুল বিশ্বকোষের সূচীপত্র মাত্র। প্রত্যেক খণ্ডকেই বিভিন্ন দেশ-সম্বন্ধে চাক্ষুষ প্রমাণ-পঞ্জীর সংগ্রহালয় মাত্র বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

তথাপি একথাও বলিয়া রাখা উচিত যে, প্রত্যেক খণ্ডের রচনায়ই হাড়ভাঙা খাটুনি আবশ্যক হইয়াছে। লাইব্রেরিতে বই ঘাঁটাঘাঁটি করা, হাসপাতাল-ব্যাঙ্ক-বিজ্ঞান শালা-চিত্রগৃহ-ফ্যাক্টরি-মিউজিয়াম-প্রদর্শনীর বিবরণী পড়িয়া রাখা, বহুসংখ্যক লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইয়া নানা মুনির নানা মতের সংস্পর্শে আসা আর প্রতি-দিনই দৈনিক অনুসন্ধান-গবেষণা-টীকাটীপ্পনী যথাসময়ে সংক্ষেপে বা সূত্রাকারে কাগজস্থ করা যারপর নাই মেহনৎ-সাপেক্ষ। তাহার উপর অন্যান্য লেখাপড়া আর কাজকর্ম্ম ত আছেই।

ইতালিতে বারকয়েক

২

বিদেশে অনুষ্ঠিত কাজকর্ম্মের তালিকায় দুইটা দফা বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। একটা হইতেছে উচ্চতম বিশ্ববিদ্যালয়ে আর পণ্ডিত-পরিষদে বক্তৃতা। আর একটা উচ্চতম মাসিক, ত্রৈমাসিক বা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধপ্রকাশ। দফা দুইটা কাগজে কলমে যত সোজা মালুম হইতেছে, প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে তত সোজা নয়। এই সকল কথা পূর্ব্বে নানাস্থানে আলোচনা করিয়াছি। এইখানে দু একটা কথা বলিব।

১৯১৪-২৫ সন নেহাৎ "সেকেলে" যুগ নয়। কিন্তু এশিয়ার সঙ্গে (অবশ্য ভারতের সঙ্গেও) ইয়োরামেরিকার "আত্মিক" লেন-দেন-ঘটিত কারবারে এই যুগটা একপ্রকার "সেকেলে" যুগই বটে। কম্‌সেকম এই বৎসর বার'র ভিতরে একাধিক যুগ আছে। তাহা ছাড়া বিগত তিন চার বৎসরের ভিতরেই অনেক কিছু নতুন নতুন ঘটিয়াছে আর ঘটিবার সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে।

১৯১৪-১৮ সনের যুগটা ধরা যাউক। তখনকার দিনে, লড়াইয়ের যুগে, যে ইয়োরামেরিকা বর্ত্তমান ছিল, সেই ইয়োরামেরিকার হোম্‌রা-চোম্‌রা লোকেরা, অর্থাৎ "বাঘা" "বাঘা" পণ্ডিত আর জাঁদরেল প্রতিষ্ঠানসমূহ,—এশিয়ার (অবশ্য ভারতবর্ষেরও) নরনারীকে "সমানে" "সমানে" লেখক, বক্তা, গবেষক ইত্যাদি সমঝিতে অভ্যস্ত ছিল না। "ইয়োরামেরিকায় ভারতসন্তান" শব্দের প্রধান বা একমাত্র অর্থই ছিল "ইয়োরামেরিকান পণ্ডিতদের ভারতীয় ছাত্র বা শিষ্য, ডিগ্রিপ্রার্থী বা সার্টিফিকেটের উমেদার।" কোনো ভারতসন্তান ইয়োরামেরিকার বড় বড় পণ্ডিতদের বৈঠকে বক্তৃতা

করিতে অধিকারী এইরূপ চিন্তা পর্য্যন্ত "সেকালে" পাশ্চাত্য মগজে,—এমন কি আমেরিকায়ও একপ্রকার ঠাঁই পাইত না। তবে রাস্তায় ঘাটে বক্তৃতা করা, ক্লাবে-নৈশমজলিসে আলোচনা চালানো, অথবা ক্বচিৎ কখনো দ্বিতীয়-তৃতীয় বা আরও নিম্ন-শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় নদনদী, স্ত্রীপুরুষের বেশভূষা, সাপব্যাঙ্, হাঁচিটিক্‌টিকি, অহিংসা, বিশ্বপ্রেম ইত্যাদি লইয়া চিত্তাকর্ষক গল্প শুনানো হয়ত নেহাৎ অপ্রচলিত ছিল না।

কিন্তু ১৯০৫ হইতে ১৯১৫ পর্য্যন্ত আটদশ বৎসরের যুবক এশিয়া ইয়োরামেরিকার "বড় বড় পণ্ডিতমহলে" দন্তস্ফুট করিবার সুযোগ একপ্রকার পায় নাই বলা চলে। কে কোথায় কতটুকু সুযোগ পাইয়াছে আর তাহার কিম্মৎ কত তাহা খুঁজিয়া দেখা বর্ত্তমান পর্য্যটকের অন্যতম ধান্ধা ছিল। নানাস্থানে তাহার আলোচনা করিয়াছিও। সমাজতত্ত্ব বিদ্যায় আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যুবক ভারতের যাঁহারা অনুসন্ধান-গবেষণা চালাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষেও এই বিষয়টা বেশ গভীরভাবে বস্তুনিষ্ঠরূপে তলাইয়া মজাইয়া আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। বর্ত্তমান জগতের সভ্যতার ইতিহাসে এই আন্তর্জ্জাতিক তথ্যগুলা মূল্যবান।

যাহা হউক, জগতের সর্ব্বত্র "বড় বড় পণ্ডিতমহলে" ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে এবং ভারতীয় পাণ্ডিত্যের বিরুদ্ধে প্রবল কুসংস্কার ও বিদ্বেষ লক্ষ্য করা মোটের উপর আমার অভিজ্ঞতার প্রধান কথা। সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে যে, ভারতসন্তানকে কোনো উচ্চ অঙ্গের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় সহযোগীরূপে নিমন্ত্রণ করা তাঁহাদের মজ্জা-বিরুদ্ধ কাণ্ড। ইয়োরামেরিকানদের এই মজ্জাগত

কুসংস্কার ভাঙিয়া দিবার কাজে এই অধমকে—অবশ্য নিজ-গণ্ডীর ভিতর,—অনেক গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইয়াছে। বহুৎ ধাক্কাধাক্কির পর আমেরিকায়, ফ্রান্সে, জার্ম্মাণিতে এক একটা দুয়ার খোলাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছি। আর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, যাঁহারা ভারতসন্তানের জন্য এইরূপ দুয়ার খুলিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ কাণ্ড নিজ নিজ কোষ্ঠীর সর্ব্বপ্রথম ঘটনা।

এই লড়াই আজও শেষ হয় নাই। যুবক ভারতকে বহুদিন ধরিয়া এই বিজ্ঞান-সংগ্রামে লাগিয়া থাকিতে হইবে। ভারতসন্তান মাত্রেই যে পশ্চিমাদের ছাত্র নয়, আর তাহাদের "ফ্যাকাল্টি"তে দাঁড়াইয়া "বাঘা" "বাঘা" লোকের সম্মুখে কোনো কোনো ভারত-সন্তানও যে মতামত প্রকাশ করিতে অধিকারী,—এই দাবী প্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইয়োরামেরিকায় গণ্ডা গণ্ডা উপযুক্ত ভারতীয় পর্য্যটকের নিয়মিত স্রোত বহানো আবশ্যক।

৩

উচ্চতম বিশ্ববিদ্যালয়ে বা পণ্ডিত-পরিষদে অথবা অধ্যাপকের "ফ্যাকাল্টি"তে বক্তৃতা করিবার সুযোগ পাইলেই কিস্তী মাত হইল, এইরূপ সমঝিয়া রাখা উচিত নয়। "এ সব দৈত্য নহে তেমন।" কোনো কোনো সময়ে হয়ত ভদ্রতার খাতিরে কোনো ভারত-সন্তানকে কোনো পণ্ডিত-বৈঠকে খানিকটা বক্তৃতা করিবার সুযোগ দেওয়া হইল। কিন্তু সেই বক্তৃতাটা কোনো উচ্চাঙ্গের মাসিকে, ত্রৈমাসিকে বা পরিষৎ-পত্রিকায় ছাপাছাপি লইয়া আবার মাথা কাটাকাটি! কেন না, যে জিনিষটা কোনো বড় কাগজে ছাপা

হইয়া যায়, তাহার ইজ্জৎ তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞান-জগতে খুব বেশী, অন্ততঃ পণ্ডিত মহলে লোকজনের ধারণা এইরূপ! লক্ষ্য করিয়াছি যে, এই ইজ্জৎ ভারতসন্তানকে বড় শীঘ্র ইয়োরামেরিকান পণ্ডিতেরা দিতে প্রস্তুত নয়।

যে যুগের অভিজ্ঞতা বর্ত্তমান লেখকের জীবন-কথা, সেই যুগে নানান্ দেশের নানান্ ঘাটিতে ভারত-বিদ্বেষ ঘনীভূত দেখিয়াছি। কোনো একটা"দৈনিক"কাগজে,—বিশেষতঃ"সোশ্যালিষ্ট"পরিচালিত দৈনিকে—"রাষ্ট্রনীতি"-ঘেঁশা লেখা হয়ত বা অল্প মেহনতেই ছাপা হইতে পারে। কিন্তু "বুর্জোআ"-মহলে, "বৈজ্ঞানিক" পত্রিকায়, "দার্শনিক" আখড়ায় ভারতীয় মগজের রচনা ছাপার হরপে খোদা থাকিবে, ইহা একপ্রকার আকাশ-কুসুম বিশেষ।

ঘটনাচক্রে এই অধমকে পত্রিকা-গত লেখালেখির দুনিয়ায়ও বেশ একটু লড়িতে হইয়াছে। বড় বড় ঠাঁইয়ের এখানে-ওখানে,— ফ্রান্সে, জার্ম্মাণিতে, আমেরিকায়,—ভারতীয় কমলের আঁচড় রাখিয়া আসা পর্য্যটন-কাণ্ডের একটা লক্ষ্য ছিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ভারতসন্তানকে এইরূপ আঁচড় মারিবার সাহসে উৎসাহিত করিবার জন্য প্রবাসের সময় ত চেষ্টা করিয়াছিই, আর আজ ও করিতেছি। হয়ত বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ধরণের উৎসাহ প্রদানের ফল কিছু কিছু ফলিয়াছেও।

৪

ইয়োরামেরিকার প্রসিদ্ধ পত্রিকায় লেখালেখি করা যত কঠিন, সেখানকার প্রকাশকদের দ্বারা নিজ নিজ বই প্রচার করানো তত

কঠিন নয়। "হাতে-কলমে" দুই প্রকার অভিজ্ঞতাই আছে। এই জন্য প্রভেদটা পাকড়াও করিতে পারা গিয়াছে।

লেখকের ট্যাঁকে যদি পয়সার জোর থাকে আর বইটা যদি টেক্‌স্‌ট্‌বুকরূপে "চলনসই" হয় অথবা ঘটনাচক্রে বইটা যদি বিক্রী করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে বিদেশী প্রকাশকেরা ভারতীয় গ্রন্থকারদের বই ছাপিতে বেশী ইতস্ততঃ করে না—ভারত-বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও। তবু আজ পর্য্যন্ত বিদেশে-ছাপা ভারত সন্তানের বইয়ের সংখ্যা খুবই কম। বই ছাপাছাপি অনেকটা একপ্রকার নিছক ব্যবসার কথা। কিন্তু পত্রিকায় প্রবন্ধ-প্রকাশ পয়সার খেলা নয়, এক্ষেত্রে প্রধানতঃ খাঁটি বৈজ্ঞানিক কিম্মৎ অপর দিকে খাঁটি ভারত-বিদ্বেষ এই দুই শক্তির লড়াই চলিয়া থাকে। এই লড়াইয়ে ভারতবাসীর কিছু কিছু বিজয়লাভ নেহাৎ সেদিনকার কথা মাত্র। যার যেখানে যতটুকু শক্তি বা সুযোগ আছে, তার সেটুকুর সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

যুবক ভারতের লেখক-বক্তা-পণ্ডিতদিগকে ইয়োরামেরিকার "উচ্চতম" প্রতিষ্ঠানে আর "উচ্চতম" পত্রিকায় ভারতীয় মাথার ঘী জাহির করিবার জন্য ব্রতবদ্ধ করা আমি স্বদেশ-সেবার এক বিপুল অঙ্গ বিবেচনা করিয়া থাকি। বর্ত্তমান জগতের উপযোগী "বৃহত্তর-ভারত" গড়িয়া তুলিবার কাজে এইরূপ মগজের অভিযান অন্যতম খুঁটা।

দুনিয়ার ভ্রমণ-সাহিত্য

১

একালের দুনিয়ায় পর্য্যটকদের ভিতর সাহিত্য-সংসারে যে কয় জন লেখক নং ১ শ্রেণীর অন্তর্গত সুইডেনের স্বেন হেডিন, ফ্রান্সের প্যের লতি আর ইংল্যাণ্ডের নাথানিয়েল কার্জন অন্যতম। ঘটনাচক্রে এই তিন জনই এশিয়া-পর্য্যটক আর এশিয়া-বিষয়ক সাহিত্যের স্রষ্টা। উনবিংশ আর বিংশ শতাব্দীতে পর্য্যটকদের সংখ্যা অগণিত, আর পর্য্যটন-সাহিত্যও প্রচুর। রকমারি উদ্দেশ্য লইয়া জগতের নরনারী একালে দুনিয়ায় টোটো করিয়া থাকে। আর এই ভবঘুরে-বিবরণী হইতে নানান্ জাতি নানা প্রকার রসকস্ নিংড়াইয়া লইতে অভ্যস্ত। এই কারণে "বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর শেষ ভূমিকায় এই তিন জন শ্রেষ্ঠ লেখকের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

"লর্ড" আর লাট হইবার বহুপূর্ব্বে ইংরেজ যুবা নাথানিয়েল কার্জন গোটা এশিয়াকে নখদর্পণে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীসমূহ একাধিক গ্রন্থে বাহির হইয়াছে। "রাশিয়া ইন্ সেণ্ট্রাল এশিয়া" গ্রন্থে (১৮৯৫) মধ্য এশিয়ার খুটিনাটি বিবৃত আছে। পারস্তের অলিগলি ইংরেজ সমাজে সুপরিচিত করাইবার জন্য তিনি "পার্শিয়া অ্যাণ্ড দি পার্শিয়ান কোয়েস্‌চ্যান্" রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার "প্রব্‌লেমস্ অব দি ফার ইষ্ট" গ্রন্থ (১৮৯৪) জাপান, চীন ও কোরীয়াকে বিলাতের নরনারীর নিকট খুলিয়া ধরিয়াছে। ১৮৮৪-৯৪ সনের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা তাঁহার নব প্রকাশিত আফগানিস্থান-বিষয়ক গ্রন্থেও প্রতিষ্ঠিত।

ইতালিতে বারকয়েক

এশিয়া-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ লোক,—এশিয়ান বা ইয়োরামেরিকান, —কার্জনের সমান খুব অল্পই ছিল। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থগুলাকে খাঁটি ভ্রমণ-সাহিত্যরূপে বিবৃত করা চলিবে না। ভ্রমণের অভিজ্ঞতা গুলা লইয়া পরবর্ত্তীকালে কয়েক বৎসর খাটিয়া আধা-ঐতিহাসিক আধা-ভৌগোলিক সাহিত্য সৃষ্টি করা তাঁহার বিশেষত্ব। এই হিসাবে "বর্ত্তমান-জগৎ"-গ্রন্থাবলীর রোজনামচা বা ডায়েরি-রীতি কার্জনের লিখন-প্রণালী হইতে আগাগোড়া স্বতন্ত্র। এই সাহিত্যে "রোজ আনা রোজ খাওয়া" প্রথা কায়েম করা হইয়াছে। প্রায় কোথায়ও একদিনকার বাসি মালও রাখা হইয়াছে কিনা সন্দেহ। শৃঙ্খলাবদ্ধ ইতিহাস বা ঐতিহাসিক ধারার বৃত্তান্ত প্রকাশ করা "বর্ত্তমান জগৎ"-বইগুলার মতলব নয়। অধিকন্তু ইংরেজ যুবা ছিলেন সাহিত্যের আসরে প্রধানতঃ বা একমাত্র রাষ্ট্রনীতির বেপারী। "বর্ত্তমান জগৎ" রাষ্ট্রনীতি ছাড়া অন্যান্য ঘাটেও ডিঙা লাগাইয়া পানি চাখিয়া দেখিতে সচেষ্ট।

লর্ড কার্জনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া বাঙ্‌লার নরনারী ১৯০৫ সনে যুবক ভারতকে জন্ম দিয়াছে। কাজেই হয়ত যুবক ভারত কার্জন-সাহিত্যকে সুনজরে দেখিতে চাহে কিনা সন্দেহ। কিন্তু ইংরেজদের স্বদেশ-সেবক হিসাবে কার্জনের কর্ত্তব্যজ্ঞান আর স্বজাতিপ্রিয়তা যুবক ভারতকেও স্বদেশসেবার আর স্বরাজ-সাধনার নয়া নয়া পথ দেখাইয়া দিতে সমর্থ। অপর পক্ষে কার্জনের মাথার জোর, পাণ্ডিত্য, বিদ্যানুরাগ ও বিজ্ঞান-গবেষণা অতি উচ্চাঙ্গের বস্তু। অধিকন্তু লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক হিসাবে কার্জন যত খানি পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা দেখিলে যুবক

ভারতও পরিশ্রমী আর কর্ম্মযোগী হইতে শিখিবে বলিয়া বিশ্বাস করা চলে।”

কার্জনের ভ্রমণ-সাহিত্য প্রচুর পরিমাণে আত্মবিশ্বাস, আত্মনিষ্ঠা, ব্যক্তিত্বের “অহঙ্কার’ ইত্যাদি সদ্‌গুণের প্রতিমূর্ত্তি। সহজেই লোকেরা সাধারণতঃ এই সদ্‌গুণকে “আত্মম্ভরিত্ব” বা অহঙ্কারের অসদর্থে মহাদোষরূপে ধরিয়া লইতে হয়ত প্রলুব্ধ হইবে। কিন্তু মার্কিণ কবি ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান প্রণীত “লীহ্বস্‌ অব্‌ গ্রাস্‌” (তৃণ-পত্র) নামক কাব্য-গদ্যে বা গদ্য-কাব্যে যে ধরণের “আমি, আমি, অহং, অহং” এর ধুয়া দেখিতে পাই, কার্জন-সাহিত্যের “অহঙ্কার”ও অনেকটা যেন সেই ধরণের চীজ। এই চীজ ভারতীয় সাহিত্যেও অজানা নয়। সেই ঋগ্‌বেদ-অথর্ব্ববেদের আমলেও দুনিয়াকে লক্ষ্য করিয়া “পুরুষ” বলিতেছেন :—

“অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্‌।

অভীষাড়স্মি বিশ্বষাড়্‌ আশামাশাং বিশাষহি॥”

অর্থাৎ “পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামে আমায় জানে সবে ধরাতে,

জেতা আমি বিশ্বজয়ী,

জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে॥”

কার্জন-সাহিত্য এই বৈদিক “আধ্যাত্মিকতায়ই ভরপুর। যৌবনের অহঙ্কার এই রচনাবলীর প্রাণ। যুবক ভারতে এই সকল রচনা সমাদৃত হইবার যোগ্য। কার্জন যৌবনশক্তির অবতার।

২

এইবার প্যের লতির কথা কিছু বলিব। একালের গদ্য-লেথকগণের আসরে ফরাসীরা লতিকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া থাকে। তাঁহার রচনাগুলা এক হিসাবে সবই ভ্রমণমূলক। ফ্রান্স-বিষয়ক এক বইয়ে আছে পিরেনীজ পাহাড়ের পল্লীজীবন চিত্রিত। আর এক বইয়ের কথাবস্তু ব্রিটানি প্রদেশের চাষী জীবন হইতে গৃহীত। লতির তিনখানা বইয়ে আফ্রিকার জনপদ ও নরনারী অমর হইয়া রহিয়াছে। একখানা মরক্কো-বিষয়ক, একটায় সাহারা মরুর গল্প আর একটায় মিশরের পুরা-কাহিনী মূর্ত্তি পাইয়াছে।

এশিয়া-বিষয়ক বইয়ের ভিতর ভারত-কথা একটার আলোচ্য বস্তু। এক গ্রন্থের প্রাণ জেরুজেলেমের খৃষ্টকথা। দুই কেতাব লেখা হইয়াছে জাপান সম্বন্ধে। আর শ্যাম-দেশের "ওঙ্কারধাম" চতুর্থ বইয়ের কথা জোগাইয়াছে।

লতিকে কবি, ঔপন্যাসিক বা আখ্যায়িকা-লেখক হিসাবে সম্বর্দ্ধনা করিলেই তাঁহার রচনাবলীর যথার্থ ইজ্জৎ দেওয়া হইবে। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীগুলার ভিতর বস্তুনিষ্ঠা চরম মাত্রায়ই দেখিতে পাই। মিথ্যা কথায়, অলীক গল্পে বা আজগুবি কল্পনায় লাগাম ঢিল দেওয়া লতির উপন্যাসশিল্পের অঙ্গ নয়। কিন্তু তথাপি ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক বা নৃতত্ত্ব বিষয়ক রচনা হিসাবে এই সমুদয় কেতাব ঘাঁটিতে বসিলে অন্যায় করা হইবে। সরস সুকুমার সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নমুনা চাখিয়া দেখিবার জন্যই লতির সাহচর্য্য করা উচিত। বলা বাহুল্য, "বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর পশ্চাতে

অনুপ্রেরণা আর সাহিত্য-শক্তি বিলকুল অন্য ধরণের। অধিকন্তু লতি প্রধানতঃ বা একমাত্র ধর্ম্ম, মন্দির, কারুকার্য্য, পরকাল, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি লইয়া ব্যস্ত। বস্তুনিষ্ঠ হইয়াও লতি ষোল আনা রোমান্টিক বা ভাবুক। এই হিসাবে লতির মগজে আর কার্জনের মগজে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কার্জন-সাহিত্যে এশিয়ার শিল্প-ধর্ম্মাদি বস্তু অতি বিরল। তাহা ছাড়া এশিয়ার সঙ্গে ইয়োরোপের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে কার্জন-নীতির উল্টা হইতেছে লতি-নীতি। লতি সর্ব্বত্রই স্বাধীনতার পুরোহিত, আর কার্জন চাহিতেছেন গোটা এশিয়ায় ইংরেজের প্রভুত্ব-বিস্তার।

লতির বইগুলা পড়িলে এশিয়ার নরনারী সম্বন্ধে "রোমান্টিক", কবিত্বময়, রহস্যপূর্ণ মানবজীবনের কয়েকটা দিক্ চিত্তাকর্ষক ও চটকদাররূপে ধরা পড়িবে। তাহাতে যারপর নাই একচোখো অতএব অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক জ্ঞান জন্মিতে বাধ্য। এই কথাটা বলিয়া রাখা আবশ্যক। কিন্তু কার্জন-সাহিত্যে এশিয়ার যে সকল অঙ্গ খুলিয়া ধরা হইয়াছে তাহাতে লতি-সুলভ উল্লাস, মনোহারিত্ব বা কাব্যঘেঁশা স্বপ্ন জাগিয়া উঠিবে না। তাহাতে বর্ত্তমান এশিয়ার দৈন্য-দারিদ্র্য আর দুর্দ্দশাই অতি নিষ্ঠুর কঠিন-কঠোরভাবে পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। হয়ত বা এই চিত্রেও আংশিক সত্যই প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু এশিয়া বিষয়ক এই কেঠো তেতো নির্ম্মম সত্যের ভিতরই পাঠকেরা সত্যের পরিমাণ বেশী পরিমাণে পাইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—"বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর তথ্য ও তত্ত্বরাশির ভিতর কর্জ্জনের একবগ্গা আলোচনা বর্জ্জিত

হইয়াছে। সেইরূপ লত্তির একচোখো রোমান্টিকতাও এই সকল বইয়ের ভিতর পাওয়া যাইবে না। মানব জীবনের "বত্রিশ বিদ্যা চৌষট্টি কলা" সবই একসঙ্গে,—হয়ত বা ছিটে-ফোঁটার আকারে—গণ্ডুষ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

৩

হেডিনের পর্য্যটন মধ্য-এশিয়া, চীন আর তিব্বতের ভিতর সমাবদ্ধ। হেডিন-সাহিত্যে না আছে রাষ্ট্রনৈতিক পিপাসা, আর না আছে ভাবুকতাময় উচ্ছ্বাসময় ধর্ম্মানুসন্ধান। হেডিন আগাগোড়া ভৌগোলিক। ভূগোলের চৌহদ্দি বাড়াইবার বিজ্ঞান হেডিনের একমাত্র উপাস্য। যে সকল দেশ পৃথিবীতে কেহ কখনও চোখে দেখে নাই, সেই সকল দেশের বন-নদী-মরু-পাহাড় আবিষ্কার করার শিল্পে হেডিন আজীবন সাধনা করিতেছেন। এই হিসাবে কার্জনের পারস্য বিষয়ক গ্রন্থে হেডিন-শক্তিও কিছু কিছু দেখিতে পাই বলিতে পারি। কেননা পারস্যে আসিয়া ভৌগেলিক অনুসন্ধানে কার্জন খানিকটা হাত দেখাইয়াছেন। কিন্তু হেডিন পূরাপূরি ভূগোল-বীর। আর এই মহলে তাঁহার কৃতিত্বও তিব্বতী পাহাড়ের মতই উঁচুদরের জিনিষ।

একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, "বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর কোথায়ও এমন কোন মুল্লুক নাই, যেটা কোন মানুষ পূর্ব্বে কখনো দেখে নাই। এমন কি ভারতসন্তানের অ-দেখা বা অ-শুনা জনপদও এই ভ্রমণ সাহিত্যের অন্তর্গত নয়। সবই চেনাশুনা ঠাঁই আর চেনাশুনা নরনারীর কাহিনী। তবে বাঙলা সাহিত্যে

ভৌগোলিক রস নেহাৎ কম। ম্যাট্রিকুলেশন পাঠ্য ভুগোল ছাড়া দেশদেশান্তরের প্রকৃতি-তত্ত্ব আর নৃতত্ত্ব আমাদের পাতে বড় একটা পড়েনা,—অন্ততঃ "সেকালে" পড়িত না। হয়ত বা এই হিসাবে নানান্ দেশের, নানান্ জাতের ভাষার বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ বাঙালীর পক্ষে খানিকটা নতুন বোধ হইলেও হইতে পারে। যাঁহারা বস্তুনিষ্ঠার আদর করেন, তাঁহারা এই বাংলা বইগুলায়ও হেডিন-রীতি কিছু কিছু পাইবেন।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। প্যারিসে থাকিবার সময় একজন ফরাসী পণ্ডিত বর্ত্তমান লেখককে আর একজন ফরাসী পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দিবার উপলক্ষ্যে বলিতেছিলেন, —"এ এসেছে ভারত হ'তে কলাম্বাসের চোখ নিয়ে। চায় আমাদের ফ্রান্স আর পশ্চিম মুল্লুক আবিষ্কার কর্‌তে।" এই ধরণের উপমা বা তুলনা ইংল্যাণ্ডে, ইয়াঙ্কিস্থানে, ইতালিতে নানা দেশেই একাধিক-বার শুনিতে হইয়াছে। অবশ্য কোনো একটা ভালমন্দ মতামত বেমালুম হজম করিয়া ফেলা এই অধমের হাড়মাসে লেখা নাই। কাজেই "ভারতীয় কলাম্বাস" উপাধি খাইয়া ও অথবা "কলাম্বাসের চোখ" পাইয়াও বিশেষ কিছু চঞ্চল হইয়া পড়ি নাই।

বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার ও "বৃহত্তর ভারত"

১

তবে বর্ত্তমান জগৎটা "আবিষ্কার" করা যে যুবক ভারতের পক্ষে একটা মস্ত সমস্যা, সে বিষয়ে এই পর্য্যটকের কোনো দিনই

সন্দেহ ছিল না, এখনো নাই। শ দুই দেড়েক বৎসর ধরিয়া "বর্ত্তমান জগৎ" ভারতাত্মাকে খুব জোরসে ঘায়ের পর ঘা লাগাইতেছে। তবুও "বর্ত্তমান জগৎ"কে পাকড়াও করিবার আন্তরিক আর যথোচিত প্রয়াস ভারতীয় নরনারী করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে ভারতসন্তান বড়ই উদাসীন। এই সম্বন্ধে নানা কথা নানা উপলক্ষ্যে বলিয়াছি বাংলায় ও ইংরেজিতে।

জাপানী চরিত্রে আর ভারতীয় চরিত্রে এই ক্ষেত্রে জবর প্রভেদ। সুতরাং একালের নরনারীর "ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ," আর শিক্ষা-দীক্ষা সব কিছুই ভারতবর্ষের জন্য আবিষ্কার করিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়াই ভবঘুরোগিরি করিতে বাহির হইয়াছিলাম। দুনিয়ার জলস্থল-নভোমণ্ডলের আর জীব-জন্তু তরুলতার কতটুকু এই "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলীতে দখল করিতে পারা গিয়াছে তাহার কথা স্বতন্ত্র। আকাঙ্ক্ষাটার কথা বলিয়া রাখিলাম মাত্র।

আগে একবার বলা হইয়াছে যে, এই গ্রন্থাবলী এক বিপুল গ্রন্থের মালমশলা বা সূচীপত্র বিশেষ। সেই গ্রন্থ এই হাতে কোনো দিন লেখা হইবে কিনা জানি না। হয়ত যুবক বাঙলার কোনো কোনো গবেষক-পর্য্যটক এই ফরমায়েস ও সঙ্কেত মাফিক কাজ চালাইয়া বর্ত্তমান পর্য্যটকের অলিখিত গ্রন্থটা বাঙালী জাতিকে উপহার দিতে উৎসাহী হইবে।

বিশ্বশক্তিকে শক্তমুঠায় পাকড়াও করিবার উপর ভারতের আত্মিক, আর্থিক আর রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা পুরাপুরি নির্ভর করিতেছে। কাজেই "বর্ত্তমান জগৎ" সম্বন্ধে গবেষণা-অনুসন্ধান সাহিত্য-সংসারের বিলাস-সামগ্রী মাত্র নয়। বহুসংখ্যক উঁচুদরের

বাঙ্গালী-মগজকে বিজ্ঞান-সাধনার এই কর্ম্মক্ষেত্রে সমবেতরূপে মোতায়েন রাখিতে পারিলেই কাজ হাঁসিল করা সম্ভবপর হইবে।

২

প্রথমবার ১৯১৪ সনের এপ্রিল মাসে বোম্বাই ছাড়িয়াছিলাম। ১৯২৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথমবার বোম্বাই ফিরিয়া আসি।

এই সাড়েএগার বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত নানা ঘাটের জল খাইয়াছি আর "নানা বর্ণের ও নানা আশ্রমের" লোকজনের সঙ্গে জীবন কাটাইয়াছি। স্বাধীন, পরাধীন ও নিম-স্বাধীন সকল প্রকার জাতিই অভিজ্ঞতায় ঠাঁই পাইয়াছে। গরীব লোক, বড় লোক, মামুলি লোক, নামজাদা লোক, পথের কাঙাল হইতে রাজকুমার পর্য্যন্ত কোনো লোকই নিবিড় আত্মীয়তার গণ্ডীতে বাদ পড়ে নাই।

সকলের সঙ্গে মেল-মেশেই পাইয়াছি মধুর ব্যবহার আর বন্ধুত্বের সম্বন্ধ। সর্ব্বত্রই, সকল সমাজেই, এমন কি বিলাতেও নরনারীর সঙ্গে লেনদেনগুলা অকপট সৌহার্দ্দ্য ও আনন্দের প্রতিমূর্ত্তিই ছিল।

কাজেই বিফলতা, নৈরাশ্য, দুঃখবাদ ও বুক-ভাঙ্গা বেদনার দর্শন আর যুক্তিশাস্ত্র এই লেখকের মজ্জায় বসিতে পারে নাই। জগতের নরনারীকে সস্নেহ চোখেই দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। আর পৃথিবীকে খোলাখুলি, মোটের উপর—নানা দুঃখদারিদ্র্য-গোলামী-নির্য্যাতন-নিপীড়ন-হিংসা-পরশ্রীকাতরতা সত্ত্বেও,—সুখের আস্তানারূপে প্রচার করাই স্বধর্ম্মে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাই লিখিয়াছি,—

ইতালিতে বারকয়েক

এই পৃথিবী স্বর্গ আমার
ছাড়্‌ব নাক' আমি এরে,
নয়া দুনিয়ার তল্লাসেও
দিল্ দিবনা ছেড়ে।

চাঁদের বুক জাঁকাল বটে
হৃদয়ে নাই অগ্নিহার
নাসায় বয়না প্রাণের নিশ্বাস
পোড়া পাহাড় মূর্ত্তি তার।

সূর্য্যালোকে দীপ্ত সে যে
ময়ুর পাখায় কাকের মতন,
ধরার যমজ বোন যদিও
চাঁদে বসেনা আমার মন।

'মার্স'-এ কর্‌ছে জগৎ সৃষ্টি
'লোয়েল' বিশ্বামিত্র সম,
কলিকাল,—তাই এড়াচ্ছে সে
ঐশ দৃষ্টি নিরমম!

মার্স-এর উত্তর-দক্ষিণ মেরু
বরফ চাপে রয় ঢাকা,
বসন্তে এই বরফ-গলা
জলেই সেথায় জীবন রাখা।
হাজার হাজার মাইল নাকি
খাল কেটেছে 'মার্স' বাসী—

ইতালিতে বারকয়েক

শস্যশ্যামল মহামিশর
গড়েছে সে 'মার্স'-ঋষি।

প্রাণভরা এ খোলা বাতাস
পাব কি সেই 'মার্স'দেশে,

দিবারাত্রি যখন তখন
স্বাধীন খেয়াল উঠ্‌লে হেসে ?

প্রাণের খেয়াল মিটিয়ে তাই
মুক্ত নীলাকাশের তলে

সূর্য্যের আগুন বুকে করে'
থাক্‌ব আমি ধরার কোলে।

এই সাড়েএগার বৎসর ধরিয়া অন্যান্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার কেন্দ্রে কেন্দ্রে যুবক ভারতের কর্ম্মক্ষেত্র ঢুঁড়িয়া বাহির করিতে সচেষ্ট ছিলাম। ভারতাত্মার প্রতিনিধি স্বরূপ কোথাও বা এক টুকরা পাথর, কোথাও বা এক ছটাক সুরকি, কোথাও বা একটা কড়ি বা বর্গা, কোথাও বা একটা ছোট কুঁড়ে ঘর রাখিয়া আসিয়াছি। আজকাল এইদিকে অন্যান্যের দৃষ্টিও কিছু কিছু পড়িয়াছে। জগতের নানাস্থানে এইরূপ সমবেত চেষ্টায় একটা বর্ত্তমান যুগের "বৃহত্তর ভারত" গড়িয়া উঠিতেছে। এই "বৃহত্তর ভারতে"র সুদৃঢ় ইমারত তৈয়ারি করিবার জন্য যুবক বাঙ্‌লা হইতে দলে দলে প্রবাসাভিযান সুরু হউক। ভারত-সন্তান কোথাও নেহাৎ আত্মীয়-হীন বন্ধুবান্ধব-হীনরূপে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইবে না, এইরূপ বিশ্বাস করিবার মতন সাহস রাখি।

যুবক বাঙলার ১৯০৫-২৭

১

১৯০৫-৭ সনের আবহাওয়ায় সুরু করিয়াছিলাম "শিক্ষা-বিজ্ঞান"-সাহিত্য। তাহার পরিকল্পনায় নব-প্রসূত যুবক বাঙ্‌লার উৎসাহ, ভাবুকতা ও সৎসাহস মূর্ত্তি পাইয়াছিল। ঘটনাচক্রে তাহাকে পরিণতির দিকে লইয়া আসিবার সুযোগ ও সময় জুটে নাই। অধিকন্তু এই বিশবাইশ বৎসরের ভিতর আসল কর্ম্মক্ষেত্রে সেই শিক্ষাবিজ্ঞানের যথোচিত যাচাই হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। যাহাহউক, এই অসম্পূর্ণতার কথা সর্ব্বদা মনে পড়িতেছে।

তাহার পর ১৯১২-১৩ সনে সংস্কৃত "শুক্রনীতির" ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত করি। তখন হইতে তুলনামূলক ইতিহাস, সমাজ-তত্ত্ব আর রাষ্ট্রনীতির নানা মহলে অনুসন্ধান-গবেষণা আর পঠন-পাঠন চলিতেছে। এশিয়ার আর ইয়োরামেরিকার একাল-সেকাল এক সঙ্গে আলোচনা করা এই সকল ইংরেজি, বাঙ্‌লা, ফরাসী ও জার্ম্মাণ রচনাবলীর উদ্দেশ্য।

সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরিয়া বিশেষতঃ ১৯২০-২১ সন হইতে বিদ্যা-চর্চ্চাও সাহিত্য-সেবার আর এক মুল্লুকে চলাফেরা করিতেছি। বোম্বাইয়ে নামিবার পরই "ইণ্ডিয়ান্ ডেলি মেল" (২২ সেপ্টেম্বর, ১৯২৫) কাগজের প্রতিনিধিকে যে সব কথা বলিয়াছি, তাহার ভিতর এই বিষয়ে কিছু উল্লেখ আছে। প্রথমতঃ আন্তর্জ্জাতিক লেনদেনের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড আজকালকার সাধনায় উচ্চস্থান অধিকার

করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, ধনবিজ্ঞান আর আর্থিক জীবন-সম্পর্কিত গবেষণায় আর আন্দোলনেও প্রচুর সময় দিতে হইতেছে।

এই দুই ধারার কর্ম্ম বিদেশে থাকিতে থাকিতেই সুরু হইয়াছে। তাহার চিহ্ন "ইকনমিক ডেভেলপ্‌মেণ্ট" আর "পলিটক্‌স অব বাউণ্ডারীজ" নামক দুই গ্রন্থ (১৯২৬)। দেখা যাউক এই দিকে কত দূর অগ্রসর হওয়া যায়।

২

১৯১৪ সনের গোড়ার দিকে যে বাঙ্‌লা দেশ দেখিয়া গিয়াছিলাম, তাহার তুলনায় আজকার বাঙ্‌লা দেশ ঢের উন্নত, বিস্তৃত ও গভীর। বাঙ্‌লার নরনারী কর্ত্তব্য জ্ঞানে, কর্ম্মদক্ষতায়, ব্যবসা-বুদ্ধিতে, শিল্প-কর্ম্মে, বিদ্যাচর্চ্চায়, সাহিত্য-সেবায়, স্বদেশ-নিষ্ঠায়, অনেক দূর উঠিয়াছে। ১৯০৫।৭ সনের ভাবুকতায় যে সকল লক্ষ্য ও আদর্শকে আমরা আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা বিবেচনা করিয়া চলিতাম, তাহার কিছু কিছু আজ কার্য্যে পরিণত দেখিতেছি। বাঙালী জাতি এত বাড়িয়াছে যে, দুই বৎসরের ভিতরও এই ক্রমিক বৃদ্ধির সকল অঙ্গ সম্পূর্ণরূপে খতিয়ান করিয়া উঠিতে পারিলাম না। ইহা যারপর নাই আশাপ্রদ ও আনন্দের কথা।

বাঙালী আজ এক উচ্চতর ধাপে অবস্থিত। এই ধাপের জন্য জীবনের উচ্চতর আদর্শ ও লক্ষ্য আবশ্যক। আর সেই আদর্শ ও লক্ষ্য মাফিক চিন্তা ও কাজ চালাইবার জন্য উচ্চতর সমালোচনা আর মাপকাঠিও আবশ্যক। এই উচ্চতর আদর্শ, লক্ষ্য, সমালোচনা আর মাপকাঠির যুগেও আবার বঙ্গজননীর উপযুক্ত সেবক থাকিতে পারিলেই জীবন ধন্য বিবেচনা করিব (১৯২৭)।

দশম অধ্যায়

বর্ত্তমান ইতালি ও ফাশি-ধর্ম্ম*

প্রঃ—ইতালিতে কোথায় কোথায় ছিলেন?

উঃ—এইবার ইতালিতে আমার দ্বিতীয় পর্য্যটন। প্রথম বার, ১৯২৪-২৫ সনে ছিলাম ইতালির নানা যায়গায় বিশেষভাবে মিলানে, পাদহ্বায়, ভেনিসে ও বলৎসানয়। এক কথায় সেবার আমি কেবল উত্তর ইতালিই দেখেছি। এ যাত্রায় সুরু করি দক্ষিণ ইতালিতে; কলম্বো হ'তে যাত্রা করে নেপল্‌সে নামি ১৯২৯ সনের মে মাসে; তখন ভরা গরম; ওখানে কাটে হপ্তাখানেক, তারপর যাই রোমে, রোমে প্রায় দুসপ্তাহ কাটে, এই আমার প্রথম রোম দেখা; তারপর যাই পিসায়, পিসা হতে মিলানে, মিলানের পর ইতালির আর কোথাও সময় কাটাবার সুযোগ হয়নি; সোজা চলে যাই সুইট্‌সারল্যাণ্ডে। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের পর কাটে মাস কয়েক ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণী,

---

* গ্রন্থকারের সহিত কথোপকথন—শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন। সুবর্ণবণিক-সমাচারে প্রকাশিত, ডিসেম্বর ১৯৩১।

চেকোশ্লোভাকিয়া ও অষ্ট্রিয়ায়। পরে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডেই কিছুকালের জন্য স্থায়ী ঘর হয় জেনেভায়।

তারপর ১৯৩০ সনে সুইট্‌সারল্যাণ্ডের জেনেভা হ'তে আর একবার ইতালি আসার সুযোগ ঘটে,—মিলানে; সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে বক্তৃতার জন্য ডেকেছিল, ফেব্রুয়ারী মাসে; সেই সূত্রেই আবার পাদহ্বায় যেতে হয়, সেখানেও বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার উপলক্ষে। তখন ইতালিতে কাটে হপ্তা আড়াই। তারপর চলে' যাই জার্ম্মাণিতে,—মিউনিকের টেক্‌নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে। সেখানে ছিলাম চাকরীর মেয়াদে পূরা এক বছর।

তারপর আবার আসি ইতালিতে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণে, ১৯৩১ সনের মার্চ্চ মাসে। এখানে বক্তৃতা দিতে হয়, আর এ সূত্রে এখানে কাটে হপ্তা দু'য়েক। তারপর যাই আবার জার্ম্মাণিতে (বার্লিনে)।

শেষবার ইতালিতে ফিরি ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে, এবারও রোমে। উপলক্ষ ছিল "লোকবলবিষয়ক আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেস"। এই কংগ্রেসের অর্থনৈতিক বিভাগে আমাকে অন্যতম সভাপতি করা হয়েছিল। এই সূত্রে রোমে কাটে মাস খানেক। তারপরেই জেনোআ হয়ে "ঘরমুখো বাঙ্গালী"।

প্রঃ—তা'হলে মোটের উপর ইতালিতে কত দিন কেটেছে?

উঃ—প্রথম বার ১৯২৪-২৫ সনে—উত্তর ইতালিতে বছর খানেক। আর এবারকার প্রায় আড়াই বছরের ইয়োরোপ-শফরের যুগে মোটের উপর মাস তিনেকের বেশী নয়। মিলান

দেখা হয়েছে বার তিনেক, পাদহ্বা বার চারেক, রোমও বার তিনেক। বলৎসানয়ই সবচেয়ে বেশী দিন কেটেছে।

প্রঃ—মিলান জনপদের বিশেষত্ব কি ?

উঃ—আমাদের দেশের লোকে ইতালির নাম করবামাত্রই তার রাজধানী রোমের কথা মনে আনে। কিন্তু শিল্পবাণিজ্যের তরফ থেকে রোম একদম নগণ্য। দুনিয়ার আর্থিক বাজারে রোমের ইজ্জৎ কিছুই নাই। আর্থিক ইতালির কেন্দ্র হচ্ছে মিলান। আসল কথা আধুনিক কল-কারখানার ধনদৌলত যা কিছু সবই উত্তর ইতালির সম্পদ্। উত্তর ইতালি বল্লে মিলান, তুরিণ আর জেনোআ এই তিনটা বড় সহরের নাম কর্‌তে হয়। এই সহর কটা আর এই সহরের আশপাশ শিল্পকেন্দ্র, কারখানাকেন্দ্র। এককথায় বলা চলে এই সকল পল্লী-সহরই ইতালিতে বর্ত্তমান জগৎ এনেছে। আধুনিক কর্ম্মজীবন, আধুনিক আর্থিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, আধুনিক টাকাকড়ির আকার-প্রকার ইতালিয়ান সমাজে দেখতে হলে এই তিন সহরেই আড্ডা গাড়া দরকার, আর এই তিন সহরের ভেতর মিলানই সব চেয়ে বড় আর নামজাদা।

প্রঃ—সেকি মহাশয়, রোম তা'হলে কোথায় গেল ?

উঃ—মিলানের লোকেরা রোমকে পুছে না। রোমকে ভাবে সরকারী আফিসের জটলা-স্থল। এই হ'ল রোমের আধুনিক রূপ। উত্তর ইতালির বিবেচনায় রোমের আধুনিকতার আর কোন পরিচয় নাই। আসল কথা রোমকে ইতালিয়ানরা মরা নরনারীর গোরস্থান বিবেচনা করে। সেকেলে বাড়ীঘরের ধ্বংসস্তূপ বক্ষে বহন করাই রোমের যা কিছু কীর্ত্তি। রোম অতীতের সাক্ষী, রোমের নরনারী

প্রাচীন-পন্থী। রোমের সমাজে পুরাতত্ত্ব, কবর-তত্ত্ব, ঘটোৎকচের মত কুরুকুল চেপে রয়েছে, রোমের হাড়ে নতুন কিছু বসানো অসাধ্য। এইরূপই উত্তুরে ইতালিয়ান নরনারীর ধারণা।

প্রঃ—তাহলে মিলানে আপনি কি কি দেখলেন ?

উঃ—মিলানে বস্ত্র-শিল্পের বণিক্‌দের বড় বড় আড়ত দেখেছি। এখানকার বাঙ্কা কমার্চ্যালে ইতালিয়ানা ইতালির সব চেয়ে বড় ব্যাঙ্ক। লোহা ইস্পাতের কারখানাও এখানে দেখেছি। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির কারখানা এখানকার প্রসিদ্ধ। এখানকার বণিক্‌সঙ্ঘ দুনিয়ায় নামজাদা। ইতালির পথ-ঘাট সম্বন্ধে মানচিত্র তৈয়ারী হয় মিলানেই, টুরিংক্লাব কেন্দ্রে। এখানকার বকনি বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্য-শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইতালির ভিতর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ই আমাকে বক্তৃতার জন্য ডেকেছিল।

প্রঃ—আচ্ছা তাহলে কি রোমে এইসকল ধরণের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বড় একটা দেখা যায় না ?

উঃ—না। রোম আর রোমের আশপাশ কৃষিপ্রধান। রোমকে মধ্যে ইতালির দক্ষিণ সীমানা বলা চলে। রোমের খানিক উত্তরে বলনিয়া আর ফ্লোরেন্স। এই দুই সহর পৃথিবীর ইতিহাসে নামজাদা। কিন্তু বর্ত্তমান ইতালিতে এই দুই সহর মিলানের কাছে কাণা। এই দুই সহর রোমের মতন, মোটের উপর মধ্য ইতালিরই অন্তর্গত, পিসাও তারই সামিল। মধ্য ইতালিকে ইতালিয়ানরা কখনও আধুনিক শিল্প-সম্পদের কেন্দ্র বিবেচনা করেনা।

প্রঃ—তাহলে খাঁটি দক্ষিণ ইতালির অবস্থা কিরূপ ?

উঃ—আর্থিক হিসাবে রোম জনপদে দক্ষিণ ইতালির সূত্রপাত ধরে' নিতে পারি। দক্ষিণ ইতালির নামজাদা সহর নেপল্‌স্‌। এই অঞ্চল আগাগোড়া কৃষিপ্রধান। সিসিলি দ্বীপটাকে দক্ষিণ ইতালির অন্তর্গত ভাবতে হবে।

প্রঃ—আচ্ছা রোমে আপনি কি দেখলেন ?

উঃ—সরকারী আফিস, মন্ত্রিভবন, শাসনকেন্দ্রের উচ্চতম ধাপ ইত্যাদি। মিলানে আলাপ করেছি,—এঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে, ব্যাঙ্কারদের সঙ্গে, কারখানা-পরিচালকদের সঙ্গে। এই ধরণের ছিল মিলানের আবহাওয়ায় আমার চলাফেরা। রোমে বিলকুল পট-পরিবর্ত্তন। এখানকার যাঁদের সঙ্গে আমার দহরম মহরম তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই বড় বড় সরকারী চাকুর্‌্যে। কৃষিসচিব, শিল্পসচিব, যানবাহন-সচিব, স্বাস্থ্যরক্ষার সরকারী প্রতিষ্ঠান, ম্যালেরিয়া নিবারণের সরকারী কেন্দ্র, রেল বিভাগের বড়কর্ত্তা, বীমাবিভাগের সরকারী আফিস, যৌবন-আন্দোলনের সরকারী কর্ম্মকেন্দ্র, রাজকীয় অ্যাকাদেমিয়া বা পরিষৎ, মজুর আন্দোলনের সরকারী কর্ম্মকর্ত্তা, ভূমি-সংস্কারের আফিস ইত্যাদি ইত্যাদি লোকজন বা প্রতিষ্ঠান রোমের আবহাওয়ায় আমার জীবন স্পর্শ করেছে।

অবশ্য কি রোমে, কি নেপল্‌সে, কি মিলানে, কি পাদহ্বায়,—সর্ব্বত্রই "টুলো পণ্ডিত"দের সঙ্গে পংক্তি-ভোজন দস্তুরমতনই চলেছে। বলা বাহুল্য, ইস্কুল মাষ্টার, গুরুমহাশয়, মৌলভি, অধ্যাপক, গবেষক, তথ্য-সংগ্রাহক, লেখক ইত্যাদি লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় সর্ব্বত্রই অনেক কিছু ঘটেছে। মন্দির, মিউজিয়াম, সংগ্রহালয়, সঙ্গীতভবন, নয়াপুরাণা ইমারৎ আর সেই সবের

আছে। প্রতিষ্ঠানটার নাম "ইস্তিতুত-ইতল-ইন্দিয়ানো"। এ সম্বন্ধে প্রায় সব বড় বড় ইতালিয়ান কাগজে অনেক কিছু প্রকাশিত হয়েছে।

প্রঃ—এবার তাহলে ফাশিজম্ সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উঃ—ফাশি শব্দের অর্থ দল, সমিতি বা সঙ্ঘ। শাস্ত্রের বচন,—সঙ্ঘেই শক্তি,—"তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।" ফাশি ধর্ম্মের তাৎপর্য্যই তাই। ফাশিজ্‌ম্ বল্লে বুঝতে হবে দলনিষ্ঠা, সঙ্ঘনিষ্ঠা ইত্যাদি। সেকালের ল্যাটিন যুগে এই ফাশি-নীতি গুলজার ছিল। একালের যুবক ইতালিও প্রাচীন রোমান জাতির সনাতনী কর্ম্মধারাকে কাজে লাগাতে ঝুঁকেছে। আমাদের ভারতে যেমন আমরা অনেক সময় সেকেলে অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকে বর্ত্তমান যুগের কর্ম্মক্ষেত্রেও চালাতে যাই, অবশ্য সবই নতুন আকার প্রকারে, ইতালিয়ানরাও তেমনি পুরাণো সভ্যতার অনেক কিছু একালের কাজে লাগিয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যযুগে ইতালিয়ান স্বদেশ সেবক মাৎসিনিও এই প্রণালীতেই প্রাচীন ল্যাটিন যুগের মহাকবি ভার্জ্জিল আর মধ্যযুগের দান্তেকে আধুনিক স্বদেশী-স্বরাজ-স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান প্রধান স্তম্ভ স্বরূপ খাড়া করেছিলেন। প্রাচীনকে নবযুগের কাজে সদ্ব্যবহার করা "রোমান্টিক" ভাবুকতার আন্দোলনের একটা বিশেষ লক্ষণ। সেই ধারা অনুসারে একালের ইতালিয়ানরাও ফাশিনিষ্ঠা সমাজে প্রচার করেছে।

প্রঃ—তাহলে ফাশিজ্‌ম্‌এর ভিতর মুসলিনি এসে জুট্‌ল কোত্থেকে?

উঃ—মুসলিনি লড়াইয়ের আগে একজন মজুর-পন্থী সোশ্যালিষ্ট ছিলেন। ফাশিনিষ্ঠা (ফাশিস্মো) তখনকার দিনে বড় বেশী মাথা খাড়া করতে পারে নি। একটু আধটু এখানে সেখানে দেখা দিয়েছিল মাত্র। কিন্তু লড়াইয়ের পর দেশের নানা জায়গায়, নানা কর্ম্মক্ষেত্রে স্বদেশ-সেবার প্রবৃত্তি জেগে উঠে। তারই অন্য-তম লক্ষণ ফাশিনিষ্ঠার উদ্বোধন। মুসলিনিও ইতিমধ্যে নানা ঘাটে টোল খেতে খেতে ফাশিগুলার সঙ্গে দহরম মহরম কর্‌তে লেগে যান। ফাশিগুলাকে হাত করা আর সেগুলাকে নিজের তাঁবে এনে নিজের মতলব মাফিক কাজ করানো—এই হচ্ছে মুসলিনির কৃতিত্ব। তারপর মুসলিনি দাঁড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ফাশিস্মো একটা খাঁটি পারিভাষিকরূপে দিগ্বিজয়ী হয়ে পড়েছে।

প্রঃ—ফাশিজ্‌মএর বর্ত্তমান আকার প্রকার কিরূপ?

উঃ—শব্দটার অর্থ অবশ্য দলনিষ্ঠা, সঙ্ঘধর্ম্ম ইত্যাদি। কিন্তু সঙ্ঘধর্ম্ম বল্‌লে ফাশিস্মোকে বস্তুনিষ্ঠরূপে বুঝা যায় না। দল বেঁধে ফুটবল খেলাও যায়, আবার দলবেঁধে আকাশে গ্রহনক্ষত্র সম্বন্ধে গবেষণা করাও যায়। কাজেই মুসলিনির সঙ্ঘনিষ্ঠায় শব্দটার কথা ছেড়ে অর্থটার দিকে নজর দেওয়াই বেশী যুক্তি সঙ্গত। প্রথম বারকার ইতালি ভ্রমণের সময় দেখেছি,—অর্থাৎ ১৯২৪-২৫ পর্য্যন্ত মুসলিনিকে ঢের গলদ্‌ঘর্ম্ম, অনেক বেগ পেতে হয়েছে। ইতালিয়ান সমাজে তাঁর কাজকর্ম্ম, তাঁর ফাশিধর্ম্ম তখনও নিরেটভাবে দাঁড়াতে পারে নি। আজ এখানে, কাল ওখানে আজ এ সমাজে, কাল ও সমাজে, মুসলিনির বিরুদ্ধে ছোট বড় মাঝারি প্রতিবাদ তখনো কিছু কিছু দেখা দিত। কিন্তু এ

যাত্রায় গিয়ে দেখি, বিগত পাঁচ বছরে মুসলিনি দেশের সর্ব্বত্র সকল কেন্দ্রে একাধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছেন। ফাশিস্মো বাস্তবিক পক্ষে আজকাল ইতালির অলিগলিতে জয় জয়কার ভোগ করছে। বাজারে দাঁড়িয়ে, খোলা মাঠে সভাসমিতি করে' অথবা খবরের কাগজে,—ফাশিনীতি অথবা মুসিলিনির বিরুদ্ধে টু শব্দ করবার মতন সাহস কাহারো নাই। বরং খোলাখুলি সর্ব্বত্রই প্রচারিত হচ্ছে "মুসলিনি মির্ভুল"। তাছাড়া দেশের ভেতর যত প্রতিষ্ঠান দেখ্‌তে পেয়েছি, তার প্রত্যেকটার নামেই 'ফাশিস্তা' শব্দটা জোড়া আছে।

প্রঃ—আমরা বিদেশে বসে' ফাশিজ্‌ম্‌এর আসল লক্ষণ তাহলে কি করে' বুঝতে পার্ব্ব?

উঃ—ফাশিজ্‌ম্‌ বস্তুটার প্রধান কথা সার্ব্বজনিক আত্মকর্ত্তৃত্বের অস্তিত্ব-লোপ। জনসাধারণের স্বরাজ বা ডেমোক্রেসী বল্লে যা কিছু বোঝা যায়, তার উচ্ছেদসাধন করাই মুসলিনির প্রধান কীর্ত্তি।

প্রঃ—ফাশিধর্ম্মকে তাহলে একটা সদনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক বলা যায় কি করে'?

উঃ—এইখানেই মুসলিনির বিশেষত্ব। মুসলিনি ছেলে বয়সে আর যৌবনকালে মজুরপন্থী ছিলেন বলেছি। তা ছাড়া ডেমোক্রেসী, সাম্য, আত্মকর্ত্তৃত্ব ইত্যাদি বস্তুও মুসলিনির আত্মায় অনেক প্রভাবই বিস্তার করেছিল। কিন্তু লড়াই শেষ হবার সম সম কালে মুসলিনি বেশ বুঝেছিলেন যে, ইতালির হাড়ে ওসব সাম্য, স্বরাজ, ডেমোক্রেসী ইত্যাদি বস্তু সইবে না। তিনি খোলাখুলি প্রচার করেছেন যে, "ডেমোক্রেসী ঊনবিংশ শতাব্দীর একটা মায়'-

মৃগ গোছের ছিল ; তার পেছনে পেছনে ছুটে পৃথিবীর লোকের লোকসান ছাড়া লাভ হয় নি। এর ফলে লোকেরা শিখেছে কেবল পার্ল্যামেণ্টে অথবা অন্যান্য সমিতিতে গিয়ে কথা কাটাকাটি আর বকাবকি করতে। বাক্‌বিতণ্ডার অত্যাচার আর তর্কাতর্কি ইত্যাদি বাজে কথা-কপ্‌চানোর আওতা হতে মুক্তি দেওয়া হবে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম গৌরব।" মুসলিনি এসব কথা অনেক বার অনেক উপলক্ষ্যে প্রচার করেছেন। তাঁর মতে একমাত্র ইতালিতে নয় গোটা ইয়োরোপেই ডেমক্রেসী তুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্য দেশের লোকেরা কিছু করুক বা না করুক, মুসলিনি যেই নিজের দেশে লোকসেবার সুযোগ পেলেন অমনি নিজ দর্শনকে কাজে লাগাতে লেগে গেলেন। এর ভাবার্থ,—স্বদেশসেবক হিসাবে তিনি ইতালিয়ান নরনারীকে আর কথা কাটাকাটির খপ্পরে পড়্‌তে দিচ্ছেন না।

প্রঃ—এক কথায় একে কি তবে একজনের যথেচ্ছাচার বা একাধিপত্য বলা যেতে পারে ?

উঃ—হাঁ। সোজা কথায় ইহার নাম ডেস্‌পটিজম্‌। যাকে বলে "একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং।" তবে ইহাকে মামুলি যথেচ্ছাচার বলা চলে না, কেন না মুসলিনি একজন খাঁটি স্বদেশসেবক। দেশের জন্য যেখানে যা কিছু করা উচিত, তার জন্য প্রাণপাত করতে মুসলিনি রাজী আছেন আর প্রস্তুতও আছেন। শয়নে, স্বপনে, নিশি জাগরণে ইতালিয়ান নরনারীর হিতসাধন ছাড়া মুসলিনির আর কোনো চিন্তা বা কাজ নাই। মুসলিনি খাট্‌তেও পারেন, ঠিক ভূতের মত। আমাদের

ইতালিতে বারকয়েক

কৌটিল্য যে সকল নরপতিকে রাজর্ষি বলেছেন, গ্রীক দার্শনিক প্লেটো যে রকম আদর্শ রাজ্য চেয়েছিলেন, আমরা রামরাজ্য বল্‌লে যা বুঝি, মুসলিনি ব্যক্তিটা আর তাঁর কাজকর্ম্ম, ধরণধারণ, সবই প্রায় সেই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইংরেজী পারিভাষিকে একে বলে এন্‌লাইটেণ্ড বা বেনেভলেন্ট ডেস্‌পটিজ্‌ম্‌। এই ধরণের যথেচ্ছাচারশীল একাধিপত্য ইতিহাসে অনেকবার দেখা গেছে। আমাদের অশোক, আকবর, শিবাজী, ফরাসী চতুর্দ্দশ লুই, জার্ম্মাণ ফ্রেডরিক, রূশ পিটার ইত্যাদি নরপতি মুসলিনির জাতভায়া। এঁরা সবাই বম্বেটে, কিন্তু খাঁটি স্বদেশসেবক। প্রত্যেকেই নিজ নিজ খেয়াল অনুসারে নিজের সমাজকে "জুতিয়ে" উন্নত করবার, জোর-জবরদস্তি করে' ঠেলে তুলবার কাজে অদ্বিতীয় কর্ম্মযোগী। এই ধরণের করিৎকর্ম্মা আদর্শনিষ্ঠ লোকহিতসাধক বাদ্‌শারাই জগতে যুগান্তর এনে ছেড়েছে।

আজকালকার বোলশেভিক রুশিয়ার মাতব্বরেরাও জাত হিসাবে মুসলিনির ঢঙেরই দেশোন্নতি-নিষ্ঠ কর্ম্মবীর। মুসলিনির মতন সোভিয়েট স্বদেশসেবকেরা ও ষোল আনা ডেস্পট। তাঁরাও ডেমক্রেসী বা স্বরাজের তোয়াক্কা রাখেন না।

প্রঃ ইতালিতে কি তাহলে আজকাল কোন পার্ল্যামেণ্ট নেই?

উঃ—ফাশিষ্ট আমলে প্রথম প্রথম কিছুদিন পার্ল্যামেণ্ট কাজ চালিয়েছিল, কিন্তু পার্ল্যামেণ্টের মেম্বরেরা অনেকেই ফাশিষ্টদিগকে বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌ত না। কাজেই ঝগড়াঝাটি চরমরূপে দেখা দিত। এই সব ভজকট এড়াবার জন্যে মুসলিনি পার্ল্যামেণ্টের

বালাই তুলে দিয়েছিলেন। বিলকুল নিষ্পার্ল্যামেণ্ট ভাবে মুসলিনি ফাশিষ্ট-রাজ চালিয়েছেন কয়েক বৎসর। কিন্তু এ যাত্রায় ১৯২৯ সনে যখন ইতালিতে পৌঁছুলাম, তখন দেখলাম মুসলিনি রাজ্যে আবার এক পার্ল্যামেণ্টের উদ্ভব হয়েছে। এই পার্ল্যামেণ্ট অবশ্যই আগাগোড়া মুসলিনির এক গেলাসের ইয়ার অর্থাৎ স্বপক্ষীয় বন্ধুবান্ধবে ভরা। ফাশিষ্ট দলের বহির্ভূত কোনো লোক এই নতুন পার্ল্যামেণ্টের মেম্বর নন। পার্ল্যামেণ্টটাকে এক কথায় মুসলিনির বৈঠকখানা বা মন্ত্রণা-সভা বলা যেতে পারে। তবে এ একটা খাঁটি নতুন ঢঙের পার্ল্যামেণ্ট। এর ধরণধারণ অতি বিচিত্র।

প্রঃ—এ কি তাহলে যথেচ্ছাচার নয়?

উঃ—হাঁ, যথেচ্ছাচার বটে, কিন্তু আগেই বলেছি এই যথেচ্ছাচার ছেলে-পিলের জন্য মা-বাপের যথেচ্ছাচারের মতন। ফাশিষ্ট শাসনকে এই হিসাবে পিতৃতন্ত্র একাধিপত্য বলতে পারি। ঠিক যেমন আমাদের কালিদাস দিলীপ সম্বন্ধে বলে গেছেন—রাজাই হচ্ছেন বাপ, বাপগুলো ছেলেদিগকে পায়দা করেছে মাত্র। "স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ"।

প্রঃ—আপনি তাহলে এ ধরণের যথেচ্ছাচারকে পছন্দ করেন?

উ.—বুঝে রাখা উচিত যে স্বরাজ, আত্মকর্তৃত্ব, ডেমক্রেসী এক জিনিষ, আর সুরাজ, সুশাসন, দেশোন্নতি, জনসাধারণের হিতসাধন আর এক জিনিষ। স্বরাজ অর্থাৎ ডেমক্রেসী না থাকলেও সুরাজ থাকা সম্ভব, দেশকে, দেশের লোকজনকে ঠেলে উন্নত করা সম্ভব। মুসলিনি খোলাখুলি সজ্ঞানে স্বরাজকে তাড়িয়েছেন। তাঁর মতলব ইতালিতে সৌরাজ্য কায়েম করা।

সেই সৌরাজ্যটা ফাশিষ্ট আমলে চল্‌ছে, তার তারিফ করতেই হবে। এই ধরণের সৌরাজ্যই বোলশেভিক রুশিয়ায়ও জারি আছে। সৌরাজ্যের সঙ্গে শাসন-প্রণালীর আত্মিক সম্বন্ধ যে বেশী নয় তাহার আর এক প্রমাণ এই।

প্রঃ—আপনি বল্‌লেন যে মুসলিনির নতুন পার্ল্যামেণ্টটা একদম বিচিত্র ধরণের। এর বিশেষত্বটা কি ?

উঃ—পৃথিবীতে যত জায়গায় পার্ল্যামেণ্ট আছে, সব জায়গায় জেলা, অর্থাৎ জনপদ হিসাবে লোক বাছাই হয় আর পার্ল্যামেণ্টের সভ্য কায়েম করা হয়। কিন্তু মুসলিনির এই নতুন পার্ল্যামেণ্টে এই মামুলি রীতি বোল আনা বর্জ্জন করা হয়েছে। এই হিসাবে মুসলিনি একজন "বাপকা বেটা," একজন চরম বিপ্লবী। এই মামুলি বাছাই-প্রথার বিরুদ্ধে ফ্রান্সে, জার্ম্মাণীতে এমন কি বিলাতেও বিগত পঁচিশ-ত্রিশ বছর ধরে' কমসে-কম লিখিয়ে-পড়িয়ে মহলে অনেক আন্দোলন চল্‌ছিল। কিন্তু কেহই কোথাও এই সাবেকী পার্ল্যামেণ্ট-প্রথা তুলে দিয়ে নতুন কিছু দাঁড় করাতে সাহসী হয় নি। যা কিছু নানান্ দেশে খাড়া করা হয়েছে, তা খাঁটি পার্ল্যামেণ্ট-স্থানীয় জনসভা নয়। মুসলিনির তাঁবে সাবেকী প্রথা একদম উড়ে গেল। আজ তার বদলে যেটা খাড়া হল সেটা খাঁটি পার্ল্যামেণ্টই বটে।

প্রঃ—জনপদ-গত বাছাইয়ের পরিবর্ত্তে তাহলে আবার কোন্ ধরণের বাছাই ফাশিষ্ট পার্ল্যামেণ্ট কায়েম হয়েছে ?

উঃ—ইয়োরোপের নানা দেশের নানা লোকে বুঝেছিল যে, দেশের জনসভায় কর্ম্ম হিসাবে, পেশা হিসাবে, ব্যবসা হিসাবে,

সভ্য বাছাই হওয়া উচিত। মেম্বররা অমুক জেলার সভ্য না হয়ে অমুক ব্যবসার প্রতিনিধি, এই আদর্শে পার্ল্যামেণ্ট কায়েম হলে নরনারীর বিভিন্ন স্বার্থ সুরক্ষিত হতে পারে—এই ছিল বিগত বিশ-পঁচিশ বৎসরের গতিশীল ভাবুকদের ধারণা। মুসলিনি এই গতিশীলদের ধারণাই কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর এই নয়া পার্ল্যা-মেণ্টের মেম্বরেরা কেহ চাষীর প্রতিনিধি, কেহ মজুরের প্রতিনিধি, কেহ কেরাণীর প্রতিনিধি, আবার অপর দিকে কেহ বা জমিদারের প্রতিনিধি, কেহ বা পুঁজিপতির প্রতিনিধি, কেহ বা কর্ম্মকর্ত্তা-পরিচালকদের প্রতিনিধি! জগতের শাসন-প্রণালীতে এই এক নতুন এক্সপেরিমেণ্ট সুরু হয়েছে।

প্রঃ—আচ্ছা, ফাশিজ্‌ম্‌এর আর কোনো লক্ষণ আছে?

উঃ—এতক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল একটা লক্ষণের কথাই বল্‌ছিলাম। সেটা শাসন-প্রণালী সম্বন্ধীয়। সেই শাসন-প্রণালীতে স্বরাজ বা ডেমক্রেসীর অভাব প্রচুর এই কথাটাই বুঝিয়েছি। এবার ফাশিজ্‌ম্‌এর দ্বিতীয় লক্ষণ বিবৃত কর্‌ছি। আগেই বলেছি মুসলিনি যৌবনে ছিলেন মজুরপন্থী সোশ্যালিষ্ট। তখন তাঁর স্বধর্ম্ম ছিল মজুরে মনিবে লড়াই বাধানো। মজুর-শ্রেণীর স্বার্থ আর মনিব-শ্রেণীর স্বার্থ যে এক নয় এই ছিল তখনকার দিনে তাঁর সমাজ-দর্শন। মুসলিনি দেশের হাল হাতে পাবা মাত্রই বুঝে নিলেন যে, সোশ্যালিজ্‌মের বুকনি অর্থাৎ শ্রেণী-বিরোধ দিয়ে আর কাজ সামলানো চলবে না। তার জায়গায় তিনি দর্শন কায়েম করলেন শ্রেণী-সাম্যের বা শ্রেণী-সামঞ্জস্যের। মজুরের শত্রু মনিব নয়, আর মজুরও মনিবের শত্রু নয়; আর দুইই দেশের সেবক,

রাষ্ট্রের ভৃত্য, এই হ'ল মুসলিনির নতুন নীতি। অবশ্য এই নতুন নীতিও মুসলিনির নিজ মাথার সন্তান নয়। সেই জার্ম্মাণ বিসমার্কের আমল থেকে বহুকাল ধরে' ইয়োরামেরিকার সকল দেশেই সোশ্যালিজ্‌মের বিরুদ্ধে শ্রেণী সামঞ্জস্যের মত চলে আস্‌ছিল। 'ভাই ভাই এক ঠাঁই—ভেদ নাই ভেদ নাই'—এই ছিল এক কথায় এই সামঞ্জস্য নীতির মূলমন্ত্র। মুসলিনির বাহাদুরী যে, তিনি মালকোচা মেরে এই নীতিটাকেই ইতালির মাটীতে গেড়ে দিয়েছেন। গেড়ে দিয়েছেন কেবল বোলচালে, বক্তৃতায় আর বই লেখালেখিতে নয়—সোজাসুজি আইন করে'। মুসলিনি-রাজের গোড়ার কথাই হচ্ছে রাষ্ট্র। এর কাছে মনিবও কাণা, মজুরও কাণা। কোনো ব্যবসা, কোনো শ্রেণী, কোনো দল স্বাধীনভাবে অপর কোনো শ্রেণী, অপর কোনো দল, অপর কোনো পেশার বিরুদ্ধে গুল্‌তান্‌ করতে পর্য্যন্ত অধিকারী নয়। করেছ কি মরেছ। খাড়া আছে ফাশিষ্ট রাষ্ট্রের চাবুক।

প্রঃ – ফাশিষ্ট ইতালিতে তাহলে কি সোশ্যালিজ্‌ম্‌ নেই ?

উঃ—না। শাসন-প্রণালীতে স্বরাজ বা ডেমক্রেসীর পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি যেমন ফাশিজ্‌ম্‌এর প্রথম স্বধর্ম্ম তেমনি সোশ্যালিজ্‌ম্‌এর বিলোপসাধন ফাশিজ্‌ম্‌এর দ্বিতীয় স্বধর্ম্ম। সোশ্যালিজ্‌ম্‌এর শ্রেণী-বিরোধের জায়গায় দাঁড়িয়েছে ইতালিতে ন্যাশনালিজ্‌ম্‌এর রাষ্ট্রীয় ঐক্য। মুসলিনি জবরদস্ত ন্যাশনালিষ্ট,—ঐক্যপন্থী, সামঞ্জস্য-ধর্ম্মী শক্তিপূজক।

বছর চল্লিশ পঞ্চাশেক আগে জার্ম্মাণ বিস্‌মার্ককে "সেকেলে" সোশ্যালিষ্টরা দুস্‌মন সমঝিত। ঠিক সেইরূপই একালের সোশ্যালিষ্টরা

অর্থাৎ চরমপন্থীরা, "কমিউনিষ্টরা"—রুশ বলশেভিকরা মুসলিনিকে তাদের যম-স্বরূপ বিবেচনা করতে অভ্যস্ত। কমিউনিজ্‌মের মুগুরই হচ্ছে ফাশিস্মো।

প্রঃ—আচ্ছা ফাশিজ্‌ম্‌এর আর নতুন লক্ষণ দেখেছেন কি?

উঃ—হাঁ, দেখেছি। কিন্তু তাকে ফাশিজ্‌ম্‌এর লক্ষণ বল্‌ব কি মামুলি সৌরাজ্যের লক্ষণ ব'লব বুঝে উঠতে পারছি না। সহজে এই লক্ষণটাকে শিল্পনিষ্ঠা বল্‌তে পারি। মুসলিনির আমলে গবর্ণমেণ্টের তরফ হতে 'যায় প্রাণ থাকে মান' আদর্শে দেশটাকে শিল্পোন্নতি, আধুনিক কলকব্জাপ্রধান ফ্যাক্টরী-কারখানার দিকে সজোরে ঠেলে তোলা হচ্ছে। যে সকল আইন কবুলে দেশটা সহজে অল্প সময়ে নানা স্থানে নানা কেন্দ্রে এক সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী যন্ত্রপাতিবহুল কারবারে ভরে' উঠ্‌তে পারে তার প্রাচুর্য্য ফাশিষ্ট আমলের একটা বড় কথা। বিদেশী পারিভাষিকে এক কথায় তার নাম ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যালিজেশন, আমাদের পারিভাষিকে আমরা এক কথায় যাকে বলি স্বদেশী-আন্দোলন।

প্রঃ—সে কি মশায়! ইতালিতে তাহলে মুসলিনির আমলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আধুনিক কলকব্জার আর শিল্পনিষ্ঠার প্রভাব ছিল না?

উঃ—কথাটা একটু গভীর ভাবে বোঝা দরকার। বিলাতের তুলনায় ফ্রান্স আর জার্ম্মাণী ১৮৩০ সনেও কৃষিনিষ্ঠ, পল্লীনিষ্ঠ, পাড়াগেঁয়ে মফস্বল মাত্র ছিল। বিলাতের ইংরেজ জাত হচ্ছে ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যালিজেশন-কারবারে মানবজাতির অগ্রণী। আর ইতালি ১৮৭০ সনেও ঠিক ১৮৩০ সনের ফ্রান্স-জার্ম্মাণীর মতনই প্রায় ষোল আনা কৃষিনিষ্ঠ পল্লীজীবী মফস্বলের পাড়াগাঁ মাত্রই ছিল। তারপর

আস্তে আস্তে ইতালিয়ান সমাজে শিল্পনিষ্ঠা দেখা দেয়, ঠিক যেমন জাপানে আর ভারতেও প্রায় সেই সময়ই কিছু কিছু আধুনিক ফ্যাক্টরী-জীবন আত্মপ্রকাশ করে। ১৯১৪ অর্থাৎ লড়াইয়ের সম সম কাল পর্য্যন্ত ইতালিতে ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যালিজ্‌ম্ বা শিল্পনিষ্ঠা বড় বেশী বিস্তৃত ছিল না। যা কিছু ছিল, তারও অনেক কিছুতেই হয় ইংরেজ, না হয় জার্ম্মাণ, না হয় ফরাসী জাত ছিল কর্ম্মকর্ত্তা, পরিচালক, পুঁজিপতি। ইতালিয়ানরা এসব বিষয়ে অনেকটা "নিজ বাসভূমে পরবাসী" ছিল, এইরূপ বল্‌লেই অবস্থাটা বোঝা যেতে পারে। যেই লড়াই সুরু হল, তখনই দেখা দিল জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে বয়কট। কাজে কাজেই ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্স—এই দুই দেশের ঘাড়ে পড়ে' গেল ইতালিকে শিল্পনিষ্ঠায় মজবুদ কর্ব্বার দায়িত্ব। কিন্তু বেচারা ইংরেজ আর ফরাসী নিজ ঘর সামলাতে প্রাণ-ওষ্ঠাগতপ্রায়। কাজেই যেনতেন-প্রকারেণ ইতালিয়ানরা নিজেরাই স্বদেশী-আন্দোলন পুষ্ট করতে বাধ্য হল। এক কথায় আমরা ভারতে যেমন ১৯০৫এর যুগে স্বদেশী-আন্দোলন কায়েম করেছি, ইতালিয়ানদের স্বদেশী-আন্দোলনেরও প্রায় সেই সময়ই সূত্রপাত হয়েছে। ইতালি অবশ্য ভারতের চেয়ে খানিকটা বেশী দূর এগিয়ে গিয়েছিল। তবে শিল্পনিষ্ঠার ধারাটা বুঝবার জন্যে ভারতের সঙ্গে তুলনা চালালে ইতালির অবস্থা পরিষ্কার হয়ে আসবে। অপর দিকে সম্‌ঝে রাখা উচিত যে, লড়াইয়ের প্রভাবে ভারতে যেমন, ইতালিতেও তেমন শিল্পনিষ্ঠার বন্যা ছুটেছে। সেই বন্যাটাকেই মুসলিনি হন্যেমুখী হয়ে রাবণের দশহাত দিয়ে ইতালিয়ান নরনারীর ভেতর বইয়ে দিচ্ছে। আমার মতে এই শিল্পযোগ মুসলিনির

অন্যতম কীর্ত্তি। কাজে কাজেই ফাশিজ্‌ম্‌এর তৃতীয় লক্ষণ হিসাবে শিল্পনিষ্ঠা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই "শিল্পনিষ্ঠা" শব্দে চাষ-আবাদকে "আধুনিক" প্রণালীতে যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সাহায্যে উন্নত করে' তোলাও বুঝতে হবে।

প্রঃ—তাহলে দেখছি আপনার মতে ফাশিজ্‌ম্‌এর ভিতর রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির কোন নতুন আবিষ্কার নেই।

উঃ—বাস্তবিকই তাই। আর্থিক হিসাবে ইতালি,—ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, সুইট্‌স্যারল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশের চেয়ে অনেক নীচু ধাপে অবস্থিত। তাদের উঁচু ধাপকে আদর্শ করে' মুসলিনি ইতালিকে তাদের পেছনে পেছনে যথাসম্ভব ঠেলে তুলবার চেষ্টা করছেন। প্রণালীগুলা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব কিছুই নাই। সব প্রণালীই অগ্রণী দেশগুলায় অনেকদিন ধরে' কায়েম হয়ে রয়েছে। এই হিসেবে ফাশিষ্টদের আর্থিক কর্ম্মকৌশল আর সোভিয়েট রুশিয়ার বোলশেভিক অর্থনীতি বিলকুল এক। বাস্তবিক পক্ষে শিল্প-নিষ্ঠার উৎপ্রেরণা হিসাবে যুবক ভারতের স্বদেশী আন্দোলনও এই ফাশিজ্‌ম্ ও বোলশেভিজ্‌ম্‌এরই সম শ্রেণীভুক্ত।

সমাজনীতি সম্বন্ধে আগেই বলেছি মুসলিনি বিসমার্ক ইত্যাদি সোশ্যালিষ্ট-বিরোধী রাষ্ট্রিকদের পথেই নিজের পান্‌সী চালাচ্ছেন। মুসলিনি চান সমাজের দলাদলি ধ্বংস করতে আর তার পরিবর্ত্তে ঐক্যবদ্ধ, শক্তিনিষ্ঠ মজবুদ রাষ্ট্র গড়ে' তুল্‌তে। ইংরেজি পারিভাষিকে এর নাম এক কথায় ষ্টেট-সোশ্যালিজম্। আজকালকার দিনে এই বস্তুই ফরাসী পারিভাষিকে "সলিদারিস্‌ম্" অর্থাৎ দানাবদ্ধতা নামে প্রচলিত। সোজা কথায় তার নাম

ইতালিতে বারকয়েক

ন্যাশনালিজ্‌ম্ অর্থাৎ জাতীয় ঐক্য কিম্বা স্বাদেশিকতা। বাস্তবিক পক্ষে বিসমার্ক হতে মুসলিনি পর্য্যন্ত সোশ্যালিজ্‌ম্-বিরোধীরা ষোল আনা সোশ্যালিজ্‌ম্এর যম নন। তাঁরা সোশ্যালিজ্‌মের কু-টা বর্জ্জন করে সু-টা হজম করেছেন। কু-টা হচ্ছে শ্রেণী-বিরোধ আর সু-টা হ'ল আপামর জনসাধারণের জন্য আয়বৃদ্ধি, কর্ম্মকেন্দ্রের সুব্যবস্থা ইত্যাদি। সহজে এই কথাটা নিম্নবিবৃত ফর্ম্মুলায় দেখিয়ে দিচ্ছি :—

ফাশিজ্‌ম্ = ষ্টেট সোশ্যালিজ্‌ম্ = সলিদারিস্‌ম্ =
ন্যাশনালিজ্‌ম্ (রাষ্ট্রীয় ঐক্য, স্বাদেশিকতা)
+ সোশ্যালিজ্‌ম্ (কু বাদে যা থাকে অর্থাৎ
মজুর ইত্যাদি শ্রেণীর স্বার্থপুষ্টি)।

এইবার রাষ্ট্রনীতির কথা। স্বরাজ ভেঙ্গে স্বরাজ গড়া মুসলিনির কার্ত্তি সন্দেহ নাই ; কিন্তু ইহার ভিতরে নূতনত্ব কিছুই নাই আগেই বলেছি। সেকালের বোম্বেটে বাদশারা সকলেই ছিলেন এই মেজাজের ও চরিত্রের লোক। মুসলিনির বাহাদুরী এই যে, যে যুগে লোকেরা ডেমক্রেসীর নাম শুনবামাত্রই আহ্লাদে আটখানা হয়, সেই যুগে এদিক্ ওদিক্ না তাকিয়ে তিনি সোজাসুজি প্রচার করলেন ডেমক্রেসী মানুষের অনিষ্টকারক। আগেই বলেছি এই প্রচারেও মুসলিনি অগ্রণী নন। ইংল্যণ্ডে, ফ্রান্সে, জার্ম্মাণীতে আর আমেরিকাতেও ডেমক্রেসীর কু সম্বন্ধে বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে' মত জারি আছে। সেই মতটাই মুসলিনি আত্মস্থ করে' নিজের দেশের জন্য কাজে লাগিয়েছেন। আগেই বলেছি, ডেস্পটিজ্‌ম্ হিসাবে রুশিয়ার

ইতালিতে বারকয়েক

বোলশেভিজ্‌ম্‌ ইতালিয়ান ফাশি-ধর্ম্মেরই মাস্‌তুত ভাই। প্রভেদ এই যে, বোলশেভিকেরা গরীবদের মা-বাপ রূপে ধনীদের উপর কড়া শাসন জারি করেছে। আর মুসলিনি ধনী-নির্ধন দুয়েরই উপর যথাসম্ভব সমানভাবে চাবুক লাগাতে চেষ্টিত।

প্রঃ—আচ্ছা মুসলিনির যদি নতুন কিছুই না থাকে, তবে তাঁকে আপনি যুগাবতার জবরদস্ত দেশসেবক বল্‌ছেন কি জন্য ?

উঃ—ও লোকটা বুঝেছে ইতালির হাড়ে কি সইবে। মুসলিনি বেশ জানে ইংরেজজাতের শাসন-প্রণালীর ধারা ইতালির চৌদ্দ পুরুষে কখন দেখেনি। মুসলিনি বেশ জানে যে, আমেরিকা ও জার্ম্মাণীর ধনসম্পদ্‌ ইতালির সমাজে এক প্রকার স্বপ্নমাত্র। ইতালি এখনও বহু দিন কৃষিপ্রধান থাকতে বাধ্য। অধিকন্তু ইতালি ইয়োরোপের মাপে অনেক সামাজিক অনুষ্ঠানেই অবনত। এই সকল দুর্ব্বলতা যতদিন ইতালিয়ান নরনারীর শিরা-উপশিরায় বয়ে যাবে, ততদিন পর্য্যন্ত ইতালির সমাজে যদি ডেমক্রেসীর তর্কা-তর্কি হয়, সোশ্যালিজমের বাদবিসম্বাদ থাকে তাহলে আন্তর্জ্জাতিক দুনিয়ায় ইতালির পক্ষে শক্তিশালী রূপে কাজ করা একরূপ অসম্ভব। মুসলিনির চিন্তায় একমাত্র আরাধ্য বস্তু,—জগতে ইতালিয়ান নরনারীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। আর এই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিনি যে অপূর্ব্ব অধ্যবসায়, কর্ম্মপটুত্ব ও জীবনোৎসর্গ দেখিয়ে যাচ্ছেন তা যে-কোনো যুগের, যে-কোনো সমাজের উন্নতিকামী জনসেবীর পক্ষে আদর্শস্থানীয়। মুসলিনি ইতালিয়ান সমাজে এনেছেন নতুন কোনো দর্শন নয়, নতুন কোনো ধর্ম্ম নয়, নতুন কোনো কর্ম্মকৌশল নয়,

নতুন কোনো চিন্তা-প্রণালী নয়,—এনেছেন কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, এনেছেন শক্তিযোগ, এনেছেন দেশের জন্য প্রাণদান কর্ব্বার প্রবৃত্তি, এনেছেন আমাদেরই সুপরিচিত স্বদেশী আন্দোলনের ভক্তি-যোগ।

সমাপ্ত